কেমন হবে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সাথীদের যিন্দেগী?
সীরাতের আলোকে রচিত ঈমানদীপ্ত একটি অদ্বিতীয় কিতাব-

নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী
(গরীব ইসলাম)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

-শাইখ মাহমুদ আল হিন্দী হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ-
আবু আব্দুল্লাহ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً ﴿٢١﴾

"তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহ (তাআলার সন্তুষ্টি ও মহব্বত) এবং শেষ দিবসের (কামিয়াবীর) আশা রাখে, আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ (উস্‌ওয়াতুন্‌ হাসানাহ্‌)।"

(সূরা আহযাব ৩৩:২১)

হযরত আয়েশা রদিয়াল্লহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبى لِلْغُرَبَاءِ

“ইসলাম শুরুতে গরীব (অপরিচিত) ছিল, খুব শীঘ্রই তা আবার গরীব (অপরিচিত) হয়ে যাবে যেমনটি শুরুতে ছিল, সুতরাং সুসংবাদ গোরাবাদের জন্য (যারা অপরিচিত ইসলামকে নিজেদের জীবনে আঁকড়ে ধরে রাখে)।” (সহীহ মুসলিম)

[বি.দ্রঃ ‘গরীব’ শব্দটি আরবী শব্দ, যার অর্থ ‘অপরিচিত’। উর্দূ এবং বাংলাতেও ‘গরীব’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ ‘নিঃস্ব’। সুতরাং শব্দ একই হলেও বিভিন্ন ভাষায় অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।- অনুবাদক]

হযরত সা'দ বিন হিশাম রদিয়াল্লহু আনহু আম্মাজান হযরত আইশা রদিয়াল্লহু আনহাকে প্রশ্ন করলেন, হে মুমিনদের আম্মা! আমাকে নবীজী ﷺ-এর আখলাক সম্পর্কে বলুন। আম্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? সা'দ বিন হিশাম রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, জ্বী হ্যাঁ। তখন আম্মা বললেন, কুরআনই হলো নবীজী ﷺ-এর আখলাক।

যেহেতু কুরআন নবীজী ﷺ-এর আখলাক, আর কুরআনই হলো সকল এলেমের উৎস, তাই নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীই হলো সকল এলেমের মূল কেন্দ্রবিন্দু, বাস্তব জগতে কুরআনের অনুবাদ। আর নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীর যে ওয়ারিশ হবে বা সেই পবিত্র যিন্দেগীকে যে নিজের যিন্দেগী বানাবে কেবলমাত্র তারাই প্রকৃত আলেম, তাঁরাই প্রকৃত কুরআনের অনুসারী।

“নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী (গরীব ইসলাম)” কিতাবটিতে উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল স্তরের ভাই/বোনদের জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্যেকের ভুল-ত্রুটি নিয়েও আলোচনা করতে হয়েছে। সাধারণ দ্বীনদার, নাফরমান, গোনাহগার, সালেকীন, সালেহীন, দাঈ, রাজনীতিবিদ, মুজাহিদ, ত্বলিবুল ইলম, আলেম সমাজ সকল তবকার মুসলমানদের ‘ইসলাহ’ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। কিতাবের বিষয়বস্তু অনেকের কাছে নতুন বা ভিন্নরকম বোধ হতে পারে। তার কারণ নামের মাঝেই নিহিত। আমরা আমাদের সমাজের গতানুগতিক ইসলাম নিয়ে আলোচনা করছি না। চৌদ্দশত বৎসর আগের “অপরিচিত” ইসলাম নিয়ে কথা বলছি। যেহেতু আমাদের ইসলামের সাথে সেই যামানার ইসলামের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান এবং আমরা প্রকৃত ইসলামের অনেক বিকৃতি ঘটিয়েছি, তাই আলোচনার প্রসঙ্গ অনেকের “স্ব-রচিত” ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা অপারগতা প্রকাশ করছি। আমাদেরকে সত্য বলতেই হবে, উম্মতের সামনে সঠিক ইসলামকে তুলে ধরতেই হবে। এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহ তাআলার পর অন্য কাউকে ভয় বা তোয়াক্কা করি না। কারো সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমরা উম্মতের ইসলাহ কামনা করি। আল্লাহর কসম আমরা উম্মতের ভালাই চাই। তাই কিতাবটি পাঠান্তে সমালোচনা নয়, আত্মসমালোচনা চাই; বিরোধিতা নয়, আত্মসংশোধন চাই; যুগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া নয়, যিন্দেগীর পরিবর্তন চাই; আর গাফলত নয়, এবার জাগ্রত হওয়া চাই, রণসাজে সজ্জিত হয়ে, “আল্লাহু আকবার” তাকবীর ধ্বনি তুলে, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া চাই।

-মাহমুদ আল হিন্দী

-উম্মতে মুহাম্মাদীর একজন ‘নাদান’ হিতাকাঙ্ক্ষী।

সাহাবাওয়ালা মেজাজ গড়তে..........

কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে সঠিক পথ দেখাতে.........

পৃথিবীর মানচিত্র ও ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে.........

উম্মতকে সাহাবাওয়ালা ঈমানী চেতনায় জাগ্রত করতে.........

আখেরী যামানার উম্মতকে নবুয়তের যামানায় ফিরিয়ে নিতে.......

সাহাবায়ে কেরামের জামাতের আদলে একটি নূরানী জামাত তৈরি করতে.......

এই কিতাবটি যথেষ্ট সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ!!!

-মাহমুদ আল হিন্দী

হযরত সাওবান রদিয়াল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এমন এক সময় নিকটবর্তী, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য) একে অপরকে এভাবে আহ্বান করবে, যেভাবে আহারকারী লোকেরা খাদ্যপাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকাডাকি করে।" (এ কথা শুনে) কেউ জিজ্ঞাসা করল, সেদিন কি সংখ্যায় কম থাকার কারণে আমাদের এ অবস্থা হবে? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, "না; বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকবে, কিন্তু তোমরা বন্যায় ভেসে আসা আবর্জনার (/খড়কুটোর মতো প্রাণহীন ও ওজনহীন) হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন, (এর বিপরীতে) তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' ঢেলে দিবেন।" কেউ জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, ওয়াহন অর্থ কি? তিনি ﷺ উত্তরে বললেন, "দুনিয়াপ্রীতি এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।"

(আবু দাউদ, বায়হাকী)

আর বর্তমান যামানাই সেই সময় যার কথা প্রিয়নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বানী করে গিয়েছেন, তাই, সময়ের দাবী হিসেবে আলোচ্য কিতাবটিতে 'ওয়াহন' নামক ভয়ানক ব্যধির চিকিৎসা **'আই.সি.ইউ'** কিংবা **'এইচ.ডি.ইউ'** মানের করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং পুরো উম্মতকে এই ক্যান্সার হতে হেফাযত করুন। আমীন।

-মাহমুদ আল হিন্দী

উৎসর্গঃ

প্রথমত, আমার নফ্‌স-কে, কেননা কাউকে নসীহত করার মতো যোগ্যতা বা ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই, কেবল আমার নফ্‌স ছাড়া! সবচেয়ে বেশি নসীহতের মুহতাজ আমি নিজে।

হে নফস্! এই কিতাবের প্রতিটা শব্দ তোমার জন্য। তাই কিতাবটি ভালোভাবে বারবার পড়ো, কেননা এর উপর তোমাকে অবশ্যই আমল করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যারা সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী চিনতে চায়, গড়তে চায়, তাদেরকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী দান করুন। আমীন।

সূচিপত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)

তৃতীয় গুণ

দুনিয়ার শেষ অংশটুকুও আল্লাহ তাআলার জন্য ত্যাগ করা

০৩. দুনিয়ার শেষ অংশটুকুও আল্লাহ তাআলার জন্য ত্যাগ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা'। ইসলামী রূহানিয়াত এবং আত্মিক শক্তির মূল উৎস হচ্ছে এই 'নাপাক দুনিয়া হতে পাক হওয়া'। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমদের যিন্দেগীতে দুনিয়া পাওয়া যায় না। তাঁরা বিষয়টিকে যতটা গুরুত্ব দিতেন, আমরা বিষয়টিকে ঠিক ততটাই গুরুত্বহীন মনে করি। কী 'আম, কী খাওয়াস, সাধারণ মুমিন থেকে শুরু করে বিশেষ বুযুর্গানে দ্বীন পর্যন্ত, বর্তমান সময়ে দ্বীনদারী বলতে বুঝায় 'দুনিয়াকে ঠিক রেখে যতটা দ্বীন পালন করা যায়।' অথচ সাহাবায়ে কেরাম শতভাগ দ্বীন মেনে চলতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁরা দুনিয়া শতভাগ ছাড়তে পেরেছিলেন। আর আমরা দ্বীন শতভাগ মানতে পারিনা, কারণ আমরা দুনিয়াকে ছাড়তে পারছি না। এর কারণ, প্রকৃতপক্ষে আমরা দুনিয়াকে চিনতেই পারিনি। দুনিয়াকে না চিনতে পারার কারণে দ্বীনদাররাও দুনিয়াকে দ্বীন মনে করেই তাতে ব্যস্ত থাকে। দ্বীনদাররাও কিভাবে আসলে দুনিয়াদার, আমাদের দ্বীনদারীটা যে একটি বাহ্যিকতা মাত্র, তা দুনিয়াকে না চিনা পর্যন্ত বুঝা যাবে না। বর্তমান যামানায় উম্মতের পতনের কেবল একটি কারণও যদি খুঁজে বের করতে বলা হয়, তাহলে তা হবে দুনিয়ার মহব্বত, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া। বর্তমান যামানায় উম্মতের দাঁড়ি-টুপি আর যুব্বা-পাগড়িওয়ালা দ্বীনদারের সংখ্যা মনে হয় অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। তাহলে বর্তমানে উম্মতের এই নাজুক পরিস্থিতি কেন?

সারা দুনিয়ার বাতিল শক্তি কেন মুসলমানদেরকে মশা-মাছির মত দুর্বল মনে করছে, আর পোকা-মাকড়ের মত হত্যা করছে?

সেটি কোন্ কারণ, যে কারণে বাতিলের দীলের মাঝে উম্মতের প্রতি যে ভয় ও প্রভাব ছিল, তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে?

তা 'দুনিয়াপ্রীতি' ছাড়া আর কী?

সেটি কোন্ কারণ, যার কারণে উম্মতের জ্ঞানীরাও আজ জিহাদকে অপছন্দ করছে?

তা 'দুনিয়ার মহব্বত' ছাড়া আর কী?

সেটি কোন্ কারণ, যে কারণে উম্মত আজ জিহাদ ত্যাগ করে কাপুরুষের যিন্দেগী যাপন করছে?

তা 'মৃত্যুর ভয়' ছাড়া আর কী?

অথচ জিহাদ এমন এক দ্বীন যাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত উম্মতের উপর হতে এই অপমান ও যিল্লতীর যামানা উঠিয়ে নেয়া হবেনা!

হযরত সাওবান রদিয়াল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এমন এক সময় নিকটবর্তী, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য) একে অপরকে এভাবে আহ্বান করবে, যেভাবে আহারকারী লোকেরা খাদ্যপাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকাডাকি করে।" (এ কথা শুনে) কেউ জিজ্ঞাসা করল, সেদিন কি সংখ্যায় কম থাকার কারণে আমাদের এ অবস্থা হবে? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, "না; বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকবে, কিন্তু তোমরা বন্যায় ভেসে আসা আবর্জনার (/খড়কুটোর মতো প্রাণহীন ও ওজনহীন) হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন, (এর বিপরীতে) তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন'

ঢেলে দিবেন।” কেউ জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, ওয়াহন অর্থ কি? তিনি ﷺ উত্তরে বললেন, “দুনিয়াপ্রীতি এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।” (আবু দাউদ, বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অগণিত, অসংখ্য মুজেজার মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি আনেওয়ালা উম্মতের ‘দুনিয়াপ্রীতি’র গল্প সাহাবীদেরকে বলে গিয়েছেন ১৪০০ বছর আগে, যখন সাহাবাদের নিকট বিষয়টি গায়বের বিষয়ের মতো ছিলো, যেমন বর্তমানে আমাদের কাছে জান্নাত-জাহান্নামের খবর; এবং সাহাবায়ে কেরাম শেষ যামানার উম্মতের ‘দুনিয়াপ্রীতি’র খবরকে অদৃশ্য বিষয়ের উপর ঈমান আনা হিসেবেই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু বলেছেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এসময় মুসআব ইবনে উমাইর রদিয়াল্লহু আনহু এমন অবস্থায় আমাদের সামনে আসলেন, তাঁর সাথে কেবল একটি (ছেঁড়া পুরাতন) চাদর ছিল, যার মধ্যে চামড়ার টুকরার তালি লাগানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে এই অবস্থায় দেখলেন, তখন তাঁর কান্না এসে গেল। তিনি (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মক্কায়) ভোগ-বিলাসের যিন্দেগী যাপন করতেন। বর্তমানে তাঁর (অভাব-অনটনের) এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন (সম্পদ ও জীবনোপকরণের এমন প্রাচুর্য দেখা দিবে,) তোমাদের কেউ সকালে একজোড়া কাপড় পরিধান করে বের হবে আর সন্ধ্যায় আরেক জোড়া পরিধান করবে, খাবারের জন্য তার সামনে একটি পাত্র রাখা হবে, আর অন্যটি উঠিয়ে নেয়া হবে। আর তোমরা নিজেদের বাড়ী ঘরে এমনভাবে পর্দা পরাবে যেমন কাবা শরীফে পরানো হয়? (তাঁর এ প্রশ্নের উত্তরে

সাহাবীদের মধ্যে থেকে) কেউ কেউ নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ঐ সময় আমাদের অবস্থা বর্তমানের তুলনায় অনেক ভালো হবে। আমরা আল্লাহর ইবাদতের পূর্ণ সুযোগ ও অবসর পাব (জীবিকার জন্য কষ্টক্লেশ বরদাশত করতে হবে না।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, তোমরা বর্তমানে (অভাব-অনটনের এ যুগে ভোগ বিলাসের) ঐ যুগের তুলনায় অনেক ভালো আছ। (তিরমিযী শরীফ)

সুব্হানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ কত সুন্দর করে বর্তমান যামানার মুসলমানদের সাথে সাহাবায়ে কেরামের যামানার তুলনা করে আমাদের দৃষ্টি খোলে দিয়েছেন! কোন্ মুমিন উত্তম যে মুমিন ভোগ বিলাসে মত্ত, নাকি যে মুমিন নিজের জন্য দুনিয়াকে সঙ্কীর্ণ করে নিয়েছে? যে মুমিন নাদুস-নুদুস, নাকি যে মুমিন জীর্ণ-শীর্ণ? সে মুমিন কি উত্তম যে মুমিন সাহাবাদের অনুসরণ করে, নাকি সে উত্তম যে ফেতনায় জর্জিত দুনিয়াদার বুযুর্গদের (?) অনুসরণ করে? আল্লাহ আমাদের পথ দেখান।

একদিকে মুসলিম উম্মাহর পতনের মূল কারণ 'দুনিয়ার মহব্বত', অন্যদিকে খুব শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে রাহবারী করে অপমান-অপদস্থতা হতে উদ্ধার করবেন। তিনি উম্মতের দীল হতে দুনিয়ার মহব্বত বের করবেন, ফলে তাদের অন্তর মৃত্যুর ভয়মুক্ত হবে। তিনি এবং তাঁর সাথীবর্গ দুনিয়া হতে পাক হবেন। এই যামানায় যারা সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ ও অনুকরণে দুনিয়া ছাড়তে পারবে, তাদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেক বড় বড় দ্বীনী খেদমত নিবেন, যেভাবে নিয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু

আনহুমদের দ্বারা। তাই আমাদেরকে দুনিয়ার স্বরূপ জানতে হবে, তাকে চিনতে হবে এবং তা বর্জনের সর্বাত্মক মেহনত করতে হবে।

দুনিয়া ও দুনিয়াদারের পরিচয়:

প্রকৃতিগতভাবে যেসকল কাজ ইবাদত (যেমন: নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি), সেগুলো ব্যতীত একজন মানুষ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনে যত কাজ করে তার সবই 'দুনিয়া'। যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মত এসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পূর্ণ অনুসারী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দুনিয়া উম্মতের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে। দুনিয়ার ব্যাপারে নবীজী ﷺ-এর নূরানী যিন্দেগীকে সামনে রাখলে এবং তার অনুসরণ করা হলে তা হবে অতি উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত এবং এর মাঝেই উম্মতের মুক্তি নিহিত। বর্তমান সময়ে আমরা কেবল ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে অনুসরণ করাকেই দ্বীনদারী মনে করি, ফলে দুনিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে উনাকে অনুসরণ করার কথা আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি।

যিন্দেগীর অধিকাংশ সময় আমরা দুনিয়াবী কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকি, যদিও আমাদের পেশা দ্বীনী কোনো খেদমত হয়ে থাকে। আপনি হয়ত অবাক হবেন, যে লোকটিকে দেখা যাচ্ছে, সারাটা জীবন দ্বীনের খেদমতে কাটিয়ে দিচ্ছে (যেমন: মসজিদ-মাদরাসার খেদমত, উম্মতের ইসলাহের খেদমত, দাওয়াতী মেহনত, জিহাদ ইত্যাদি), তারপরেও এই লোকটি দুনিয়াদার হয় কী করে! হ্যাঁ, একজন মানুষ দ্বীনের কোনো একটি শাখায় আজীবন লিপ্ত থাকলেও, এমনকি জীবনের অধিকাংশ সময় এই কাজে ব্যয় করলেও সে আল্লাহ তাআলার কাছে "খাঁটি দুনিয়াদার"

বিবেচিত হতে পারে। অন্যদিকে একজন মানুষ আলেম না হয়েও, সাধারণ দুনিয়ার পেশায় লিপ্ত থেকেও দুনিয়াদার নাও হতে পারে। এর কারণ যার যিন্দেগী আল্লাহর রাসূল ﷺ- এর যিন্দেগীর সাথে মিলবে, সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীর সাথে মিলবে, সে আর যাই হোক দুনিয়াদার নয়। আর যার যিন্দেগী তাঁদের যিন্দেগীর সাথে মিলবে না, তারা যতই দ্বীনদারীর প্রদর্শন কিংবা মহড়া করুক, প্রকৃত প্রস্তাবে এরা দুনিয়াদার। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বলা যায়, (যদিও শুনতে খারাপ লাগবে, তবুও সত্য বলতেই হবে,) বর্তমান যামানায় অনেক বড় বড় আলেম, পীর-মাশায়েখ, দাঈ, মুজাহিদগণও দিনের শেষে দুনিয়াদার। আর তারা সে বিষয়কে আঁকড়ে ধরে আছে যা আল্লাহ তাআলার দুশমন, যে জিনিসকে সৃষ্টির পর আল্লাহ পাক দ্বিতীয়বার আর তার দিকে দৃষ্টি দেননি। দুনিয়া এবং দুনিয়ার আশেক উভয়েই আল্লাহ তাআলার নিকট লাঞ্ছিত, অপদস্থ, সন্দেহ নেই।

পরবর্তী আলোচনা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

দুনিয়ার হাকীকত:

➢ **দুনিয়া অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।**

হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'তুমি কি ইচ্ছা কর যে, দুনিয়ার স্বরূপ আমি তোমাকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেই?' এই বলে তিনি আমার হাত ধরে একটি আবর্জনা স্তূপের নিকট নিয়ে গেলেন, যেখানে মৃত প্রাণির অস্থি, মানুষের কঙ্কাল ও মাথার খুলি, মল-মূত্র ও গোবর এবং বহু ছেড়া কাপড়ের নেকড়া পুঞ্জীভূত ছিল। তিনি বললেন, "হে আবু হুরাইরা! তোমাদের মস্তকের ন্যায় এই মস্তকগুলোও নানারকম লোভ-লালসা এবং কামনায় পরিপূর্ণ ছিল, আজ মাংস ও চর্মশূণ্য খুলি হয়ে পড়ে আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে মাটির সাথে মিশে যাবে। এই যে মল-মূত্র দেখছ, এগুলোও ইতিপূর্বে নানা রকম উপাদেয় খাদ্য ছিল, যা বহু চেষ্টা এবং পরিশ্রম করে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আর আজ এগুলোকে এখানে এভাবে ফেলে রাখা হয়েছে যে, মানুষ আজ তাকে দেখে ঘৃণায় দূরে সরে যাচ্ছে। এই ছেড়া নেকড়াগুলো একদিন তাদের দেহের উপর বহু মূল্যবান ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকরূপে শোভা পাচ্ছিল। আজ এখানে ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত নেক্ড়ায় পরিণত হয়ে বাতাসের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। এই হাড়গুলো তাদের বাহনের উট, ঘোড়া এবং গৃহপালিত নানা জাতীয় পশুর অস্থি। এক সময় তারা এ সকল যানবাহনের উপর দম্ভভরে আরোহন করে সগর্বে ইতস্ততঃ পরিভ্রমন করে বেড়াত। এগুলোই দুনিয়া। দুনিয়ার এ সমস্ত অবস্থা দেখে যার কান্না করতে ইচ্ছা হয় তাদেরকে বলে দাও, তারা কান্না

করুক, এটি কান্নারই স্থান।" হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহুর কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা কান্না করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে থেকো যেমন কিনা তুমি এক ভিনদেশী অথবা একজন পথিক।" অর্থাৎ মুসাফির পথিক যেমন মাঝে মাঝে যাত্রাবিরতি করে, তোমার পৃথিবীতে অবস্থানও যেন হয় ঠিক তেমনি। মুসাফির পথিক যেমন চলার পথে দাঁড়িয়ে (তার গন্তব্যের কথা ভুলে) বাড়ি-ঘর তৈরী কিংবা রাস্তাঘাট সাজাবার ফিকির করে না, তেমনি তুমিও দুনিয়াতে এসে ইটের ঘর-বাড়ি নির্মাণ আর উপভোগের সামগ্রী দিয়ে যিন্দেগীকে সাজানো শুরু করো না।

➢ দুনিয়া মূল্যহীন।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়ার কোনই মূল্য নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, "যদি আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়ার মূল্য একটি মাছির পাখার সমানও হতো, তাহলে তিনি কোনো কাফের (,মুরতাদ আর নাস্তিক)-কে এক গ্লাস পানিও পান করতে দিতেন না।" আর যে মূল্যহীন জিনিসের সাথে সম্পর্ক রাখে সেও মূল্যহীন হয়ে যায়। একজন জুতা সেলাই করে, আরেকজন কাবাঘরের গিলাফ সেলাই করে। দুইজনই তো সুই-সুতার কাজ করে। কিন্তু মানুষের চোখে কি দুইজনের মূল্য সমান হবে? একজন ফুটপাতে ভাত রান্না করা বাবুর্চি। কুলি মজদুররা তার খানা খায়। আরেকজন মক্কার ফাইভ স্টার যমযম হোটেলের বাবুর্চি। বড় বড় সাহেবরা তার খানা খায়। দুইজনের জীবন কি এক মানের হবে, যদিও দুইজনেই বাবুর্চি? ঠিক তেমনি একজন মূল্যহীন এই দুনিয়ার জন্য সময়, অর্থ ও শ্রম

ব্যয় করে ও অপর একজন তার এই সব কিছু আল্লাহ ও তার দীনের জন্য ব্যয় করে। এই দুই জনের মূল্য আল্লাহ পাকের দরবারে কি কখনো সমান হবে? কখনোই না।

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ

"তাহলে মুমিনরা কি কখনো ফাসেকদের সাথে তুলনীয় হতে পারে? তারা কখনোই সমকক্ষ হবে না।" (৩২ সূরা সিজদাহ: ১৮)

দুনিয়াতেও এরকম হবে না, আখিরাতে তো হবেই না। তাই নিজেদের জীবনকে দুনিয়ার গোলামদের থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। ওরা ফিটফাট থাক, আমাদেরকে জীর্ণ-শীর্ণ হতে হবে। ইহা ঈমানের অংশ। হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে: "এই তোমরা শুনো, এই তোমরা শুনো। নিশ্চয়ই জীর্ণ-শীর্ণ জীবন ঈমানের অংশ। নিশ্চয়ই জীর্ণ-শীর্ণ জীবন ঈমানের অংশ।"

দুনিয়ার গোলামরা অপবিত্র থাকে, আমাদেরকে দুনিয়া হতে পাক হতে হবে। বাহ্যিক ও আত্মিক অপত্রিতা হতে পাকসাফ হতে হবে।

➢ দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র:

দুনিয়াকে আখিরাত গড়ার শস্যক্ষেত্র বানাও। এখানে বীজ বুনে হাশরের মাঠে ফসল তুলবে। দুনিয়ার চাকচিক্য আর নগরীসমূহে কুফ্‌ফারদের সদর্প আস্ফালন যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। দুনিয়ার ভোগসামগ্রী নেহায়েত অল্প। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা সর্বোত্তম,

চিরস্থায়ী। তাই দুনিয়া হতে হাত-পা গুটিয়ে তাড়াতাড়ি জান্নাতের পথে অগ্রসর হও।

➢ **রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “দুনিয়া মুমিনের কারাগার, কাফেরের জান্নাত।”**

দীনের উপর চলতে গেলে অনেক বাধা আসবে, অনেক কষ্ট আসবে, অতঃপর আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত মিলবে। তাই কষ্ট করে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। যেহেতু দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার আর কারাগারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

১. কারাগারে যা ইচ্ছা করা যায় না, মুমিনও দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তা করতে পারেনা। তার কর্ম হবে আল্লাহর মর্জিমাফিক।

২. কারাগারে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়া যায় না, মুমিনের চালচলনও দুনিয়াতে হবে নিয়ন্ত্রিত।

৩. কয়েদীদের কারাগারে শিকলাবদ্ধ করে রাখা হয়, মুমিনও দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান দ্বারা শৃংখলাবদ্ধ থাকে। আল্লাহর হুকুমের বাহিরে সে কিছু করতে পারেনা।

৪. কারাগারে খানার কষ্ট, কাপড় চোপড়ের কষ্ট, বিছানার কষ্ট সহ্য করতে হয়, মুমিনেরও দুনিয়ার যিন্দেগীতে এসব ব্যাপারে কষ্ট সহ্য করতে হয়।

৫. মুমিনের ঘরের আসবাব হতে হবে কারাগার কক্ষের আসবাবের সমান। সেখানে সোফা নেই, ড্রেসিং টেবিল নেই, এসি নেই ফ্রিজ নেই, ডাইনিং টেবিল নেই ইত্যাদি। আল্লাহর রাসূলের ঘরে এগুলো ছিলো না।

৬. কয়েদী ব্যক্তি সব সময় চায়, কবে, কত সহজে কারাগার হতে বের হয়ে মুক্তি লাভ করে আপনজনের কাছে ফিরে যাবো। মুমিনেরও এমন তামান্না থাকা চাই, কবে কত সহজে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতে পরিবার পরিজন (হূরদের) সাথে মিলিত হবো।

➢ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب

"তোমাদের একেকজনের সম্বল যেন হয় মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ।"

সুতরাং ওহে মুসলমান ভাই! চিন্তা করুন! দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের প্রেসক্রিপশন কী! আহ্! প্রতিটি সাহাবায়ে কেরাম এ কথার উপর আমল করে দেখিয়েছেন। এই একটি হাদীসের উপর আমল করলে আমাদের যিন্দেগী পরিবর্তন হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। একজন মুসাফিরের লাগেজে যতটুকু মাল সামানা আঁটে, দুনিয়ার যিন্দেগীতে এর চেয়ে বেশি যেন আমাদের ছামানা না হয়। যারা হজ্জ বা ওমরা বা চিল্লার সফর করেছি, তারা একটু চিন্তা করি, সেই সফরে আমরা কী কী নিয়ে সফর করেছি। এগুলো তো সফরের ছামানা নয়, এতটুকুই হওয়ার কথা ছিল আমার যিন্দেগীর ছামানা! যারা চিল্লার সফরে যাইনি, তারা চিন্তা করি কোথাও তিন দিনের সফরে বা এক সপ্তাহের সফরে কিংবা পনের দিনের সফরে বের হলে আমরা কী কী জিনিস নিয়ে বের হই। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, এতটুকুই হওয়ার কথা তোমার যিন্দেগীর ছামানা!

➢দুনিয়া ধোকার ঘরঃ

এক গ্লাস লেবুর শরবত। আমি বানিয়েছি। এতে আমি লেবুর রস দিয়েছি, সামান্য একটু লবণও দিয়েছি, কিন্তু চিনি দেই নি। এখন আমি শরবতটি তোমার হাতে দিয়ে বললাম, এই শরবতটা তুমি খাও, এতে আমি চিনি দেই নি। তুমি বললে, চিনি দেননি, তাতে কী, আমি তার পরোয়া করিনা, চামচ দিয়ে নেড়ে আমি এটাকে মিষ্টি বানাবো। এই বলে তুমি চামচ দিয়ে নাড়া শুরু করে দিলে। সামান্য জ্ঞানও যার আছে সেই একথা বলবে যে তুমি বোকা। কারণ শরবত যে বানিয়েছে, সে বলে দিয়েছে যে সে এতে চিনি দেয় নি, এখন তুমি এটাকে যতই চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া কর কোনো লাভ নেই। তোমার কষ্টটাই বৃথা। এটা কখনও মিষ্টি হবে না।

আল্লাহ পাক এই জগৎটাকে বানিয়েছেন। তিনি এটাকে অনেক রঙ্গিন বস্তু দিয়ে সাজিয়েছেন। তারপর আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, আমি এটাতে “সফলতা” নামক বস্তুটি দেই নি। এখন তুমি যতই এটাকে নাড়াচাড়া করে সফলতা লাভ করতে চাও না কেন, কোনো লাভ নেই। তোমার কষ্টটাই বৃথা। কেননা দুনিয়া একটি ধোকার ঘর।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ

“পার্থিব জীবন (ধোকা ও) প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।”

(৫৭ সূরা হাদীদ: ২০)

দুনিয়া ছাড়ার লাভসমূহঃ

✓ 'দুনিয়ার মহব্বত' সকল গুনাহের মা, যার গর্ভে অন্য সকল গুনাহের ভ্রূণ প্রস্ফুটিত হয়। সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি হচ্ছে 'দুনিয়াপ্রীতি'র সন্তান-সন্ততি। আজ উম্মতকে গুনাহ ছাড়তে বলা হয়, অথচ দুনিয়া ছাড়তে বলা হয় না। দুনিয়া ছাড়তে বলা হলেও সঠিক পথ বাতলানো হয় না। অথচ বর্তমানে উম্মতের সকল অনর্থের মূল এই 'দুনিয়া'। সুতরাং-

যে ব্যক্তি সকল গুনাহ থেকে পবিত্র হতে চায়, সে দুনিয়া ছাড়ুক। যে ব্যক্তি চোখের গুণাহ, মুখের গুনাহ, কানের গুনাহ, পেটের গুনাহ, লজ্জাস্থানের গুনাহ, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুনাহ ছাড়তে চায়, যে চায় অন্তরের সকল ব্যাধি হতে মুক্তি পেতে, হৃদয়কে ঈমান ও ইসলামের নূরে নূরানী করতে, যে মনে করে সকল গুনাহ খুটে খুটে বের করে বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সে যেন একটি গুনাহ হতে পবিত্র হয়, একটি মহামারী থেকে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করে, আর তা হলো 'দুনিয়াকে চিনে দুনিয়া হতে নিজেকে পাক-সাফ করা'।

✓ কুরআন ও হাদীসে **দুটি জিনিসের সাথে সরাসরি আল্লাহ তাআলার মহব্বত লাভের ওয়াদা করা হয়েছে। এক. দুনিয়া ত্যাগ এবং দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর পরিপূর্ণ ইত্তেবা অনুসরণ।**

যেমনঃ হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে,

إِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيْ مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ

"দুনিয়া হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, আল্লাহ পাক তোমাকে মহব্বত করবেন। মানুষের কাছে যা কিছু আছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, মানুষ তোমাকে মহব্বত করবে।"

অন্যদিকে, কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "(হে নবী) বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন পরম ক্ষমাশীল, দয়াময়।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ৩১)

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা যদি পেতে চাও, তবে দুনিয়া ছাড়, সংসার বিরাগী হও।"

অন্য কোনো আমলের সাথে আল্লাহ তাআলার মহব্বতের সরাসরি ওয়াদা নেই। এ থেকেই দুনিয়াত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝে আসে। সুতরাং *যে ব্যক্তি সহজে আল্লাহ তাআলার মহব্বত লাভ করতে চায়, সহজে 'আল্লাহর ওলী' হতে চায়, সে যেন অন্য সকল চেষ্টা তদবীরের আগে দুনিয়া ছাড়ার মেহনত করে।*

✓ একদিন হুযুরে আকরাম ﷺ গৃহের বাহিরে এসে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লাহু আনহুদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, "তোমাদের মাঝে এমন অন্ধ ব্যক্তি কে আছে যে ইচ্ছা পোষণ করে করে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন? তোমরা জেনে রাখ, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত এবং তার আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম, আল্লাহ তাআলা তার অনুরাগ এবং আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তার অন্তরকে অন্ধ করে দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে

যে ব্যক্তি দুনিয়া হতে নির্লিপ্ত থাকতে পারে এবং দুনিয়ার সুখ-সম্পদের প্রতি যার আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ অতি সামান্য থাকে, আল্লাহ তাআলা তাকে কোনো শিক্ষক ব্যতিরেকে নিজের তরফ হতে মহা জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং কোনো হেদায়াতকারীর হেদায়াত ব্যতীতই তাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।”

অর্থাৎ একজন যাহিদ (দুনিয়াত্যাগী) এমন এক মাদরাসার ছাত্র যার শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন ইলম (ইলমে লাদুন্নী) লাভ করবে যে, অন্যরা মিলাতে পারবে না, এই ব্যক্তি মাদরাসায় না পড়েও কিভাবে এতো গভীর ইলমের অধিকারী হলো!!

✓ দুনিয়া ত্যাগের দ্বারা জান্নাত সুনিশ্চিত হয়। হুযুরে পাক ﷺ আরেক সময় শুক্রবার দিন জুমুআর নামাযে খোৎবা দেওয়ার পর বললেন, “যে ব্যক্তি لا اله الا الله অর্থাৎ ‘আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।’ এই কালেমাটি একাগ্র মনে, একান্তভাবে বিশ্বাস করে এবং তার সঙ্গে অন্য কিছু মিশ্রিত না করে, তার জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত।” এই কথা শুনা মাত্র হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর সাথে যে বস্তু মিশ্রিত করা উচিত নয় তা বলে দিন।” উত্তরে নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন, “তা হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং দুনিয়া অন্বেষণ”। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, খণ্ড ৪, পৃ. ১৬১)

দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহঃ

আমি আপনাদেরকে দুটি আয়াতের কথা আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

প্রথম আয়াত,

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তাআলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"

(০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

দ্বিতীয় আয়াত,

"১৪. মানুষকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি-পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তু-সামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। ১৫. বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতে উত্তম বিষয়ের সন্ধান দিব না? যারা পরহেযগার (দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকে), তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত, তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিণীগণ (হূর) এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৪-১৫)

উপরোক্ত আয়াত দুটি হতে আমরা কি শিক্ষা পাই, একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, আয়াত দুটিতে-

- আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিলেন, এগুলো, এগুলো দুনিয়া, এগুলোর মহব্বত দীল হতে বের করতে হবে, এগুলো হতে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করাকে বেশি ভালোবাসতে হবে, নচেৎ দেখ তোমাদের পরিণতি কী হতে যাচ্ছে?
- মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপাদানগুলো মোহগ্রস্ত করেছে, আমি তোমাদেরকে চিরস্থায়ী আখিরাতের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। তোমরা আখিরাতের বেহেশতের প্রতি আগ্রহী হও, হূরে ঈনের প্রতি আগ্রহী হও, দুনিয়ার এসব বিষয়ের মহব্বত দীল হতে বের কর।
- এক কথায়, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়া বলতে কী বুঝায়, আর দুনিয়ার উপাদান কী কী তা শিক্ষা দিলেন।

সুতরাং, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত একজন মানুষের জীবনে যেসব বিষয় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলো হলো-

১. পরিবার-পরিজনঃ পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান ও অন্যান্য
২. পেশা - ব্যবসা, চাকুরী, কৃষি, অন্যান্য
৩. ধন-সম্পদঃ টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, জায়গা-জমি, বাহন

এছাড়াও রয়েছে-

৪. মৌলিক চাহিদাসমূহঃ পানাহার, বস্ত্র, বাসস্থান, গৃহের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি
৫. ব্যক্তিগত অভ্যাসঃ ঘুম, ইস্তিঞ্জা, গোসল, জৈবিক চাহিদা পূরণ ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো একদম মৌলিক দুনিয়াবী বিষয়। এই বিষয়গুলোতে নবীজী ﷺ- এর সুন্নত কী ছিল সেগুলো জানা এবং আমল করা জরুরী। কেননা এই বিষয়গুলোতে যে নবীজী ﷺ- কে অনুসরণ করতে পারবে সেই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াত্যাগী। "ওয়াহন" বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ- শেষ যামানায় উম্মতের মাঝে যে প্রলয়ঙ্করী ব্যাধির কথা ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এগুলোই। এগুলোর মহব্বতই দুনিয়ার মহব্বত। পরবর্তী আলোচনা হতে ইন্‌শাআল্লাহ আমাদের বুঝে আসবে, আমরা দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে সুন্নতের অনুসরণ থেকে কতটুকু দূরে!

০১. পরিবার-পরিজন: পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য

একজন মানুষের যিন্দেগীতে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান হচ্ছে নিকটতম পরিবার পরিজন। একদিকে তাদের সাথে হক তথা অধিকার আদায়ের সম্পর্ক (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সুনির্ধারিত প্রত্যেকেরই হক রয়েছে), অন্যদিকে তাদের সাথে আত্মিক মহব্বতের সম্পর্ক, যা একই সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ধরণীর বুকে এক মহা নিয়ামত, আবার যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম জিহাদ বাস্তবায়নের প্রশ্ন আসে, তখন এটিই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তাই মহব্বত ও মহব্বত কুরবানীর মাঝে ভারসাম্য বিধান করা আবশ্যক, যাতে করে তাদের অধিকার আদায়ও হয়, তাদের প্রতি যথাযথ মহব্বত প্রদর্শনও হয়, আবার জিহাদের প্রয়োজনে তাদের মহব্বতকে কুরবানীও করা যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

ক. পিতা-মাতার হক:

✓জীবিত অবস্থায় ৭টি:

১। আয্মত অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২। মনে-প্রাণে মহব্বত করা।

৩। তাদেরকে সর্বদা মেনে চলা।

৪। তাদের খিদমত করা।

৫। তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা।

৬। সর্বদা তাদের সুখ-শান্তির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

৭। নিয়মিত তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা ও খোজ-খবর নেওয়া।

✓মৃত্যুর পর ৭টি:

১। তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা।

২। সাওয়াব রেছানী করা।

৩। তাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মান করা।

৪। তাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য-সহযোগিতা করা।

৫। তাদের ঋণ পরিশোধ এবং আমানত আদায় করা।

৬। তাদের শরী'আত সম্মত ওসিয়্যত পূর্ণ করা।

৭। মাঝে মাঝে তাদের কবর যিয়ারত করা।

✓এখানে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে-

- ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য চলবে, বরং আনুগত্য প্রদর্শন করা ফরয, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শরীয়তের ফরয, ওয়াযিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা বিরোধী কোনো হুকুম না করে। তবে মুস্তাহাব আমালের ক্ষেত্রে পিতামাতার নিষেধ মানাই জরুরী, বরং এটিই দ্বীন। যেমন: পিতা-মাতা যদি বলেন, দাঁড়ি কাট-মানা যাবে না, তারা যদি বলেন, শিরক্ কর- মানা যাবে না, রোযা রেখনা- মানা যাবে না ইত্যাদি; যদি বলেন, দাঁড়িয়ে থাক- দাঁড়িয়ে থাকা সন্তানের উপর ফরয।

- পিতা-মাতা সন্তানের খেদমত পাওয়ার হকদার, কিন্তু 'সন্তান তার যিন্দেগী কিভাবে গড়বে অর্থাৎ রাসূলের যিন্দেগীর সাথে মিলিয়ে সে যিন্দেগী গড়বে'- এ ব্যাপারে বাধা দেয়ার অধিকার পিতা-মাতার নেই। আমার যিন্দেগীর গাইড্লাইন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ দিবেন, পিতামাতা

নন। এ ব্যাপারে পিতা-মাতা যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সন্তানের উপর তা মান্য করা জায়েয নয়।

- বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ অভিভাবক (পিতা-মাতা) প্রকৃতপক্ষে দ্বীনদার নয়। দ্বীনের কিছু বাহ্যিকতা রয়েছে, অস্বীকার করছি না, কিন্তু তারা সাহাবাওয়ালা মেজায লালন করেন না, যদিও তিনি একজন আলেম হন। এর প্রমাণ হলো, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর যুলুম নির্যাতনের মাত্রা সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে, এসময় উম্মতের প্রত্যেকের (সক্ষম পুরুষ, নারী, বালক, বয়স্ক সকলের) উপর জিহাদ 'ফরযে আ'ঈন'। একেতো এই পিতা-মাতাগুলোর নিজেরা হিজরত ও জিহাদের ব্যাপারে কোনো ফিকির নেই, আর সন্তান যদি জিহাদের নামও মুখে নেয়, তাহলে সর্বোচ্চ বাধা-বিপত্তি শুরু করে দেয়। যা তাদেরকে গুনাহে কবীরায় লিপ্ত করছে। অথচ এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত কী ছিল? তাঁরা তো নিজেরাই জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সর্বশক্তি দিয়ে, আবার তাঁরা তাঁদের দশ/বার বছরের ছেলেদেরকেও জিহাদে প্রেরণ করেছেন। বিখ্যাত ঘটনা! বদরের প্রান্তরে আবু জেহেলের হত্যাকারী কারা ছিলেন? হযরত মুআজ ইবনে আমর এবং মুআজ ইবনে আফরা রদিয়াল্লহু আনহুমা উভয়েই দশ বছরের বালক ছিলেন। সুবহানাল্লাহ! বর্তমানে উম্মতের মা-বাপেরা তাদের দশ বছরের সন্তানদেরকে বাজারেও পাঠায় না।

- বর্তমান সময়ে 'প্রকৃত দ্বীনের বুঝহীন' এই পিতা-মাতারা যদি সন্তানকে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির বিষবাষ্পে দহন করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাহলে সন্তান তাদের পিতা-মাতার কথা না শুনলে তা মোটেও

'অবাধ্যতা' নয়। কেননা সহ-শিক্ষায় বাধ্য করা বা দুনিয়াবী শিক্ষায় বাধ্য করা (যা তার দ্বীনকে ধ্বংস করবে), সন্তানের ঈমান-আমল-আখিরাত ধ্বংস করার নামান্তর। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হুকুম হলো পিতা-মাতার কথা মানা যাবে না। (৩১ সূরা লোকমান: ১৫) 'সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক, সরকারী চাকুরিজীবী ইত্যাদি হবে'- এগুলো তাদের জায়েয ইচ্ছা নয়, হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা চান বান্দা এখন জিহাদ করুক (ফরযে আইন), আর পিতা-মাতা চাচ্ছেন ছেলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হোক, তাহলে তাদের এই আকাঙ্ক্ষা জায়েয হলো কিভাবে? মুফতী সাহেবরা হয়তো ফতোয়া দিবেন, আমাদের তো এসব সেক্টরে দ্বীনদার লোক লাগবে। কিন্তু যারা এই লাইনে পড়াশুনা করছে, এদের মাঝে হাজারে একজনও পাওয়া যাবে না, যে কিনা এসব পড়াশুনা করে দ্বীনদারী ঠিক রাখতে পারছে, গুনাহে কবীরা থেকে বাঁচতে পারছে। যতগুলো চোখের গুনাহ হচ্ছে, যতগুলো কানের গুনাহ হচ্ছে, যতগুলো অন্তরের গুনাহ হচ্ছে, এগুলোর দায়ভার কে নিবেন? এদের কবীরা গুনাহের ভার কি মুফতী সাহেবরা বহন করতে পারবেন? তাই এক্ষেত্রে সন্তান যদি পিতা-মাতার কথা না মানে তাহলে সে পিতা-মাতার অবাধ্য বলে গণ্য হবে না।

- যখন জিহাদ সকলের উপর ফরযে আঈন হয়ে যায়, জিহাদে যাওয়ার জন্য তখন পিতা-মাতার অনুমতির দরকার নেই। শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ঈমান আনার পর প্রথম পরয হচ্ছে, মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা। যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও কুফ্ফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর জিহাদ ফরযে আঈন হয়ে যায় (সবার উপর ফরয হয়ে

যায়)। ঐ মুহূর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকে তার সন্তানের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না এবং স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীরও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।"

- পিতা মাতা যদি দ্বীনের ব্যাপারে বাধা হয়, এমনকি তারা যদি শির্ক করারও হুকুম দেন, তাদের কথা মানা যাবে না, কিন্তু তাদের সাথে অসদ ব্যবহারও করা যাবে না, এমনকি বিরক্তিসূচক 'উফ্' শব্দটি পর্যন্ত বলা যাবে না, সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরযে আঈন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"২৩. তোমার প্রতিপালকের চূড়ান্ত নির্দেশ, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ্' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। ২৪. এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু'আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ২৩-২৪)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,
"পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে।"(৩১ সূরা লোকমান: ১৫)

খ. স্ত্রীর হক:

- স্ত্রীর দ্বীনদারির খোঁজ-খবর রাখা, দ্বীনদারির মানসিকতা গড়ে উঠছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখা ও মেহনত করা। তাদেরকে পর্দার হুকুম করা এবং পর্দা করার ব্যবস্থা করে দেয়া। যেহেতু স্ত্রীরা ঘরের বাহিরে যেতে পারে না, উলামায়ে কেরামের মজলিসে যেতে পারে না, তাই তাদের জন্য প্রথম পীর তার স্বামী। স্বামীই তার স্ত্রীর দ্বীনদারির সকল ফিকির করবে।

- স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করা, তাদের সাথে প্রেম-ভালোবাসার মধুর সম্পর্ক কায়েম করা। মনে রাখতে হবে, স্ত্রীরা পুরুষদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আমানত। এই আমানত সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। যেমন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا
وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" (৪ সূরা নিসা: ১৯)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" (২ সূরা বাকারা: ১৮৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।"

- স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর উপর।

গ. সন্তানের হক:

- সন্তানের মাতা হিসেবে নেক স্ত্রী বিবাহ করা।
- জন্মের পর সপ্তম দিন আকীকা করা ও উত্তম নাম রাখা।
- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত, আহলে বাইতের মহব্বত এবং সাহাবায়ে কেরামের মহব্বত শিক্ষা দেওয়া। এজন্য তাদেরকে ছোট থেকেই নবীজী ﷺ- এর সীরাত, সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত ঘটনা বেশী বেশী শুনানো।
- কুরআন শিক্ষা দেওয়া।
- প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল ও দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়া।
- যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া।
- পরিণত বয়স হলে দ্বীনদার মেয়ে দেখে বিবাহ দেয়া।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লহু আনহু খলীফা থাকা অবস্থায় শামের অধিবাসীদের নিকট এই বলে পত্র পাঠালেন, "তোমরা তোমাদের ছেলে সন্তানদের সাঁতার, তীর চালনা ও অশ্বারোহন প্রশিক্ষণ দাও। আর তাদেরকে যুদ্ধের সকল কলাকৌশল অর্জনের নির্দেশ দাও।" (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৪৪০)

অপরিচিত ইসলাম........

হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের ঘটনা থেকে শিক্ষা:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

"৩৬. আর নূহ (আঃ) এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো যে, যারা ইতোমধ্যেই ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবে না, অতএব তাদের কার্যকলাপে আপনি বিমর্ষ হবেন না।

৩৭. আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোনো কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে।.......

৪০. অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল,.......

৪২. আর নৌকাখানি তাদের (মুমিনদের) বহন করে চলল পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মধ্যে, আর নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহন কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না।

৪৩. সে বলল, আমি অচিরেই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ (আঃ) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোনো রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল।.......

৪৫. আর নূহ (আঃ) তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভূক্ত; আর

আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।

৪৬. আল্লাহ বলেন, হে নূহ! *নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভূক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার!* সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি অজ্ঞদের দলভূক্ত হবেন না।

৪৭. নূহ (আঃ) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।" (১১ সূরা হূদ)

উপর্যুক্ত ঘটনাটিতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন-

- ✓ আল্লাহ তাআলার কাছে পারিবারিক বন্ধনের প্রকৃত মাপকাঠি 'রক্তের সম্পর্ক' নয়। বরং 'দ্বীনদারীর সম্পর্ক'।
- ✓ যদি দ্বীনদারী না থাকে 'সে আমার পরিবারভূক্ত নয়', যদিও তার সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান এবং সে আমার খুব মহব্বতের নিকটাত্মীয় হয়, হোক সে আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, কিংবা ভাই-বোন।
- ✓ যারা আমার দ্বীনদারীর ব্যাপারে সহযোগী, প্রকৃত ইসলামের অনুসারী, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে আমার সহযোগী, তারাই মূলত আমার পরিবারভূক্ত। আর যারা দ্বীন মানার ক্ষেত্রে আমার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তারা আমার 'পরিবারভূক্ত' নয়।

✓ মৃত্যুর সাথে সাথে রক্তের সম্পর্কের আর কোনো দাম থাকে না, যদি না দ্বীনদারীর সম্পর্ক না থাকে।

✓ যারা পারিবারিক সম্পর্ক নির্ণয়ে রক্তের সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়, দ্বীনদারীর সম্পর্কে প্রাধান্য না দেয়, তারা অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত।

✓ সহীহ ইসলামের উপর চলনেওয়ালা সকল মুসলিম এক মিল্লাত, এক পরিবারভূক্ত, সকলেই আমার পরিবারিক সদস্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

اِنَّمَا الْمُسْلِمُوْنَ اِخْوَةٌ

"নিশ্চয়ই মুসলমানরা পরস্পরের ভাই।"

তাই আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুক না কেনো তারা সকলে এক পরিবার। আবার এক ছাদের নিচে বসবাসকারী পিতামাতা, ভাইবোন এক পরিবার নয়, যদি তাদের কেউ দীনদার ও অন্যরা দীনহারা হয়।

✓ আল্লাহ তাআলার আযাব আসলে, কেবল সহীহ দ্বীনদারকেই আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেন।

✓ এগুলোই আল্লাহ পাকের ফয়সালা।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা কখনো ঈমানের ওপর কুফুরীকে (প্রাধান্য দিতে) বেশি ভালোবাসে, তাহলে তোমরা এমন লোকদের কখনো বন্ধু/অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না; তোমাদের মধ্যে যারা এদের বন্ধু/অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, তারা (সুস্পষ্ট) যালেম।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৩)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শ (মিল্লাতে ইবরাহীম):

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ.......

"৩. তোমাদের স্বজন পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। ৪. তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে......... ।"

(৬০ সূরা মুমতাহানা: ৩-৪)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

"জেনে রেখো, তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে (আল্লাহ তাআলার) পরীক্ষামাত্র (তিনি দেখবেন, তাঁর ডাকে তোমরা এগুলোকে কুরবানী করতে পারো কিনা), (আর যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তার জন্য অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে।"

(৮ সূরা আনফাল: ২৮)

উপরের আয়াত দুটি থেকে আমরা কী কী শিক্ষা পাই?

✓ আমাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এত মহব্বতের হওয়া সত্ত্বেও, তাদের জন্য আমাদের যিন্দেগীর সকল মেহনত-কষ্ট উৎসর্গ করা সত্ত্বেও, তাদের জন্য আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আয় রোজগার করে খাওয়ানোর পরেও, তারা আখিরাতে হাশরের ময়দানে আমাদের কোনোই কাজে আসবেনা। যেমন আল্লাহ তাআলা আরেক আয়াতে বলেছেন,

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

"সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে তার নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে, বাপের কাছ থেকে এবং নিজের স্ত্রী-সন্তানদের কাছ থেকে।" (সূরা আবাসা:৩৪-৩৬)

✓ তাহলে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পারিবারিক বন্ধনে আমাদেরকে কেন আবদ্ধ করলেন? কারণ, এক. পৃথিবীতে মানব সমাজের ধারা অব্যাহত রাখা এবং দুই. আমাদেরকে পরীক্ষা করা যে, আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে এই আত্মীক সম্পর্ক ছিন্ন করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে

পড়তে পারি কিনা। যারাই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তাদের জন্য ও তার উসীলায় তার পরিবারের সদস্যদের জন্য আখিরাতে রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের প্রতিশ্রুতি।

✓ তাহলে বুঝা গেল, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, যে মুজাহিদ তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ফেলে রেখে ময়দানে চলে গেল তাদেরকে সে কষ্টের মাঝে রেখে গেল, প্রকৃতপ্রস্তাবে সে তাদের উপর এহসান (অনুগ্রহ) করলো, কেননা দুনিয়ার এই কিছুদিনের কষ্টের বিনিময়ে তার পরিবারের লোকজন আখিরাতে জান্নাতুল ফিরদাউস পাবে, যা তারা নিজের আমল দ্বারা লাভ করতে পারতো না অথবা তাদের আমল তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছাত, কিন্তু মুজাহিদের শাফায়াতের দরুন তারা পরকালে জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়ে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করবে। যেমন, হাদীসে এসেছে, "একজন শহীদের সুপারিশে তার সত্তরজন আত্মীয়কে জান্নাত দান করা হবে।" (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফ)। সুতরাং এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী হতে পারে?

✓ আল্লাহ তাআলা বললেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের মাঝে আমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে। কী আদর্শ? আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহ তাআলা অনেক বার অনেক বড় বড় পরীক্ষা করেছেন, যার সবগুলোই তিনি সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর তাঁর এই ঘটনাগুলোকে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য আদর্শ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর স্ত্রী হাজেরা (আঃ) বন্ধ্যা ছিলেন। তিনি যখন বার্ধক্যে পৌঁছেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা পাঠিয়ে স্বীয় কুদরতে একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন। তাঁর নাম হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম। বার্ধক্যে লব্ধ এই

পুত্র সন্তানকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। হঠাৎ একদিন স্বপ্নে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে আদেশ করা হলো তিনি যেন আদরের পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে কুরবানী (জবেহ) করেন। সাথে সাথে তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মীনার পাহাড়ের উপর পুত্রকে নিয়ে গিয়ে হাত-পা-চোখ বেঁধে গলায় ছুরি চালালেন। কিন্তু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম জবেহ হননি, আল্লাহ তাআলা জান্নাত হতে একটি দুম্বা প্রেরণ করেন যা জবেহ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই কুরবানীকে কবুল করেন।

ঘটনাটির শিক্ষা- এমন হয়নি যে, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ছুরি নিয়ে তৈয়ার আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইবরাহীম, তুমি পাশ করেছ। বরং তিনি ছুরি চালানোর পর বলেছেন, এবার তুমি পাশ করেছ। আসলে তিনি সন্তানের কুরবানি করেননি, আল্লাহর সামনে সন্তানের মহব্বতকে কুরবানি করেছেন। তিনি তো সন্তানের গলায় ছুরি চালাননি, তিনি ছুরি চালিয়েছেন সন্তানের মহব্বতের গলায়। আল্লাহ তাআলার জন্য তিনি দুনিয়ার সবকিছু এভাবে কুরবানী করতে প্রস্তুত, তিনি এটিই প্রমাণ করে দেখালেন।

✓ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের জীবনের আরেকটি বড় শিক্ষণীয় ঘটনা হলো- আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-কে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রী হাজেরা ও সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে জনমানবহীন প্রান্তরে মক্কা উপত্যকায় রেখে আস। তিনি 'একদিন চলে পরিমান' অল্প কিছু খাবার আর পানি দিয়ে তাদেরকে এমন এক জায়গায় রেখে গেলেন যেখানে না আছে বসতি, না আছে

খাবার, না আছে পানি। কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে নির্জন মক্কা উপত্যকায় রেখে আসেন।

ঘটনাটির শিক্ষা- এই ঘটনাটি মুজাহিদ ভাইদের জন্য হৃদয়ের প্রশান্তি, মনের বল। আমি যদি আমার পরিবার পরিজনদের রেখে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাই, তাহলে আল্লাহ পাক তাদেরকে সেভাবে হেফাযত করবেন যেভাবে করেছিলেন হযরত হাযেরা ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে।

আমরা যারা ঘরে বসে আছি, তাদেরকে জিহাদের কথা বলা হলেই আমরা চিন্তা করি আমি যদি জিহাদে চলে যাই, তাহলে আমার স্ত্রী-সন্তানদের কী হালত হবে? কিন্তু আমরা এটা চিন্তা করি না যে, আমিতো ঘরে পড়ে আজকেও মরতে পারি। তখন আমার স্ত্রী-সন্তানদের কে দেখবে? আসলে আমরা মনে হয় নিজেদেরকে আমাদের স্ত্রী-সন্তানের রব (প্রতিপালক) মনে করি! যে মুসলমান হবে, সে তো একথা একীন করবে, আমারও একজন প্রতিপালক আছেন, আর আমার স্ত্রী-সন্তানেরও প্রতিপালক (রব) সেই একজনই। আমাকে যিনি খাওয়াবেন, তাদেরকেও তিনিই খাওয়াবেন। আমি চলে গেলে তাদেরকে দেখার জন্য আমার আব্বা-আম্মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আছে, তারা দেখবে। উহু, হলো না! তারাও আমার স্ত্রী-সন্তানের রব নয়। তারা দেখলেও আল্লাহ আমার স্ত্রী সন্তানদের প্রতিপালন করবেন, তারা না দেখলেও বা তারা কেউ না থাকলেও আল্লাহ তাআলা আছেন, তিনিই স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিপালন করবেন। আমি কাছে থাকা অবস্থায় যিনি খাওয়াচ্ছেন, আমি বা অন্য কেউ না থাকলেও তিনিই খাওয়াবেন। বিয়ের আগে আমার স্ত্রীকে তার পিতা পালেন নি, পেলেছিলেন আল্লাহ, বিয়ের পরেও আমি তাকে পালছি না, পালছেন আমার আল্লাহ, আমার

অনুপস্থিতিতে কিংবা তাদের সাথে নিয়ে হিজরত করলে সেখানেও তাদের পালবেন আল্লাহ। রব তো আমি না, আমার আল্লাহ!

- উপরের আলোচনার সারাংশ হচ্ছে- আমাদের জন্য জরুরী হলো প্রথমে নিজের পরিবারকে চিহ্নিত করা। বাবা-মা, ভাই-বোনদেরকে আল্লাহ পাক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে তাদের প্রতি কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। যদি আমরা সেই দায়িত্ব পূরণ করি তাহলে আমরা পরীক্ষায় সফল, অন্যথায় ব্যর্থ। কিন্তু এই দায়িত্ব পূরণ যেনো আমাদের দীনের উপর চলতে বাধা না দেয়। তাহলে সব বৃথা। হাশরের ময়দানে তখন এরা কেউ আমার কোনো কাজে আসবে না। তাই খুব খেয়াল রাখতে হবে, দুনিয়ার পারিবারিক বন্ধন যেনো আমাদের দীনের জন্য প্রতিবন্ধক না হয়। যদি এরা দীনদার হয়, তাহলে এদেরকে সাথে নিয়ে চলতে হবে। তখন এরা দুনিয়া ও আখিরাতে পরস্পরের জন্য উপকারী হবে। আর যদি এরা দীনের জন্য বাধাদানকারী হয়, তাহলে এরা আমার জন্য মিত্র নয়। তখন এদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে হবে। না মানলে পরিত্যাগ করতে হবে। এই জন্যই সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ নিজেদের পিতামাতা আত্মীয় স্বজন সকলকে ছেড়ে মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরত করেছিলেন। এই জন্যই আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লহু আনহু বদরের যুদ্ধে তার কাফের পিতাকে হত্যা করেছিলেন। পারিবারিক বাধাকে উপেক্ষা করে দীনের জন্য কদম বাড়ানো- এটিই সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ।

বিদায়ী অসীয়তনামা

স্ত্রীর প্রতি বীর মুজাহিদ আনোয়ার পাশার চিঠি

হযরত আনোয়ার পাশা রাহিমাহুল্লাহ ঐসব বীর মুজাহিদদের অন্তর্ভূক্ত, যারা গোটা যিন্দেগী ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে ব্যয় করেছেন এবং যাদের বুকের তাজা রক্তে রচিত হয়েছে যুগে যুগে ইসলামের ইতিহাস। অবশেষে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের চির অমীয় সুধা পান করেন। তিনি জিহাদের উত্তপ্ত ময়দান হতে তাঁর প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী শাহ্জাদী নাজিয়া সুলতানার নামে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন, যা পরবর্তীতে তুর্কী পত্রিকাগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। আর সেখান থেকে অনুবাদ হয়ে ২২ এপ্রিল, ১৯২৩ ঈসায়ী তারিখে হিন্দুস্তানী পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিটি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী, কালজয়ী, আবেগময় ও শিক্ষণীয়, আর আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর পথে জিহাদ করাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই চিঠিটি হতে আমাদের প্রত্যেককেই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

জীবনসঙ্গিনী আমার!

জীবন পথের একমাত্র পাথেয়, আনন্দ দানকারিনী প্রিয়া আমার!

সু-উচ্চ ও সু-মহান সত্ত্বা তোমার সংরক্ষক। তোমার শেষ পত্র আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। বিশ্বাস কর, তোমার এই পত্র সর্বদা বুকে জড়িয়ে রাখব। তোমার মায়ামাখা, প্রেমভরা স্নিগ্ধ অবয়ব আমি তো আর দেখতে পারব না, কিন্তু পত্রের ছত্রে ছত্রে, পরতে পরতে, অক্ষরসমূহে তোমার আঙ্গুলসমূহের নড়াচড়ার দৃশ্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, যে আঙ্গুলিগুলো আমার চুল নিয়ে মাঝে মাঝে খেলা করত। তাবুর রশিগুলোতে মাঝে মাঝে তোমার চেহারার আলোকচ্ছটা ও প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। তোমার অবয়বের ঝিলিক সর্বদা দৃষ্টিতে অনুভব করি।

আহ্! তুমি লিখেছ, আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছি, আর তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও প্রেমের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ আমার নেই। তুমি লিখেছ, তোমার সোহাগ ও মহব্বতপূর্ণ হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে এই দূর-দূরান্তে বিধ্বস্ত রণাঙ্গনে আগুন ও রক্ত নিয়ে আমি খেলা করছি। আর আমার এদিকে খেয়াল নেই যে, একজন নারী আমার বিচ্ছেদে সারারাত তন্দ্রাহীন নয়নে জেগে জেগে ছটফট করে আর তারকারাজি গণনা করতে থাকে। তুমি লিখেছ যে, আমার জিহাদের সাথে মহব্বত আর তরবারির সাথে প্রেম। কিন্তু কথাগুলো লেখার সময় ঘুর্ণাক্ষরেও তোমার এ কথা চিন্তায় আসেনি, তোমার এই শব্দ সম্ভার, যা তুমি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও খাঁটি মহব্বতের

গীতিতে লিখেছ, তা আমার হৃদয়ের রক্ত কিভাবে ঝরাবে, কিভাবে আমাকে হত্যা করবে?

ওগো প্রিয়া! আমি কিভাবে তোমাকে বিশ্বাস করাব, এই সুন্দর বসুন্ধরায় তোমার চেয়ে সুন্দর আর প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই নেই। তুমিই আমার সকল ভালোবাসার শেষ পরিধি! আমার মন আমি কাউকে কোনো দিন দেই নি, কাউকে কোনো দিন ভালোবাসিনি, কিন্তু কেবল তুমিই এমন, যে আমার হৃদয়কে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। ভাগ্যলিপি থেকে আমাকে তুমিই অপহরণ করে আমাকে তোমার দাস বানিয়েছ। বল, এরপর কিভাবে তোমার থেকে পৃথক হব, হে আমার প্রাণের প্রশান্তি? তোমার এমন প্রশ্ন যথাযোগ্য।

শোন! আমি তোমার থেকে এই জন্য পৃথক হই নি যে, আমি ধন-সম্পদের অন্বেষী, লোভী ব্যক্তি। এ জন্যও পৃথক হই নি যে, আমার জন্য শাহী সিংহাসন কায়েম করছি, যেমনটি আমার শত্রু পক্ষ প্রচার করছে। আমি তোমার থেকে কেবল এই জন্য পৃথক হয়েছি যে, আল্লাহ তাআলার ফরয বিধান আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'-র চেয়ে বড় কোনো গুরু দায়িত্ব আর নেই। এটাই এমন ফরয কাজ, যার নিয়্যত করার দ্বারাই জান্নাতুল ফিরদাউস অবধারিত হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ! আমি কেবল এই ফরযের নিয়্যত-ই করিনি; বরং তা বাস্তবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। তোমার বিচ্ছেদ আমার অন্তরে সর্বদা এমন এক করাত চালনা করে, যা অবর্ণনীয় ব্যথা সৃষ্টিকারী, তবে এই বিরহে আমি অত্যন্ত খুশি। কেননা, তোমার অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা এমন

এক অমূল্য জিনিস, যা আমার দৃঢ় ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ও চ্যালেঞ্জ ছিল!

আল্লাহ তাআলার হাজার শুকরিয়া যে, আমি এই পরীক্ষায় পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছি। আর আল্লাহর মহব্বত এবং তার হুকুমকে নিজের মহব্বত ও মনের চাহিদার উপর প্রাধান্য দিতে সক্ষম হয়েছি। তোমারও সন্তুষ্ট ও রাজি থাকা এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করা উচিত যে, তোমার স্বামী এত মজবুত ঈমান রাখেন যে, সে নিজে তোমার মহব্বতকে আল্লাহর মহব্বতের উপর কুরবানী করেছে।

তোমার উপর তরবারীর দ্বারা জিহাদ করা ফরয নয়, কিন্তু তুমিও জিহাদের হুকুম থেকে বাহিরে বা মুক্ত নও। তোমার জিহাদ হলো, তুমিও নিজের মন ও ভালোবাসার উপর আল্লাহর চাহিদা ও ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিবে। স্বীয় স্বামীর সাথে প্রকৃত মহব্বতের আত্মীয়তাকে আরো মজবুত রাখবে।

লক্ষ্য কর, কখনো এই দুআ করবে না, তোমার স্বামী জিহাদের ময়দান থেকে যে কোনো ভাবেই হোক সুস্থ ও নিরাপদে তোমার প্রেমের কোলে ফিরে আসুক। এটা হবে নিজ স্বার্থ পূরণের দুআ। আর এটা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়ও নয়। অবশ্য তুমি এমন দুআ করতে থাকো, আল্লাহ যেন তোমার স্বামীর জিহাদকে কবুল করেন, তাকে কামিয়াবীর সাথে ফিরিয়ে আনেন, অন্যথায় শাহাদাতের অমীয় সুধা তাকে পান করান। তুমি জান, আমার মুখ কখনো শরাব দ্বারা নাপাক হয়নি; বরং সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির দ্বারা তরতাজা ছিল।

ওগো প্রাণের প্রিয়া!

আহ্! সেই মুহূর্ত কতই না মুবারক হবে, যখন আল্লাহর রাহে এই মস্তক, যাকে তুমি খুব সুন্দর বলতে, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে! সেই শরীর তোমার মহব্বতের দৃষ্টিতে সিপাহীদের শরীর নয়; বরং মাশুকদের নয়নসমূহের ন্যায় কোমল। আনোয়ারের সবচেয়ে বড় আশা ও আকাঙ্ক্ষা হলো, সে শহীদ হয়ে যাবে। আর বীর শ্রেষ্ঠ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর সাথে যেন তার হাশর নাশর হয়। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যু তো সুনিশ্চিত। তাহলে মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কি অর্থ হতে পারে?

যখন মৃত্যু আসবেই, তাহলে মানুষ কেন বিছানায় পড়ে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুবরণ করবে? আল্লাহর রাহে শাহাদাতের মরণ তো মরণ নয়; বরং ওটাই প্রকৃত জীবন, অবিনশ্বর জীবন।

প্রিয় নাজিয়া! আমার অসীয়ত শুনে নাও।

যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার ছোট ভাই স্বীয় দেবর নূরী পাশার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিবে। তোমার পরে আমার কাছে তারই স্থান। আমি চাই যে, আমার আখিরাতমুখী সফরের পরে সে সারা জীবন বিশ্বস্ততার সাথে আস্থা ভরে তোমার খেদমত করে যাবে।

আমার দ্বিতীয় অসীয়ত এই যে, তোমার যতজন সন্তান-ই হোক না কেন, সকলকে আমার জীবনীর কথা শুনাবে। আর সকলকে জিহাদের ময়দানে ইসলাম ও দেশের খেদমতে প্রেরণ

করবে। যদি তুমি এমন না কর, তাহলে স্মরণ রেখ, আমি জান্নাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকব।

আচ্ছা! প্রিয়া নাজিয়া! বিদায়! জানি না, আমার অন্তর বলছে, এই পত্রের পর হয়তো তোমাকে আর কোনো পত্র লিখতে পারবো না। আজব কী, হতে পারে কালকেই শহীদ হয়ে যাবো। দেখ, তুমি ধৈর্য্য ধারণ করবে। তুমি আমার শাহাদাতে দুশ্চিন্তার পরিবর্তে আনন্দিত হবে যে, আল্লাহর রাহে আমি ব্যবহৃত হওয়া তোমার জন্য গৌরবের বিষয়।

সোনা আমার! এখন বিদায় নিচ্ছি। আমার কল্পনার জগতে তোমাকে শেষবারের মতো আরেকবার আলিঙ্গন করলাম, বিদায়ী চুমু খেলাম। ইনশাআল্লাহ, জান্নাতে দেখা হবে। এর পরে আর কোনো দিন তোমার-আমার বিচ্ছেদ হবে না।

তোমার আনোয়ার।

-তুরকানে আহবার' থেকে সংকলিত
লেখক: আব্দুল মজীদ আতীক্বি, পৃ: ১২৭-১৩০

উল্লেখ্য, হযরত আনোয়ার পাশা রাহিমাহুল্লাহ চিঠিটি লিখার ঠিক পরের দিনই শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার শাহাদাতকে কবুল করেন, জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মর্তবা দান করেন। আমাদেরকেও তাঁর সাথী হিসেবে শহীদী কাফেলার অন্তর্ভূক্ত করে নেন। আমীন।

পিতা মাতার প্রতি বিদায়ী চিঠিঃ

পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবা আমার!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহ!

আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন যেন আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি এবং পিতা মাতার অনুগত থাকি, আপনাদের মহব্বত করি, আপনাদের খেদমত করি। এগুলো সন্তান হিসেবে আমার উপর ফরয (অবশ্য করণীয়) দায়িত্ব। এগুলো আমাকে করতেই হবে। একই সাথে বিশ্বজগতের পালনকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে হুকুম করেছেন, যেন আমি তাঁকে, তাঁর রাসূলকে এবং তাঁর পথে জিহাদ করাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, ইসলামের জন্য নিজের যান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করি। এটিও আমার উপর ফরয করেছেন। তাই আমি আজ আল্লাহ তাআলার হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে জিহাদের ময়দানে যাচ্ছি।

উলামায়ে কেরাম বলেন, "ঈমান আনার পর প্রথম ফরয হচ্ছে, মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা। যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও কুফ্‌ফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর জিহাদ ফরযে আঈন হয়ে যায় (সবার উপর ফরয হয়ে যায়)। ঐ মুহূর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকে তার সন্তানের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না এবং স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীরও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।"

আর তাই জিহাদের যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের অনুমতির অপেক্ষা আমি করিনি। আপনাদেরকে না জানিয়েই চলে যাচ্ছি।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ, “আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। যারা ঈমানদার, তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।” (সূরা নিসা ৪:৭৫,৭৬)।

তিনি আরো ইরশাদ করেন, “আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে।” (সূরা বাকারা ২:১৯০) “আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি ও সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।” (সূরা বাকারা ২:১৯৩)

প্রিয় আম্মা-আব্বা আমার!

আপনারা দয়া করে একটু চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, মায়ানমার, কাশ্মীর, আসাম, চেচনিয়া, উইঘুর সর্বত্র কেবল মুসলিম নিধনের মহড়া চলছে। মুসলিম মায়ের বুক খালি করা হচ্ছে, বাবার সামনে সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য বাতিল তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মা! আমি বেঁচে থাকব আর এ পৃথিবীতে ঈমান, নামায, রোযা, হজ, যাকাত থাকবে না তা কী করে হতে পারে?
বাবা! আমি বেঁচে থাকবো আর দীন ইসলাম দুনিয়া হতে মিটে যাবে তা কী করে মেনে নেয়া যায়?
আমি যদি ঘরে বসে থাকি, আর এই হালতে আমার মৃত্যু চলে আসে, হায়! এই মুখ আমি কিভাবে আল্লাহকে দেখাব, আমার রাসূলের ﷺ সামনে আমি কিভাবে দাঁড়াব?

আমি কিভাবে ঘরে বসে থাকব, অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,
"৩৮. হে ঈমানদারগণ! এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (স্থায়ী কল্যাণের) তুলনায় (এ) দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবনকে নিয়েই বেশি সন্তুষ্ট? (অথচ) পরকালে (হিসাবের মানদন্ডে) দুনিয়ার মালসামানা নিতান্তই কম। ৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে) না বের হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৮-৩৯)

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ

কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তাআলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

আপনাদের উসীলায় আল্লাহ তাআলা আমাকে ঈমান দিয়েছেন, আপনারা আমাকে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে চিনিয়েছেন। আমি যা করেছি তা তো আল্লাহ তাআলার হুকুম আর তাঁর রাসূলের তরীকা ও সুন্নত, তাঁর যিন্দেগীর আদর্শ।

আপনাদের সন্তান হিসেবে যেভাবে আপনাদের খেদমত করার কথা ছিল, সেভাবে খেদমত করতে পারিনি। আজীবন আপনাদের কষ্ট দিয়েছি। আজীবন আপনাদের খেদমত নিয়েছি। আজীবন আপনাদের অবাধ্যতা করেছি। আপনাদের অনেক আশা ও স্বপ্ন ছিল, আপনাদের সন্তান অনেক বড় মানুষ হবে, পড়াশুনা শেষ করে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে, জায়গা-জমি ক্রয় করে বাড়ি করবে, গাড়ি করবে, নাতি নাতনীদের নিয়ে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে আর আপনারা আপনাদের সন্তানকে নিয়ে গর্ব করবেন। আহ্! আমি তো পারলাম না আপনাদের সে স্বপ্ন-কে বাস্তবায়ন করতে, আপনাদের চোখে-মুখে হাসি ফুটাতে, আপনাদের সারাজীবনের কষ্টকে ফলপ্রদ করতে। বলুন মা! আমি কিভাবে আপনার স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করব যখন দেখি, লাখো মায়ের স্বপ্নগুলোকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-ইহুদী-নাস্তিক-মুরতাদরা পদদলিত করে অঙ্কুরে হত্যা করছে? বলুন বাবা! আমার রক্তে কেন আগুন জ্বলবে না, যখন দেখি লাখো বোনের সম্ভ্রম নিয়ে জারজের বাচ্চারা তামাশা করছে, ছিনিমিনি

খেলছে? এসব দুনিয়ার ডিগ্রি-চাকরী-ব্যবসার কী মূল্য আছে আল্লাহ তাআলার কাছে, যদি আমি আল্লাহর জন্য নিজের জীবন দিতে না পারি? হ্যাঁ, দুনিয়াতে আপনাদের স্বপ্ন আমি বাস্তবায়ন করতে পারিনি, তাই বলে কখনো আপনাদের মুখে হাসি ফুটাতে পারবো না এমনটি নয়। আশা করি, আমার রব আমাকে ব্যর্থদের অন্তর্ভূক্ত করবেন না, না-কামিয়াব করবেন না। হাদীসে এসেছে, একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জন সদস্যদের জান্নাতে নেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করবে। আপনারা দুআ করেন যেন আমি তাদের শামিল হতে পারি। তাহলে, ইনশাআল্লাহ, কথা দিলাম, আপনাদেরকে ছেড়ে আমি কখনোই জান্নাতে যাবো না। আপনারা আমার জন্য এতো কষ্ট করেছেন, আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আপনাদের শুধু কষ্টই দিয়ে গিয়েছি, আর মৃত্যুর পর আমি একাকী সুখ ভোগ করবো আর আপনারা মৃত্যুর পরও কষ্ট করবেন, এটা কখনোই হতে পারেনা। ইনশাআল্লাহ, আমার রব কখনোই আপনাদের দুটি কষ্টকে এক করবেন না।

আপনারা গর্বিত হোন এজন্যে যে, আপনারা এমন কোনো কাপুরুষকে জন্ম দেন নি, যে জিহাদের তপ্ত ময়দানের লু হাওয়ার চেয়ে ঘরে বসে স্ত্রীর আচলে লুকিয়ে থাকাকে বেশি পছন্দ করে। আপনারা এজন্য গর্ববোধ করুন যে, আপনারা এমন এক সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা., হযরত মুসান্না বিন হারেস রা., হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস রা., হযরত যায়েদ রা., হযরত জাফর রা., হযরত তারিক বিন যিয়াদ রহ., হযরত সালাউদ্দিন আউয়ুবী রহ., হযরত সাইফুদ্দিন কুতয. রহ., হযরত মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ., হযরত ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম

রহ., হযরত উসামা বিন লাদেন রহ. এর পদাঙ্ক অনুসারী। আপনারা আমার জন্য দুআ করুন যেন আমি তাদের কাতারে শামিল হতে পারি।

আমি আপনাদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ করবো এবং আপনাদের কষ্টের সাগরে আরেকটু কষ্ট যোগ করে দিয়ে যাবো, আর তা হলো, আমি আমার স্ত্রী-সন্তানদের আল্লাহ তাআলার যিম্মাদারীতে আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, দয়া করে তাদের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন, আমার সন্তানদের যথাসাধ্য ভরণ-পোষণ ও পড়ালেখার ব্যবস্থা করবেন। এতে আপনারাও ইনশাআল্লাহ ময়দানে জিহাদের সওয়াব পাবেন। আর আমার স্ত্রী যদি আমার অনুপস্থিতিতে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চায়, তাকে আপনারা বাধা দিবেন না, সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন আর আমার সন্তানদের আপনাদের আশ্রয়ে রাখবেন। আর যদি আমার স্ত্রী আমার সন্তানদের তার সাথে রাখার ইচ্ছা পোষণ করে, দয়া করে আমার সন্তানদেরকে তার কাছে পাঠিয়ে দিবেন। আমার সন্তানরা পিতার আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, দয়া করে তাদেরকে মায়ের সোহাগ থেকেও বঞ্চিত করবেন না। দয়া করে তাদের খোঁজ-খবর রাখবেন।

জনম দুখী মা আমার!

একজন মা-ই জানেন তার বুক খালি হওয়ার কষ্ট কী! আপনার বুক খালি করে আমি চলে যাচ্ছি। অনন্তের পথে বিদায় নিচ্ছি। আপনাকে সান্তনা দেয়ার ভাষা আমার নেই। দয়া করে আপনি পরকালের লাভের আশায় ধৈর্য ধরুন। আপনি আমার কামিয়াবীর

জন্য দুআ করবেন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে ময়দানে দৃঢ়পদ রাখেন, কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ধ্বংস না হয়ে যাই, মৃত্যুকে যেন কখনো ভয় না পাই। হয়তো শরীয়ত, নয়তো শাহাদাত- এ দুটোর একটা যেন অবশ্যই আমি লাভ করতে পারি। আমিও আপনাদের জন্য সবসময় দুআ করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

চির স্নেহময় বাবা আমার!

আপনার কাছ থেকেও বিদায় নিচ্ছি। হয়তো এরপর আপনাদের সাথে আর কখনো দেখা বা কথা নাও হতে পারে। ইন্‌শাআল্লাহ হাশরের ময়দানে আবার দেখা হবে এবং জান্নাতে আমরা আবারো একসাথে বাস করব। তখন আপনাদেরকে আমি আর কষ্ট দিব না, তখন আপনাদের সব আশা পূরণ করব, কথা দিচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে আমার ভাই-বোনদের সালাম দিবেন। তাদের কাছ থেকেও আমি বিদায় নিচ্ছি।

আপনাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে খুব ভালো রাখুন। আল্লহুম্মা আমীন।

আপনাদের অতি আদরের সন্তান।

সন্তানদের প্রতি বিদায়ী অসীয়ত:

কলিজার টুকরা মানিকেরা আমার!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লহ!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে ইসলাম দিয়ে ধন্য করেছেন এবং আমাদেরকে সেই সকল হুকুম করেছেন যেই হুকুম তিনি পূর্ব যুগের নবী-রাসূলগণের উপর করেছিলেন। দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা ﷺ-এর প্রতি যাঁর যিন্দেগী ছিল কুরআন কারীমের বাস্তব নমুনা, যাঁর যিন্দেগী তাঁর উম্মতের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, আর যাঁর সীরাত মানেই বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ (সশস্ত্র সংগ্রাম)।

আল্লাহ তাআলার হুকুম, "আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে।" (সূরা বাকারা ২:১৯০)

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি ও সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (সূরা বাকারা ২:১৯৩)

স্নেহের মানিকেরা আমার!

আজ আমাদের প্রতিপালকের হুকুমকে বাস্তবায়ন করার সময় এসেছে। হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে জিহাদের অগ্নিগর্ভ ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কুরবানি করে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হয়তো এই যাওয়াই শেষ যাওয়া, আর তোমাদের সাথে দেখা হবে না। আমার অবর্তমানে তোমাদের জীবনে হয়তো অনেক কষ্ট আসবে, অনেক পেরেশানী আসবে, আমি আশা করবো তোমরা

সেগুলোকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করবে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে তিনিই তোমাদের প্রকৃত অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক তিনি!

তোমাদেরকে ছেড়ে যেতে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, যেন কলিজা ছিড়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তোমরা ছিলে আমার জীবনের শোভা, চলার পথের পাথেয়, ভবিষ্যতের সম্বল, তোমাদের দিকে তাকালে আমি জীবনের সকল ক্লান্তি, কষ্ট আর পেরেশানীগুলোকে ভুলে যেতাম। তোমাদের 'আব্বুজী' ডাক শুনার জন্য তীর্থের কাকের মতো প্রতীক্ষা করতাম। আমি বাসায় এলে যখন তোমরা দৌঁড়ে এসে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতে আমার কোলে উঠার জন্যে তখন আমার কি যে অনুভূতি ছিলো, তা হয়তো একজন স্নেহশীল বাবার জন্য জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। যখন আমি বাসা হতে বাহিরে যেতাম তখনও তোমরা আমাকে বিদায় জানানোর জন্যে দৌঁড়ে এসে সালাম-মুসাফাহা করতে, জড়িয়ে ধরতে, সেই দৃশ্য আমি কিভাবে ভুলব, বলো? বাসার বাহিরে থাকলে তোমরা মোবাইল করতে, 'আব্বুজী বাসায় কখন আসবেন?' আহ্! আমি তো আর আসতে পারবো না। রাতের বেলায় নবীজীর ﷺ সীরাত আর সাহাবাদের যুদ্ধের কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদেরকে আর ঘুম পাড়াতে পারবো না। আহ্! আমার হৃদপিণ্ড বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সোনারা তারপরেও আমাকে আল্লাহর হুকুম পালনার্থে তোমাদের সকল মহব্বতকে কুরবানী করতেই হবে। তোমাদের মতো লাখো নিষ্পাপ মুসলিম শিশুর রক্তের বদলা আমাকে নিতেই হবে। আমার মতো লাখো পিতার আহাজারির ইতি আমাকে টানতেই হবে। আজ শুধু

আমরা নই, কুফ্ফারদের বুক খালি করার সময় এসেছে। তাদের সন্তানদেরও ইয়াতীম করার সময় এসে গেছে। আমাকে তা করতেই হবে। আমার হাবীবের ﷺ উম্মতের রক্তের প্রতিটি ফোটার বিনিময়ে কুফ্ফারদের রক্ত প্রবাহিত করতেই হবে। চোখের বদলায় চোখ, দাঁতের বদলায় দাঁত। তোমরা সর্বদাই এই দোয়া করবে, যেন তোমাদের পিতা তার সংকল্প থেকে এক কদমও পিছপা না হন, তাকে আল্লাহ তাআলা ময়দানে কামিয়াবী দান করেন। পরিশেষে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করান। তোমরা সর্বোচ্চ ধৈর্য্যের পরিচয় দিবে। তাহলে তোমরাও জান্নাতুল ফিরদাউসে আমার সঙ্গী হবে। আমরা ইন্শাআল্লাহ আবারো জান্নাতে একসাথে থাকবো। একটু চিন্তা করো, একজন শহীদের কী মর্তবা হবে, তাকে কেমন জান্নাত দেয়া হবে, আর সে জান্নাতে যদি তোমরাও আমার সাথে থাক তাহলে কেমন মজা হবে!

আদরের মানিকেরা আমার!

আমি তোমাদেরকে কিছু অসীয়ত করে যাচ্ছি, ঠিকঠিক মতো পালন করার চেষ্টা করবে।

- ঈমান আনবে আল্লাহ তাআলার প্রতি, তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি। আল্লাহ তাআলার মহব্বত এবং নবীজীর ﷺ মহব্বত যেন তোমাদের অন্তরে সবচেয়ে বেশি থাকে।
- আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।
- সকল প্রকার কুফুরী, শেরেকী, বিদআতী আকীদা ও কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে।

- সকল কাজে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। যদি কোনো বস্তু সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও কিয়ামতের দিন উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছু দেখছেন, সবকিছুর খবর রাখেন।
- সকল প্রকার গুনাহের কাজ থেকে, বিশেষত অশ্লীল চিন্তা ও কাজ থেকে দূরে থাকবে। চোখ, মুখ ও অন্তরের ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক থাকবে। নারী-পুরুষের ফেতনা হতে সর্বোত্তম উপায়ে বেঁচে থাক। পরহেযগারীর যিন্দেগী গঠন করবে। মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট হতে বেঁচে থাকবে। রাস্তাঘাটে চলার সময় দৃষ্টি নত রাখবে। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বেশি বের হবে না।
- দুনিয়া থেকে বাঁচার সর্বোচ্চ এহতেমাম করবে। অল্পে তুষ্ট থাকবে। দীর্ঘ আশা পরিত্যাগ করবে। দুনিয়াদারদের দিকে ভুলেও তাকাবে না। দিনে একবেলা খাওয়া, সর্বোচ্চ দুই সেট জামা, কম দামী কাপড়, কম দামী জুতা ইত্যাদির অভ্যাস করবে। বাড়ি ঘরের জিনিসপত্র যত কম রাখা যায় ততই উত্তম। আল্লাহর রাসূলের ঘরের দিকে সর্বদা খেয়াল রাখবে।
- এই পরিমাণ সম্পদ যেন তোমাদের না হয়, যাতে করে তোমাদের যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আবার এত কমও যেন না হয় যেন অন্যের যাকাতের মাল তোমাদেরকে ভক্ষণ করতে হয়।
- নামায কায়েম কর, রোযা রাখ, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

- অহংকার করো না, অন্যকে ছোট ভেবো না, বরং নিজেদেরকেই সবসময় ছোট ভাববে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকেই বড় করে দিবেন।

- তোমাদের মাকে কখনো কষ্ট দিবে না। সবসময় মনে রাখবে, তাঁর পায়ের নীচে তোমাদের বেহেশত। তিনি যদি তোমাদের উপর বিন্দুমাত্র নারাজ হন, তাহলে জান্নাত তোমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে, জান্নাতের গন্ধও তোমরা পাবেনা। সারাজীবন মাকে মাথায় তুলে রাখবে, তার খেদমত করবে। আহ্! তোমাদেরকে তিনি কত কষ্ট করে দীর্ঘ দশ মাস গর্ভে রেখেছেন, তোমাদের জন্মের সময় কী কষ্টই না তাঁর হয়েছে, তোমাদেরকে বড় করতে তাঁকে কতই না ত্যাগ, আর ব্যথা-বেদনা সইতে হয়েছে! এ ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষী, আমি সাক্ষী, তোমাদের মা তোমাদের জন্য কতরাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। সজাগ থাকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, কিন্তু তোমাদের মা কখনো ঘুমাতে পারতেন না, শুধু তোমাদের জন্য। কত রাত তার মাথা ব্যথা উঠে যেত, তারপরও তিনি ঘুমাতে পারতেন না। কেন জানো? কারণ তোমরা রাত্রিতে সজাগ থাকতে। আহ্! কী কষ্টই না তিনি তোমাদের জন্য করেছেন! সুতরাং সাবধান, সাবধান! মায়ের সাথে সর্বোচ্চ ভালো ব্যবহার করবে, তাঁকে বিন্দু মাত্রও কষ্ট দিবে না, তাঁর মুখের উপর কখনো কথা বলবে না। কখনো তাঁর কোনো কাজ বা কথা তোমাদের মনঃপুত না হলে “উহ্” শব্দটিও বলো না, ভুলেও ধমক দিয়ো না, সর্বদা শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে। তাঁর সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দিবে। তাঁর সাধ্যের বাইরে কোনো আবদার কখনো করবেনা।

- তোমাদের মা তোমাদেরকে যেভাবে পড়াশুনা করতে বলেন, সেভাবে ঠিকমত পড়াশুনা করবে, উপকারী ইলম হাসিল করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের ইলম আগে হাসিল করবে, ঈমানী সবক আগে গ্রহণ করবে।
- কুরআন কারীমের তিলাওয়াত, যিকরুল্লাহ, মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ বেশি বেশি করবে।
- তিনটি বিষয় বেশি বেশি মুজাকারা করবে। এক. আল্লাহর বড়ত্বের কথা, দুই. নবীজী ﷺ ও সাহাবাদের সীরাত এবং তিন. আখিরাতের বিষয়সমূহ।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কখনো ভয় করবে না। বাতিলের সামনে কখনো মাথানত করবে না। আজীবন বাতিলের বিরুদ্ধে ময়দানে লড়ে যাবে। আমার সন্তান হয়ে যদি তোমরা কাপুরুষতার যিন্দেগী যাপন করো, কিয়ামতের দিন তোমাদের দিকে আমি ফিরেও তাকাব না। সাহাবায়ে কেরামের যামানায় নারীরাও পুরুষদের মতো সাহসী ছিল, আর বর্তমানে পুরুষরাও নারীদের মতো বরং তার চেয়ে বেশি ভীরু প্রকৃতির হয়ে গেছে। এদের মতো তোমরা হয়ো না।

সোনামানিকেরা আমার!

আমি তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। খুব শীঘ্রই ইন্‌শাআল্লাহ আমরা সকলেই আল্লাহর কাছে চলে যাবো, তখন আবার আমাদের মাঝে সাক্ষাত হবে। সেখানে আমরা সবসময় একসাথে থাকব, তোমাদেরকে ছেড়ে আর কখনো চলে যাবো না। ততদিন পর্যন্ত একটু ধৈর্য্য ধরো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ব্যর্থ করে দিবেননা, কেননা তিনি তো মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

আর কিছুই লিখতে পারছি না। বুক ফেটে কান্না আসছে! আহ্! তোমাদের চেহারাগুলো আর দেখতে পারবো না!!!

এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে। তোমাদেরকে আবারো আমি আল্লাহর জিম্মায় দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কষ্টগুলোকে আনন্দ দ্বারা বদল করে দিন। আমার অনুপস্থিতিতে তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আমীন।

-তোমাদের স্নেহময় পিতা।

সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ:

- বদরের যুদ্ধে পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। পুত্র-পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

- হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ রদিয়াল্লহু আনহু বদরের যুদ্ধে আপন কাফের পিতাকে হত্যা করেন।

- ওহুদের যুদ্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লহু আনহুর পুত্র আব্দুর রহমান তখনও মুসলমান হয়নি। বড় জোয়ান, তাগড়া ও শক্তিশালী ছিল। মুশরিকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছিল, আর বীরত্বের সাথে ঘোষণা দিচ্ছিল, কেউ আছে কি, যে আমার মোকাবেলা করবে? তার এ দাপট ভরা শব্দের ধ্বনি হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর কর্ণ কুহরে আঘাত হানছিল। তখন তিনি মহানবী ﷺ-এর পাশে বসা ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলেন, "আয় মুসলিম বাপের কাফের ব্যাটা! আমিই তোর মোকাবেলা করব।" এবং পুত্রের দিকে ধাবমান হলেন, যাতে করে তার মোকাবিলা করতে পারেন। মহানবী ﷺ হযরত

আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর হাত ধরে ফেললেন এবং ইরশাদ করলেন, হে আবু বকর! আপনার সত্ত্বা দ্বারা আমাদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন। (মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ৩, পৃ. ৪৭৩)

পরবর্তীতে আব্দুর রহমান মুসলমান হলেন। তখন তিনি একদিন তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুকে বললেন, যুদ্ধে আমার দৃষ্টি আপনার উপর পড়েছিল, ঐ সময় আপনাকে লক্ষ্য বস্তু বানানো আমার জন্য অনেক সহজ ছিল, কিন্তু আমি ওখান থেকে অন্য পার্শ্বে সরে গিয়েছিলাম, বিধায় আমি আপনাকে ইচ্ছা করেই হত্যা করিনি। হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, কিন্তু তুমি যদি আমার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হতে, তাহলে আমি তোমাকে ছাড়তাম না, বরং তোমাকে হত্যা করতাম। (তারিখুল খুলাফা)

- হযরত হানযালা রদিয়াল্লহু আনহু নতুন বিয়ে করেছেন মাত্র। উহুদের যুদ্ধের জন্য যখন আহ্বান জানানো হচ্ছিল, তখন তিনি ছিলেন বাসর শয্যায়। জিহাদের আহ্বান পাওয়ার সাথে সাথে তিনি জিহাদের জন্য যাত্রা শুরু করেন। ফরয গোসলের সময়ও তিনি পাননি। যুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি কাফেরদের ব্যূহ ভেদ করে তীব্র বেগে আবু সুফিয়ানের নিকট উপস্থিত হন। কাফের সেনাপতিকে তিনি আঘাত করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর শাহাদাত নির্ধারিত রেখেছিলেন। আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে তলোয়ার তোলার সাথে সাথে শাদ্দাদ হবনে আওস দেখে ফেলে এবং হযরত হানযালা রদিয়াল্লহু আনহু এর ওপর আকস্মিক আক্রমণ করে। এতে নববিবাহিত হযরত হানযালা রদিয়াল্লহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা প্রেরণ করেন এই নববরকে গোসল করানোর জন্য। (আর রাহীখুল মাখতুম, পৃঃ ২৫৫)

- তবুক যুদ্ধের ঘটনা। নবীজী ﷺ রোম অভিযানের জন্য ত্রিশ হাজার সাহাবী রদিয়াল্লহু আনহুমদের এক বিশাল জামাত নিয়ে তবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আবু খাইসামাহ রদিয়াল্লহু আনহু তখন মদিনার বাহিরে ছিলেন। নবীজী তবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনায় ফিরে দেখলেন যে, মদীনার রাস্তাঘাটে লোকজন নেই, পুরো শহর কেমন খালি মনে হচ্ছে, রাস্তাঘাটে কেবল কিছু অক্ষম বৃদ্ধ ও মুনাফিকদের দেখা যাচ্ছে। তিনি বাড়ি ফিরে দেখলেন, তাঁর দুই স্ত্রী বাগানের ভেতরে নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করছে। উভয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে পানি ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছে এবং স্বামীর জন্য পানি ঠাণ্ডা করে রেখেছে। তারা তাঁর জন্য খাদ্যও তৈরি করে রেখেছে। তিনি এসে তাঁবুর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভেতরে তাঁর দুই স্ত্রীর প্রতি নজর দিলেন এবং তাঁর আরাম আয়েশের জন্য তারা যে ব্যবস্থা করে রেখেছে তাও দেখলেন। উটের পিঠে বসা অবস্থায়ই এক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, নবীজী ﷺ কোথায়? স্ত্রী বললেন, আপনি তাঁবুর ভিতরে আসুন। নবীজী জিহাদের উদ্দেশ্যে তবুকের দিকে রওয়ানা হয়েছেন। তখন আবু খাইসামাহ রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, "নবীজী মরুর লু হাওয়া ও প্রখর তাপের মধ্যে রয়েছেন, আর আবু খাইসামাহ ঘরের ছায়ায় থেকে খানা খাবে ও স্ত্রীর আঁচলের নিচে অবস্থান করবে, এটা ইনসাফ হতে পারে না। আল্লাহর কসম আমি তাঁবুতে প্রবেশ করব না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে যাবো।" এই বলে তিনি তবুকের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

- হযরত বশির বিন উকবা রদিয়াল্লহু আনহুর একটি মাত্র ছোট ছেলে ছিল। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। ছেলেকে দেখার মতো দুনিয়াতে আর

কেউ ছিল না। এরই মধ্যে জিহাদের ডাক এলো। হযরত বশির বিন উকবা রদিয়াল্লহু আনহু ছেলেকে একাকী রেখেই আল্লাহর রাসূলের সাথে জিহাদে শরীক হয়ে গেলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন। জিহাদ থেকে ফিরলে ছেলেটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে তাঁর পিতার কথা জিজ্ঞাসা করলে নবীজী ﷺ চুপ রইলেন। ছেলেটি পরপর তিনবার তার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করলে নবীজী ﷺ কোনো উত্তর দিলেন না, চুপ রইলেন। অবশেষে বললেন, তোমার বাবা জিহাদে শহীদ হয়েছেন। আজ হতে আমিই তোমার পিতা। একথা বলে তিনি ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলেন।

- হযরত আসওয়াদ রদিয়াল্লহু আনহু দেখতে কালো ও কুৎসিত অবয়বের ছিলেন। তাই তার বিয়ে হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের ﷺ মধ্যস্থতায় এক সাহাবীর সুন্দরী মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ ঠিক হয়। এরই মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। বিয়ের প্রস্তুতি স্বরূপ তিনি মোহরানা বাবদ কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। জিহাদের ডাক এলে তিনি জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। অস্ত্র ক্রয় করার টাকা ছিল না। তাই মোহরানার টাকা দিয়ে অস্ত্র ক্রয় করেন। নবীজী ﷺ-এর সাথে জিহাদে শরীক হন। যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে যান।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন, যাদের কুরবানীর কারণে তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন। আমীন।

০২. পেশা

হালাল রুজি রোজগার অন্বেষণ করা একটি স্বতন্ত্র ফরয ইবাদত আর হালাল ভক্ষণ করা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। দুনিয়াতে চলতে গেলে এটি একটি প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে আমরা এই প্রয়োজন পুরা করাকেই যিন্দেগীর মাকসাদ বানিয়ে ফেলেছি। আমাদের যিন্দেগী রুজি অন্বেষণ কেন্দ্রিক হয়ে গেছে। পুরো যিন্দেগী আমরা এর পিছনে নষ্ট করি। একজন সন্তানকে স্কুল কিংবা মাদরাসায় ভর্তি করানো হয় এই নিয়তে যে, সে পড়ালেখা শেষ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, চাকরী-বাকরী করবে, ব্যবসা করবে, মাদরাসার খেদমত করবে আর টাকা পয়সা রোজগার করবে, সংসার চালাবে। ফলে সে তার কৈশোর আর যৌবন ব্যয় করে পড়ালেখা শিখতে শিখতে, লক্ষ্য থাকে দুনিয়া অর্জন। এদিকে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে পড়ার দরুন দ্বীনের জ্ঞান, দ্বীনী পরিবেশ থেকে দূরে থাকে, উপরন্তু বদ দীনের প্রভাবে ও নানা ফেতনায় পতিত হয়ে ঈমান হারায়, নাস্তিক হয় কিংবা চরিত্র বিসর্জন দেয়। আর যারা মাদরাসায় পড়ি তাদেরও মানসিকতা এই হয়, পড়ালেখা শেষ করে মাদরাসার খেদমত করব, কিংবা নিজেই একটি মাদরাসা খুলে বসব। পড়াশুনা শেষ করে হয়তো সে চাকুরীতে ঢুকে, নয়তো ব্যবসা করে কিংবা মাদরাসায় পড়ুয়া হলে কোনো এক মাদরাসায় খেদমতে ঢুকে। এদিকে সে বিবাহ করে পরিবার গঠন করে সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়। তাদেরকে আবার সে স্কুল কিংবা মাদরাসায় পাঠায় একই লক্ষ্যে, একই উদ্দেশ্যে- বড় হয়ে চাকুরী করবে। এরপর একদিন মালাকুল মওত এসে তাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যায়। এভাবেই উম্মতের যিন্দেগী বর্তমানে অতিবাহিত হচ্ছে। এটিকে আমি নাম দিয়েছি

'দুনিয়াদারীর দুষ্টচক্র'। কে বা কারা সুকৌশলে উম্মতকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে 'এটার নামই নাকি যিন্দেগী'!!!

চিত্রঃ দুনিয়াদারীর দুষ্টচক্র।

কি দীনদার, কি দুনিয়াদার, কি জাহেল, কি মাদরাসার আলেম, আমরা সকলেই এই দুষ্টচক্রের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছি। কিন্তু সাহাবাওয়ালা ইসলাম এই চক্রের ভিতরে নয়, বাহিরে! যদিও অনেকেরই মেনে নিতে কষ্ট হবে, কিন্তু এটাই চিরসত্য!

অপরিচিত ইসলাম.......

এখন আমার প্রশ্ন হলো, নবীজী ﷺ এবং তাঁর প্রিয় সাহাবাদের যিন্দেগী কী এমন ছিল? তাঁদের যিন্দেগী কী পেশা কেন্দ্রিক ছিল? তাঁরা কি আমাদের মতো দুনিয়াদারীর এই দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে ঘুরপাক খেতেন? যেহেতু তাঁরাই আমাদের আদর্শ, তাঁরাই আমাদের অনুসরণীয়, দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবীর জন্য তাঁরাই আমাদের মানদণ্ড, তাই আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীর দিকে তাকাতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পেশাঃ

নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে নবীজী ﷺ বাণিজ্য করেছেন, মেষ চরিয়েছেন। হিজরতের পূর্বে তিনি ইহুদীর বাগানে কাজও করেছেন। কিন্তু হিজরতের পর? আল্লাহর রাসূল ﷺ কি এ ধরণের কোনো কাজ করেছেন? না, করেন নি। তাঁর জন্য কোনো পেশায় আত্মনিয়োগ করা নিষেধ ছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَاةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

"তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি নিজেও তার উপর অবিচল থেকো, আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না, রিযিক তো তোমাকে আমিই দান করি; উত্তম পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।" (২০ সূরা ত্বহাঃ ১৩২)

তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ সংসার চালিয়েছেন কিভাবে? আল্লাহ চালিয়েছেন। কিভাবে চালিয়েছেন? তরবারি। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার রিযিক তরবারির ছায়াতলে।" মদীনার দশ বছরের

যিন্দেগীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছোট ও বড় ষাটোর্ধ্ব অভিযান চালিয়েছেন। আর এসব অভিযান হতে গণিমত হিসেবে লব্ধ সম্পত্তি আল্লাহর রাসূলের উপার্জনের প্রথম ও প্রধান মাধ্যম ছিল। এছাড়া উম্মত কর্তৃক প্রদত্ত হাদিয়া ছিল তাঁর জন্য আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে পবিত্র রিযিকের ব্যবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব হাদিয়া তিনি আবার গরীব সাহাবাদের মাঝে দান করে দিতেন। তিনি কখনো মানুষের সদকা বা যাকাতের মাল ভক্ষণ করতেন না। মদীনার যিন্দেগীতে তিনি কখনো ব্যবসা-বাণিজ্য-চাষাবাদ করেননি।

সাহাবায়ে কেরামের পেশা:

সাহাবায়ে কেরামেরও আয়ের প্রধান মাধ্যম ছিল "তরবারি"। গণীমতের মালের পাশাপাশি অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের আয়ের উৎস ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ বিশেষত: খেজুর চাষ। এককথায় সাহাবায়ে কেরাম সব ধরণের হালাল রুজি-রোজগার অবলম্বন করেছিলেন। তাহলে আমাদের সাথে তাঁদের পার্থক্য কোথায় ছিল?

- ✓ সাহাবায়ে কেরামের পেশাভিত্তিক কার্যক্রম তাদেরকে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে গাফেল করতো না।
- ✓ তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য, চাষাবাদ, ইলমী ও অন্যান্য দ্বীনী খেদমত তাঁদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হতে বাঁধা দিত না। বরং যারা এসব কারণ দেখিয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করতো তাদেরকে 'মুনাফিক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো।

✓ তাবুকের যুদ্ধের সময়কার কথা। তখন প্রচণ্ড গরমের মৌসুম ছিলো, সফর ছিলো অনেক দূরের। মদিনায় তখন খুব অভাব চলছিলো এবং খেজুরের ফসল ঘরে তুলার মাত্র এক সপ্তাহের মতো বাকী। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁর সাহাবীগণকে রোম অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং সবাইকে এ জন্য মসজিদে মাল জমা করতে বললেন। একটু চিন্তা করুন, যে খেজুর ছিলো মদীনার সাহাবীদের প্রধান আয়ের উৎস, তার মধ্যে আবারো ছিলো দুর্ভিক্ষ। ফসল ঘরে তুলার মাত্র এক সপ্তাহের মতো বাকী। এ সময়ে জিহাদের জন্য ভিন্ন দেশে গমন করা কতটা কঠিন ছিলো! সাহাবায়ে কেরাম কী করলেন? জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মসজিদে সকল সাহাবায়ে কেরাম তাদের সাধ্যের চাইতে বেশি মাল নবীজী ﷺ-এর নিকট এনে জমা করতে লাগলেন। এই সময়ই হযরত উমর রাদিয়াল্লহু আনহু তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক হাজির করেন আর হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এনে উপস্থাপন করেন আর ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে রেখে আসেন।

অবশ্য মদীনায় এমন একটা শ্রেণি ছিল, যারা তাদের খেজুরের চিন্তা করছিল। ফসল তুলতে না পারলে পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষে পতিত হতে হবে, আর সারা বছর খাবে কি, না খেয়ে মরতে হবে, এই ভয় করছিল। তারা নানা অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিল। অন্যদেরকেও যুদ্ধে যেতে অনুৎসাহিত করার জন্য তারা একে অন্যকে বলতে লাগলো, এই গরমে বের হইয়ো না। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করেন, "এবং তারা বলে যে, এই গরমে তোমরা বের হইয়ো না, আপনি তাদেরকে বলুন, জাহান্নামের আগুন আরো বেশি উত্তপ্ত। তারা এখন কিছু আনন্দ

করুক, পরে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে অনেক কাঁদতে হবে।"
(৯ সূরা তাওবা: ৮১-৮২)

এই শ্রেণিটাই ছিলো মুনাফেক শ্রেণি। সুতরাং আমাদেরকে খুব ভয় করা দরকার, রাসূলের ﷺ যামানার মুনাফেকদের সাথে আমাদের চরিত্রের কেমন জানি অদ্ভূত মিল পাওয়া যায়! (আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিফাক থেকে হেফাযত করুন। আমীন।)

✓ মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু-এর সাহায্যার্থে খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু যে বাহিনী পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক পবিত্র কুরআনের হাফেয এবং সুমিষ্ট কারীও ছিলেন। সে সময়ে হাফেয এবং কারীরাও তীর-তলোয়ারে সমান পারদর্শী হতেন। কেবল মসজিদ-মাদরাসা নিয়ে ব্যস্ত থাকার মতো লোক সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন না।

࿊ আমাদের সমাজে কি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি পেশার লোকের প্রয়োজন নেই?

এতক্ষণের আলোচনার প্রেক্ষিতে হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আপনি তো মনে হয় বুঝাতে চাচ্ছেন, সমাজের সকলকে জিহাদ করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। তাহলে কি সমাজে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার লাগবে না? কিছু মানুষকে এগুলো হওয়া তো ফরযে কিফায়া?

উত্তর:

✓ এগুলো ফরযে কিফায়া, ঠিক আছে। কিন্তু বর্তমানে জিহাদ করা ফরযে আইন। এখন আপনিই বলুন, ফরযে আইন আগে করতে হয়, নাকি ফরযে কিফায়া?

✓ সাহাবায়ে কেরামের যামানায় যখন জিহাদের ডাক আসত, তখন আলেম থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, দিন মজুর, সকল পেশার মানুষকেই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতো, ঘরে বসে থাকলে তাকে মুনাফিক সাব্যস্ত করা হতো। জিহাদই (উহুদের যুদ্ধে) সর্বপ্রথম সাহাবাদের জামাত থেকে মুনাফিকদের চিহ্নিত করেছিল।

✓ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান, "ঘোড়ার ললাটে ইয্যত রয়েছে। আর গরুর লেজে রয়েছে লাঞ্ছনা।" অর্থাৎ মানুষ যখন জিহাদে লিপ্ত হবে, তখন তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের ইয্যত ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে তারা সমাসীন থাকবে। আর যখন জিহাদ পরিত্যাগ করে গরুর লেজের অনুসরণ করবে, লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে ক্ষেত-খামারে লিপ্ত হবে, তখন মুসলমান জাতি হবে লাঞ্ছিত, অপদস্থ। যেমনটি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে, পৃথিবীর প্রতিটি আনাচে কানাচে।

✓ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ)

আল্লাহর রাসূল ﷺ জিহাদকে দ্বীনের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ থেকেই জিহাদের গুরুত্ব বুঝে আসে। দ্বীনের অস্তিত্ব জিহাদের সাথে কিভাবে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তাও এ হাদীস থেকে বুঝা যায়।

✓ইসলামের মেজাজ হলো, মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে বসে সারা দুনিয়াতে ন্যায়, ইনসাফ কায়েম করবে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করবে, পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। এটা মুসলমানের যিন্দেগীর প্রথম কাজ ও ফিকির হতে হবে। আর অন্য সকল জাতি মুসলমানদের খেদমত করবে, গোলামী করবে। বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমারা আজ মুসলমানদের সেই আসন দখল করে আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারা কী করছে? তারা সারা দুনিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছে আর সারা পৃথিবীর মেধাগুলোকে তারা ক্রয় করে তাদের উপকারে, তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। মুসলমানরাও একসময় তাই করতো। সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ রাহিমাহুল্লাহ কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কামান বানিয়েছিলেন। সেটির ইঞ্জিনিয়ার কে ছিল? একজন খ্রিস্টান। চিন্তা করুন, একজন খ্রিস্টান আরেক খ্রিস্টান সাম্রাজ্য দখল করার জন্য

মুসলমানদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কামান বানিয়ে দিল। কেন? কারণ, মুসলমানরা তখন বিশ্বের নেতৃত্বে ছিল। আর তারা দুনিয়ার তাবৎ মেধাকে নিজেদের কাজে লাগাতে পেরেছিল। ত্বগুতের মেধাকে ত্বগুতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পেরেছিল। তাই মুসলমানদেরকে গরুর লেজ ত্যাগ করে ঘোড়ার লাগাম ধরতে হবে, এর মাঝেই অধিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

✓ তাছাড়া যখন খিলাফত কায়েম হবে, তখন খিলাফতের প্রয়োজনে যা যা দরকার তখন করা যাবে। এখন প্রয়োজন আল্লাহর ডাকে প্রত্যেকের সাড়া দেয়া।

হালাল উপার্জন ও হালাল রিজিক সম্পর্কিত কিছু বিষয়

✓ হারাম, মাকরূহ বা সন্দেহপূর্ণ (অর্থাৎ যেখানে জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার কোন দিক স্পষ্ট নয়-এরূপ) পন্থায় সম্পদ উপার্জন হতে বিরত থাকতে হবে।

✓ রিজিক অন্বেষন করতে গিয়ে কোনো ফরয বা ওয়াজিব বা সুন্নত কাজে যদি বিঘ্ন ঘটে তাহলে সে পেশা পরিত্যাগ করা। যেমন: যে সব পেশায় পর্দা রক্ষা হবে না (ফরয হুকুম লঙ্ঘন হলো), কিংবা জামাতে নামায আদায় করা যাবে না (ওয়াজিব হুকুম লঙ্ঘন হলো), কিংবা দুপুরে বিশ্রাম নেয়া যাবে না (সুন্নত হুকুম লঙ্ঘন হলো), সেসব পেশা পরিত্যাগ করতে হবে। ছোট্ট একটি সুন্নতের সামনে সমস্ত আসমান যমিনের কি মূল্য আছে?

✓ সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে বা বীমা কোম্পানিতে চাকরী করা হারাম।

- সুদ নেয়া, সুদ দেয়া, সুদের দালালী করা, সুদের দলিল লেখা, সুদী লেনদেনে সাক্ষী হওয়া ইত্যাদি, সুদের সাথে যে কোন রকমে সম্পর্কিত হওয়া হারাম।
- সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে টাকা জমা রাখা জায়েয নয়। কারণ এতে সুদ ভিত্তিক কারবারের অন্যায়ে সহযোগিতা করা হয়। মুসলমানদের এই পরিমাণ অর্থ-সম্পদ হবে কেন, যার কারণে তাকে ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে হয়? এটা সাহাবাওয়ালা মেজাজ নয়, নবীওয়ালা যিন্দেগী নয়। ব্যাংকের সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক রাখা যাবে না।
- বর্তমানে প্রচলিত 'বীমা' সুদ ও জুয়ার সমষ্টি বিধায় তা করানো জায়েয নয়।
- আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করা যাবে না, এমন বিচারকের পদে চাকুরী করা জায়েয নেই। এমন করাটা কুফুরী।
- যেসব রাষ্ট্র কুফুরী মতবাদ (যেমন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি) অনুযায়ী পরিচালিত হয়, সেসব রাষ্ট্রের সরকারী এমন পদ যার উপর সরকারের অস্তিত্ব টিকে থাকা নির্ভর করে (যেমন: প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রশাসন, আইন, বিচার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ইত্যাদি) পদে চাকুরী করা জায়েয নেই, বরং কুফুরী, যেহেতু এসকল ক্ষেত্রে সরাসরি কুফরকে অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখা হয়। এরা কুফরের গোষ্ঠী। অনেক ক্ষেত্রে এসকল চাকুরীর কারণে "মুরতাদ" হয়ে যেতে হয়। তাই সরকারী এসব চাকুরী থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।
- তবে কুফুরী মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে না বরং জনকল্যাণমুখী, এসব পদে (যেমন: চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি) চাকুরী

করা যেতে পারে, তবে না করা উত্তম। কেননা এতে জালেমের হয়ে কাজ করতে হয়। জালেমের গোলামী করতে হয়।

- ঘুষ গ্রহণ করা হারাম।
- ফটোগ্রাফারের পেশা, নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা, অভিনয় ইত্যাদির পেশা নাজায়েয।
- রেডিও, টেলিভিশন ও গান বাদ্যের উপকরণ মেরামতের পেশা বৈধ নয়।
- স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির চাকুরী হালাল নয়, কেননা, এখানে দুনিয়াদারী, বদদ্বীনী শিখানো হয়, পর্দার লঙ্ঘন করা হয়। যদি আর কোনো গুনাহ নাও হয়, তবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সেখানে দুনিয়ার কীট গড়া হয়, উম্মতকে ধ্বংসের পথ দেখানো হয়, 'ওয়াহন' ঢুকিয়ে দেয়া হয়।
- সুন্নত বা ওয়াজিব আমল লঙ্ঘনে সহযোগিতা হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যেমন: নাপিতগিরি করা। অবশ্য শেভ্ করা না হলে সমস্যা নেই। মনে রাখতে হবে, একটি শব্দ বা কথা দিয়েও যদি কেউ অন্যায়/ নাফরমানীর কাজে সহযোগিতা করে তাকেও সেই অন্যায়কারী/ নাফরমান হিসেবে ধরা হবে।
- এমনিভাবে যেসব বস্তু গোনাহের উপকরণ সেগুলোর ব্যবসা করা ও মেরামত করার পেশা নাজায়েয।
- যে সব দ্রব্যাদির ব্যবহার অবৈধ, হারাম ঔষধ, ইসলাম বিরোধী বই-পুস্তক ইত্যাদির ব্যবসা করা নাজায়েয।
- মানুষের জরুরতের জিনিসের ব্যবসা করেন। হালাল টাকা দিয়ে হারাম, অপ্রয়োজনীয়/অনর্থক (লা ইয়ানী) জিনিস, সুন্নতের বিপরীত জিনিসের ব্যবসা করাও হালাল নয়। যেমন: হালাল টাকা দিয়ে মদের ব্যবসা করা

হালাল নয়। হালাল টাকা দিয়ে খেলনা, ফুচকা, কোক-ফান্টা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসা করা হালাল নয়। তেমনি, হালাল টাকা দিয়ে শার্ট-প্যান্ট, শাড়ি ইত্যাদি সুন্নতের বিপরীত জিনিসের ব্যবসা হালাল নয়।

- ✓ যেসব চাকুরীতে বা কাজে দুপুরের পরেও সময় দিতে হয় (যেমন গার্মেন্টস এর চাকুরী, বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজের ব্যবসায়ীরা রাত এগারটা/বারটা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখেন), সে সকল চাকুরী বা কাজ যদি বাধ্যতামূলক হয় তাহলে তা না করাই উত্তম, আর বাধ্যতামূলক না হলে, নিজের ইচ্ছাধীন হলে, দুপুরের পর ব্যবসা গুটিযে ফেলতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম দুপুরের পর রিযিকের ফিকির করতেন না। ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে ফেলতেন। এরপরেও কাজ করতে থাকা, দুনিয়ার লোভ, খেলাফে সুন্নত, অনেক ক্ষেত্রে বিদআত।
- ✓ কোনো হালাল পেশাকে তা যতই ছোট মানের হোক না কেন তাকে সম্মানজনক মনে করবে।
- ✓ সম্পদ রক্ষার স্বার্থে কেউ নিহত হলে সে শাহাদাতের ছওয়াব লাভ করবে।
- ✓ ব্যবসায়ের মাঝে আল্লাহ তাআলা অনেক বরকত রেখেছেন। একজন সৎ ব্যবসায়ী হাশরের ময়দানে নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে।
- ✓ কিছু না পারলে মজদুরি করা। মজদুরির ঘামের দ্বারা আল্লাহ পাক ঐ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন যা হজ্জ, রোজা বা নামাজের মাধ্যমে বান্দা ক্ষমা পায়নি।

- ✓ তবে সকল ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, কোনো পেশাই যেন আমাকে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদে বের হতে অন্তরায় না হয়।
- ✓ আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম পেশা হলো "তাকওয়া", যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার রিযিক পৌঁছে দিয়ে থাকেন। তিনি ইরশাদ করেন,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجاً- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ

"যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে (অর্থাৎ নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখে ও আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করে) আল্লাহ পাক সকল বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেন এবং এমন জায়গা থেকে তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।" (৬৫ সূরা ত্বলাক: ২-৩)

তাই রিযিক নিয়ে, বিশেষতঃ পেশা নিয়ে বেশি চিন্তা বা পেরেশানী না করি। আমার সাধ্যের মাঝে যা করতে পারি তাই করি আর আল্লাহকে ভয় করি। জিহাদের জন্য কদম বাড়াই। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী গড়ি। রিযিক আল্লাহ পাকের জিম্মায়। তিনিই আমার ও আমার পরিবারবর্গের রিযিক দানের জন্য যথেষ্ট।

সাহাবায়ে কেরাম সরকারি লোকদের খুবই অপছন্দ করতেন

সরকারী চাকুরীতে সারা দেশের মানুষের হক্ব জড়িত থাকে। কেননা সরকারী চাকুরীজীবীদের বেতন সরকার সাধারণ মানুষের ট্যাক্স থেকে দিয়ে থাকে। তাই কাজে ফাঁকি দিলে, কিংবা ডিউটি ঠিকমত না করলে কিয়ামতের দিন দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাছাড়া যদি চাকুরী এমন হয়, যার উপর তৃগুত সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে তা অনেক সময় কুফুরী ও ইরতিদাদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই সাহাবায়ে কেরাম সরকারী চাকুরীকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এরকম একটি কাহিনী শুনুন।

হযরত আবু যর রদিয়াল্লহু আনহুর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। তাঁর স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। তিনি শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন- কাঁদছ কেন?

স্ত্রী বলল- আমি কাঁদছি এজন্য যে আপনাকে কাফন দেওয়ার মতো ক্ষমতাও আমার নেই। আপনার এমন কোনো কাপড়ও নেই যা কাফন হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

তিনি অবিচল আস্থার সঙ্গে বললেন- কেঁদো না; কারণ, রাসূল ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে বলেছিলেন-'তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জন-মানবহীন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে। তার দাফন, কাফন ও জানাযায় একদল মুমিন উপস্থিত হবে।' যাঁদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমিও তাদের মধ্যে একজন। যাঁরা ঐ মুহূর্তে ছিলেন তাঁরা সবাই বিভিন্ন জনপদে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমিই জন-মানবহীন স্থানে মৃত্যুবরণ করব। আল্লাহর কসম! তিনি মিথ্যা বলেননি, আমিও মিথ্যা বলিনি। তুমি যাতায়াত পথে নজর রেখো।

স্ত্রী হতাশ কণ্ঠে বললেন- কোথা থেকে মানুষ আসবে। হজের মৌসুম পার হয়ে গেছে।

স্ত্রী টিলার উপর দাঁড়িয়ে পথে নজর রাখতেন। আবার ফিরে এসে সেবা করতেন। আবার টিলায় ফিরে যেতেন। পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এভাবে একটি কাফেলা দেখতে পেলেন। বস্ত্রখণ্ড উঁচিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। তার চেষ্টা সফল হলো। কাফেলা কাছে এসে বলল- কী হয়েছে?

-একজন মুসলমান মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তিনি ইন্তেকাল করলে তোমরা কাফন দিবে।

- কে তিনি?

- রাসূলের প্রিয় সাহাবী আবু যর গিফারী।

তারা তাঁর কাছে গেল। তখন তিনি মৃত্যুর খুব কাছে।

আবু যর গিফারী রদিয়াল্লহু আনহু তাদের বললেন- "যদি আমার কাপড় অথবা আমার স্ত্রীর কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন যথেষ্ট হয়, তাহলে অন্য কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দেবে না। আমি তোমাদের আল্লাহ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে বলছি- তোমাদের মাঝে যদি কেউ প্রশাসক থাকে কিংবা কোনো ধরনের সরকারি কাজের সাথে সম্পৃক্ত কেউ থাকে সে যেন আমাকে কাফন না দেয়।"

তিনি যে গুণাগুণের লোকের কথা বললেন তেমন শুধু একজন আনসার যুবক ছিল।

সে বলল- হে চাচা! আমি আপনার কাফন দেব। আপনি যে গুণের লোকের কথা বলেছেন আমি সে গুণসম্পন্ন। আমি আমার পরনের এ চাদর আর আমার মায়ের সেলাই করা এ দুটো কাপড় দিয়ে আপনার কাফন

দেব। এ দুটি জামা মা আমার জন্য বানিয়েছিলেন। আনসারী যুবক তাকে কাফন দিলো।

নবীজী ﷺ-এর মাদরাসা কার্যক্রম পরিচালনা এবং দৈনন্দিন রুটিন:

কুরআন-হাদীস পড়িয়ে টাকা পয়সা নিবে না। এটি কেয়ামতের একটি আলামত। (মুসনাদে আহমদ-১৯৮৯৮)

দয়া করে রাগ করবেন না! ধৈর্য্য ধরে কথাগুলো আগে শুনুন। আমি এ বিষয়ে কোনো যুক্তি তর্কে যেতে চাইনা। এখানে জায়েয-নাজায়েযের কথা হচ্ছে না। আমি যে ইসলাম নিয়ে কথা বলছি, সেটি হলো নবুওয়তের যামানার ইসলাম। আমি শুধু আপনাদের সামনে 'মাদরাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নবীওয়ালা আদর্শ কী' তা তুলে ধরবো। যারা কথাগুলো মানতে পারবেন তারা মানবেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে শুরু করে কোনো সাহাবী কোনোদিন কাউকে দ্বীন শিখিয়ে অর্থ উপার্জন বা রুজী রোজগার করেননি। আল্লাহর রাসূলের মাদরাসার (মসজিদে নববীর) ত্বলেবে এলেম সাহাবায়ে কেরামগণ ছিলেন। তারাও কখনো দ্বীন শিখানোর বিনিময়ে আল্লাহর রাসূলকে বেতন দেন নি।

আল্লাহর রাসূলের মাদরাসার ক্লাস সারাদিন ব্যাপী চলতো না। মাদরাসার ঘণ্টা চলতো ফযরের পর থেকে চাশত পর্যন্ত। এই মাদরাসা থেকেই বের হয়েছে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির, সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস্‌, সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ, সর্বশ্রেষ্ঠ দাঈ, সর্বশ্রেষ্ঠ সালেকীন, সর্বশ্রেষ্ঠ সিপাহ-সালারগণ, খুলাফায়ে রাশেদাগণ। আল্লাহর রাহে কুরবানি করে শরীয়তকে বাস্তবায়ন করার মানসিকতা থাকলে কয়েক ঘণ্টার ক্লাসেই এগুলো সম্ভব।

আর আমলের মানসিকতা না থাকলে চব্বিশ ঘণ্টা ক্লাস করালেও শুধু জ্ঞান অর্জনই হবে, ইসলাম ও মুসলিমের কোনো ফায়দা হবে না। জিহাদের ডাক এলে আল্লাহর রাসূলের মাদরাসার কার্যক্রম বন্ধ থাকত, সকলেই জিহাদে যোগদান করতেন। জিহাদ থেকে ফিরে আবার সবাই মাদরাসার কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতেন।

ক্লাসের ফাঁকেই নবীজী ﷺ ইশরাক আদায় করে নিতেন। চাশতের নামায আদায় করে সবাই যার যার মতো রিযিকের তালাশে বেরিয়ে পড়তেন। এদিকে চাশত পড়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ পালা অনুযায়ী আম্মাজানদের ঘরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। সেখানে তিনি গৃহস্থালীর কাজ আঞ্জাম দিতেন। প্রায়ই ঘরের বিভিন্ন কাজ তিনি নিজেই করতেন। যেদিন তিনি খানা খেতেন সাধারণত এই সময় খেতেন। যোহরের আগে কিছু সময় বিশ্রাম নিতেন (কাইলূলা করতেন)। ঐদিকে অধিকাংশ মশহুর সাহাবী যোহর পর্যন্ত রিযিকের সন্ধানে ব্যস্ত থাকতেন। যোহরের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ অনেক সময় বাজারের কার্যক্রম পরিদর্শন করতেন। দোকানদারদের দিকে দৃষ্টি দিতেন। তাদের পণ্যদ্রব্যের মান যাচাই করতেন এবং মাপ ও ওজন ঠিকমত দেয়া হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করতেন। জনপদে ও বাজারে কোনো অভাবগ্রস্ত থাকলে তিনি তার অভাব দূর করতেন। আসরের পর তিনি একেক করে সকল আম্মাজানদের গৃহে গমন করতেন এবং কুশলাদি বিনিময় করতেন। মাগরিবের পর রাত্রি যাপনের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ যে আম্মাজানের পালা হতো তাঁর ঘরে চলে যেতেন। প্রায়ই সকল আম্মাজান এসে সে ঘরে জমায়েত হতেন। মদীনার মহিলারাও অনেক সময় এসে সেখানে সমবেত হতেন। কারণ আল্লাহর

রাসূল ﷺ সে সময় মহিলাদের দ্বীন শিক্ষা দিতেন। এ মজলিশটি প্রকৃতপক্ষে নারী শিক্ষালয়ের রূপ ধারণ করতো। এভাবেই চলতো নবুওয়তী মাদরাসার কার্যক্রম। ঈশার নামায আদায় করে নবীজী ﷺ দ্রুত শুয়ে পড়তেন। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে পড়তেন। তাহাজ্জুদে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে 'কিয়ামুল্লাইল' করতেন, যার ফলে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। (ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম ﷺ : পৃ.৩৮০-৩৮১)

পরবর্তীতেও অনেক সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈগণ দিনের একটি অংশ দ্বীন শিখা ও শিখানোর কাজে ব্যয় করতেন, আরেকটি সময় আয়-রোজগারের জন্য ব্যয় করতেন, কিছু সময় পরিবার পরিজনদের দিতেন, একটি অংশ ব্যক্তিগত কাজ করতেন, বাকী সময় ইবাদতে কাটাতেন। আর জিহাদের সময় হলে সব ফেলে ময়দানে চলে যেতেন। একথা চিন্তা করতেন না যে, আমি ময়দানে গেলে আমার মাদরাসার কী হবে? আমি শহীদ হয়ে গেলে আমার ত্বলাবাদের কী হবে? আমি শহীদ হয়ে গেলে দ্বীনের ক্ষতি হয়ে যাবে!!!

যখন জিহাদ ফরযে আঈন হয়ে যায়.....

যখন জিহাদ ফরযে আঈন হয়ে যায়, তখন উম্মতের সকলের উপর একটি পেশাই অনুমোদিত, আর সেটি হলো 'তরবারি'র পেশা অর্থাৎ জিহাদ। এটি ব্যতীত অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত হওয়া গুনাহে কবীরা। অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত হওয়া জায়েয নেই। মাদরাসাওয়ালাদেরকে মাদরাসা ছাড়তে হবে, তাবলীগওয়ালাদের তাবলীগ ছাড়তে হবে, খানকাহওয়ালাদের খানকাহ ছাড়তে হবে, রাজনীতিওয়ালাদের রাজনীতি ছাড়তে হবে, ব্যবসাওয়ালাদের ব্যবসা ছাড়তে হবে, ডাক্তারকে ডাক্তারী ছাড়তে হবে, ইঞ্জিনিয়ারকে ইঞ্জিনিয়ারী ছাড়তে হবে, চাকুরীওয়ালাদের চাকুরী ছাড়তে হবে, ছাত্রদেরকে পড়াশুনা ছাড়তে হবে, কৃষিজীবীদের কৃষি, খেত-খামার ও গরুর লেজ ছাড়তে হবে। যদি না ছাড়া হয়, সে ফাসেক, গোনাহে কবীরা করনেওয়ালা, আল্লাহ তাআলার ফরয হুকুম তরক করনেওয়ালা, হোক সে আল্লামা কিংবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা বা ক্বারী, হোক সে গ্র্যান্ড মুফতী কিংবা শাইখুল ইসলাম, হোক সে শাইখুল হাদীস কিংবা শাইখুল কুরআন, হোক সে শামসুল উলামা কিংবা নাযমুল উলামা, হোক সে যামানার শ্রেষ্ঠ আলেম কিংবা শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, হোক না সে শ্রেষ্ঠ পীরে কামেল, হোক না সে শ্রেষ্ঠ দাঈ ইলাল্লাহ, সে যাই হোক না কেন, তার নামের আগে "ফাসেক" উপাধি যোগ হবে। মনে রাখবেন, এসকল টাইটেল বা উপাধি সাহাবাদের যামানায় ছিল না।

হ্যাঁ, নবুওয়তের যামানায় অবশ্য দুইটা টাইটেল ছিল। কেননা, সাহাবাদের জামাতে দুই শ্রেণির মুসলমান ছিল। এক. খাঁটি মুসলমান, দুই. মুনাফিক।

যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, তাঁরা ছিলেন খাঁটি মুসলমান আর যাঁরা জিহাদ ত্যাগ করতো, তারা ছিল মুনাফিক। তাই বর্তমান সময়েও দ্বীনের সকল কাজ করার পরেও জিহাদ ত্যাগ করার কারণে 'মুনাফেক' হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি আল্লাহর রাসূলের যামানায় ছিল।

দ্বীনতো সেটিই আছে, কিন্তু আমাদের মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে, 'হেকমত' নামের ভূত সকলের মাথায় চেপে বসেছে। যে যত বেশি জিহাদ থেকে পালানোর পন্থা উদ্ভাবন করতে পারি, সে তত বেশি হেকমতওয়ালা!!!

দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আমরা যারা দুনিয়ার গোলাম, দুনিয়া নিয়েই যাদের ভোর আর দুনিয়া নিয়েই যাদের সন্ধ্যা, যাদের মন-মগজের ভিতর পুরোটাই দুনিয়া, তাদের অবস্থা কী হবে, একটু চিন্তা করি। বর্তমান যামানাই সেই যামানা, যেই যামানায় জিহাদ সকলের উপর ফরযে আঈন। আল্লাহ তাআলা চাইলে, এই যামানাই ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের যামানা। এখন আর অন্য কোনো কিছু করার সুযোগ কারোর নেই। আগে জিহাদ, পরে অন্য কিছু!!!

০৩. ধন-সম্পদঃ টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, জায়গা-জমি, বাহন

ধনাসক্তির নিন্দনীয়তা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বাণীঃ

- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

"তোমাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র হতে বিরত না রাখে। যারা বিরত থাকবে, নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত।" (৬৩ সূরা মুনাফিকুনঃ ৯)

- আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

"জেনে রেখো, তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে (আল্লাহ তাআলার) পরীক্ষামাত্র (তিনি দেখবেন, তাঁর ডাকে তোমরা এগুলোকে কুরবানী করতে পারো কিনা), (আর যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তার জন্য অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে।"

(৮ সূরা আনফালঃ ২৮)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب "তোমাদের একেকজনের সম্বল যেন হয় মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ।"

- রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, "ধন-সম্পদের প্রতি আসক্তি ও প্রভুত্বের লিপ্সা হৃদয়ের মধ্যে এমনভাবে মুনাফেকী উৎপন্ন করে যেমন, পানি ঘাস উৎপন্ন করে থাকে।"

- নবীজী ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "ধনৈশ্বর্য ও মান-মর্যাদার মোহ মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে তার দ্বীনদারীকে এমন সাংঘাতিকরূপে ধ্বংস করে থাকে, বকরীর পালের মধ্যে দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ প্রবেশ করেও এমনভাবে ক্ষতি করতে পারে না।"

- রাসূলে আকরাম ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের হাতে ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি দুনিয়া হতে নিজের অভাব মোচনের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক কিছু গ্রহণ করবে, সে তার নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে; অথচ সে টেরও পাবে না যে, তার সর্বনাশ হচ্ছে।"

- তিনি আরোও বলেন, "মানুষ 'আমার ধন'! 'আমার সম্পদ!' বলে সর্বদা চিৎকার করে। (অথচ তোমরা বুঝতে পার না যে, ধন-সম্পদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক কতটুকু!) এছাড়া (পার্থিব) ধন-সম্পদে তোমাদের আর কি অধিকার আছে যে, যেটুকু তোমরা আহার করলে তা নষ্ট করে ফেললে, আর যেটুকু তোমরা পরিধান করলে তা পুরাতন ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললে, আর যেটুকু তোমরা আল্লাহ তাআলার নামে গরীব-

মিসকিনকে (ও আল্লাহর রাস্তায় দান করলে) তা নিজের কল্যাণের জন্য চিরকালের জন্য সঞ্চয় করলে।”

অর্থাৎ মানুষের সম্পদ মূলত ততটুকুই, যতটুকু সে নিজে খাবে, নিজে পরবে আর যতটুকু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। আর বাকী সম্পদটুকু তার নয়, তার ওয়ারিশদের, যাদের জন্য সে তার যিন্দেগী বরবাদ করে।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৩)

কতটুকু ধনসম্পদ হাসিল করা প্রশংসনীয়ঃ

এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো, “ধনসম্পদ মুমিনের জন্য বিষতুল্য। তবে আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য সহায়ক যতটুকু ধন-সম্পদ প্রয়োজন, একজন মুমিন ততটুকুই ধনসম্পদ অর্জন করবে।”

এই মূলনীতির ব্যাখ্যাঃ

- ধন-সম্পদ বলতে ‘টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি, বসত-বাড়ি, সোনা-রূপা, আসবাবপত্র, বাহন- যেমনঃ গাড়ি, ঘোড়া’ ইত্যাদি উদ্দেশ্য।
- আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য সহায়ক খাতসমূহ হচ্ছে সেই খাত সমূহ যেগুলোতে খরচ করতে আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন, যেমন-
  - ✓ নিজের এবং অধীনস্থ পরিবার-পরিজনদের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, গৃহস্থালি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির জন্য ব্যয়।
  - ✓ বিলাসিতা না হয়, এমন পরিমাণ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়।
  - ✓ নিজের এবং অধীনস্থদের ইলম চর্চার জন্য আনুসঙ্গিক ব্যয়।
  - ✓ চিকিৎসা ব্যয়।
  - ✓ গৃহপালিত পশু-পাখি পালন বাবদ ব্যয়।

✓ আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত, হিজরত এবং জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়।

- দারিদ্র্যের সীমা: দারিদ্র্য যেন এই পরিমাণ না হয়, যেই অবস্থায় শয়তান দারিদ্র্যের কারণে দীলের মাঝে কুফুরী এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা সৃষ্টি করার সুযোগ পায়।
- ধনাঢ্যের সীমা: **ধনসম্পদের প্রাচুর্য যেন এই পরিমাণ না হয়, যাতে করে একজন মানুষের উপর যাকাত ফরয হয়ে যায়।** অর্থাৎ সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তা জমানোর প্রয়োজন যেন না পড়ে। এটাই রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর হাতেগুনা দুই একজন সাহাবী বাদে সকলের যিন্দেগীর সুন্নত। আল্লাহ তাআলা সকল সাহাবায়ে কেরামকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

- এই কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতেন, "হে পরওয়ারদেগার! মুহাম্মাদের সন্তানদেরকে অভাব মোচনের (দুনিয়ার যিন্দেগী চলে যায়) পরিমাণ সম্পদ দান করুন।" কেননা, তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, এরচেয়ে কম সম্পদে যেমন কুফুরির গন্ধ আছে, তেমনি এর চেয়ে বেশি সম্পদে ধ্বংস বা বিনাশের গন্ধ আছে।

- হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু "প্রয়োজন পরিমাণ" সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।
  তখন তিনি আমীরুল মুমিনীন। একবার তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে মিষ্টি খাওয়ার আবদার করলেন। তিনি জানালেন, তাঁর কাছে মিষ্টি খাওয়ানোর মতো কোনো অতিরিক্ত টাকা নেই। তিন মাস পর তাঁর স্ত্রী কিছু দীনার তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো দিয়ে আমাকে মিষ্টি এনে

দিন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই দীনারগুলো তুমি কোথায় পেলে? তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন, আপনি প্রতি মাসে খোরাকি বাবদ যে পরিমাণ টাকা তুলে দেন, তা থেকে বাঁচিয়ে জমা করেছি। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লহু বললেন, তার মানে প্রতি মাসে এই পরিমাণ উপার্জন না হলেও আমার সংসার চলে। তখন তিনি ঐ দীনারগুলো বাইতুল মালে জমা করে দিলেন এবং তাঁর জন্য নির্ধারিত বেতন থেকে ঐ পরিমাণ অংশ কমিয়ে নিলেন, যে পরিমাণ তাঁর স্ত্রী প্রতি মাসে জমা করতো।

- মাল জমা করা যাবে না। এটা সুন্নতের খেলাফ। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন,“ হে আদম সন্তান! তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল খরচ করে দাও, এটি তোমার জন্য মঙ্গলজনক আর তা জমা করে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গলজনক।” (মুসলিম, মেশকাত)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, “আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে তবুও আমি এটি পছন্দ করব না যে, তার কিছু অংশ আমার নিকট তিন দিনের অধিক থাকুক। হ্যাঁ, কর্জ/ঋণ পরিশোধের জন্য রাখা যেতে পারে।” (মেশকাত)

অর্থাৎ যা রোজগার হবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমা রাখা যাবে না। আল্লাহর রাস্তায়/গরীব মিসকিনকে দান করে দিতে হবে। তবে ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার নিয়তে অর্থ-কড়ি জমানো যাবে।

একটু চিন্তা করুন! আমরা যারা ভবিষ্যতে জায়গা ক্রয় করার জন্য অর্থ জমাচ্ছি, বাড়ি করার জন্য অর্থ জামাচ্ছি, গাড়ি ক্রয় করার জন্য অর্থ জমাচ্ছি, কিংবা সরকারী চাকুরী এই আশায় করি যে, শেষ বয়সে পেনশন

মিলবে (পরোক্ষভাবে সরকারের ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছি), তাদের যিন্দেগী কতটুকু সুন্নতওয়ালা যিন্দেগী, তাদের যিন্দেগী কতটুকু নবীওয়ালা, কিংবা সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী?

মাল জমাকারী মুসলমানের স্থান জাহান্নামের হুতামাহ নামক স্থান। মাল খুব খরচ করা, কিন্তু অপচয় করা যাবে না। যে অপচয় করে সে শয়তানের ভাই, আল্লাহ পাক তার মাল থেকে বরকত উঠিয়ে নেন এবং সে কোটি টাকা কামাই করলেও তাকে আল্লাহ পাক মানুষের মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন। সে সব সময়ই অভাবে থাকে। যে প্রয়োজনীয় বিষয়ে অপচয়ে অভ্যস্ত হয়, খুব শীঘ্রই সে হারাম বিষয়ে খরচে লিপ্ত হবে। আর যে হারাম বিষয়ে খরচে অভ্যস্ত হয়, খুব শীঘ্রই সে ইসলামের বিভিন্ন আহকামকে অবজ্ঞা করা শুরু করবে। তাই খুব বিচক্ষণতার সাথে মাল খরচ করা চাই। কখনোই ঋণ না করা চাই।

এবার চলুন দেখা যাক, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, দুই জাহানের বাদশাহ, সাইয়্যেদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুনিয়াতে কতটুকু সম্পত্তির মালিক ছিলেন, এই দুনিয়া থেকে তিনি কতটুকু গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আমাদের জন্য কী "উসওয়াতুন হাসানাহ" রেখে গেছেন?

নবী করীম ﷺ এর বিষয়-সম্পত্তি:

একজন মানুষের বিষয় সম্পত্তি, ঘরের জিনিসপত্র এবং পরিত্যক্ত সম্পদ দেখলেই বুঝা যায়, তার আসল পেশা কী? তার যিন্দেগী কেমন ছিল? নবী করীম ﷺ -এর কাছে যে সকল জিনিস ছিল, তার মধ্যে অধিকাংশই হলো তাঁর জিহাদের সরঞ্জাম। যেমন:

- ঘোড়া — ৭ টি
- খচ্চর — ২ টি
- তরবারি — ৯ টি
- লৌহ বর্ম — ৭ টি
- ঢাল — ২ টি
- বর্শা — ৫ টি
- শিরস্ত্রাণ — ২ টি
- তীর

তাঁর কাছে একটি ছড়ি (লাঠি) ছিল। এটি হাতে নিয়ে তিনি চলতেন, এর উপর ভর দিয়ে যানবাহনে আরোহন করতেন এবং এটি উটের পিঠে ঝুলিয়ে দিতেন। তাঁর কাছে একটি হাতল লাগানো কাঠের পেয়ালা এবং একটি কাচের পেয়ালাও ছিল।

আর একটি পেয়ালা ছিল, যা তাঁর চার পায়ীর নীচে রাত্রিকালে পেশাব করার জন্য রাখা থাকতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি মশক এবং পাথরের পাত্রও ছিল, যা দ্বারা তিনি ওযু করতেন। কাপড় ধোয়ার পাত্র এবং হাত ধোয়ার পাত্রও ছিল। একটি বড় পেয়ালা ছিল, যাতে চারটি হাতল ছিল এবং চার ব্যক্তি বহন করত। এছাড়া ছিল একটি "মুদ্দ" (ওজন করার পাত্র)।

নবীজী ﷺ-র সফরের সামানা:

নবীজী ﷺ যখন কোনো সফরে যেতেন, তখন তিনি নিম্নোক্ত জিনিসগুলো একটি থলেতে করে সাথে নিয়ে যেতেন-

আতর	সুরমা দানী
মিসওয়াক	তেলের শিশি
আয়না	কেঁচি (২টি)
(সেগুন কাঠের) চিরুনী	কাঠের কাঠি

কাঠের কাঠিটি মাথা চুলকানোর কাজে ব্যবহার হতো। মাথা চুলকানোর প্রয়োজন হলে তিনি সরাসরি হাত ব্যবহার করতেন না।

এগুলো ছাড়াও নবীজী ﷺ সাথে একটি রুমাল রাখতেন। ওযু করার পর অঙ্গসমূহ মোছার কাজে এটি ব্যবহৃত হতো।

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত এগুলোই ছিল রসূলুল্লাহ এর গোটা যিন্দেগীর সম্পদ ও আসবাব পত্র। (যাদুল মা'আদ)

নবী করীম ﷺ এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি:

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রদিয়াল্লহু আনহা বলেন, "রসূলুল্লহ ﷺ এর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে না ছিল দীনার, না দেরহাম এবং না ছাগল, না উট।" হযরত ওমর ইবনে হারেসের হাদীসে

আছে,"রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় অস্ত্র, একটি খচ্চর ও সামান্য জমি ছাড়া কিছুই ছেড়ে যাননি। এই সামান্য জমিটুকুও সদ্‌কা করে দেয়া হয়েছিল।" (কিতাবুশ শেফা)

হযরত আনাস রদিয়াল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পুরাতন হাওদায় বসে হজ্জ করেছিলেন। এর উপর পশমের চাদর বিছানো ছিল, যার মূল্য চার দেরহামের বেশি ছিল না। এ অবস্থায়ই তিনি দুআ করেছিলেন:

"হে আল্লাহ! একে খাঁটি হজ্জে পরিণত করুন, যাতে রিয়া ও নাম-যশ না থাকে।" অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হজ্জ তখন করেছিলেন, যখন তাঁর সামনে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার খুলে দেয়া হয়েছিল। তিনি এ হজ্জে কোরবানীর জন্যে একশ উট সাথে নিয়ে যান। (কিতাবুশ শিফা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পূর্বমুহূর্তে তাঁর অসুস্থতা ও ব্যথার তীব্রতা খুব বৃদ্ধি পেলো। তিনি বার বার বেহুশঁ হয়ে যাচ্ছিলেন। আম্মাজান আইশা রদিয়াল্লহু আনহার কাছে ছয় বা সাতটি দিনার রাখা ছিলো। একবার হুঁশ ফিরে আসার পর নবীজী ﷺ আম্মাজানকে সেই দীনারগুলো দান করে দিতে বললেন। তারপর তিনি আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আম্মাজান সেবা সুশ্রূষার কারণে দিনারগুলো দান করে দিতে ভুলে গেলেন। এরপর নবীজী ﷺ-এর আবার হুঁশ ফিরে আসলে আম্মাজানকে জিজ্ঞাসা করলেন, দিনারগুলোর কি হলো? আম্মাজান বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার অসুস্থতার কারণে আমি সেগুলো দান করতে পারিনি। তখন নবীজী ﷺ বললেন, আল্লাহর নবীর কী ধারণা, যদি সে এগুলি নিজের কাছে রেখে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে? তখন সেই দিনারগুলো দান করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

এসময় আল্লাহর রাসূলের ﷺ ঘরে বাতি জ্বালানোর মতো কোন তেল ছিল না। আম্মাজান আইশা রদিয়াল্লহু আনহা একজন আনসারি মহিলার কাছ থেকে ফেরত দেয়ার শর্তে একটু তেল ধার করে নিয়ে আসেন।

হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর তোমার হাবীবের ﷺ প্রতি, সকল আম্মাজানদের প্রতি, এবং সকল আহলে বাইতের প্রতি। আমীন।

মানুষ কেন কাপুরুষ হয়?

পারস্যের একটি শহর হীরা শহর। পারস্যের সেনাবাহিনী মুসলমানদের নিকট মর্মান্তিক পরাজয় বরণ করার পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লহু আনহু গণীমতের মাল সংগ্রহ করার অনুমতি দেন। এটা যেহেতু আমীর শ্রেণির লোকদের অধ্যুষিত শহর ছিল, তাই ঘরে ঘরে মূল্যবান সম্পদ এবং বস্ত্রের সম্ভার ছিলো। মুজাহিদরা কিছু কিছু জিনিস দেখে রীতিমত অবাক হচ্ছিলেন। এ সকল দামী বস্তু তারা স্বদেশে নিয়ে যাবার আগ্রহ ব্যক্ত করতে থাকেন। মাল-সম্পদ জমা করা হলে হযরত খালিদ রদিয়াল্লহু অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে থাকেন।

"আগুনে জ্বালিয়ে দাও এসব বস্তু-সামগ্রী", হযরত খালিদ রাদিয়াল্লহু আনহু নির্দেশ দিয়ে বলেন, "এগুলো ভোগ-বিলাসের সামগ্রী ও উপকরণ। এ সব সম্পদই মানুষকে কাপুরুষ বানায়। তাদের পরিণতি দেখ। তাদের মহল এবং ঘর-বাড়ি দেখ। খোদার কসম! আল্লাহ যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে ভোগ-বিলাসিতায় নিক্ষেপ করেন।....."

দান করার ব্যাপারে কিছু কথা:

- হুযুর ﷺ এরশাদ করেন, "ছদকা দেওয়ার ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ কর, কেননা মছীবত ছদকাকে ফেড়ে অগ্রসর হতে পারে না।" (মেশকাত)

- একটি দুর্বল হাদীছে আছে, ছদকা মছীবতের সত্তরটা দরজা বন্ধ করে দেয়। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, "আপন মালকে যাকাতের দ্বারা পবিত্র কর, সদকা দ্বারা রোগীর চিকিৎসা কর আর মছীবতের ঢেউ সমূহকে দোয়া দ্বারা প্রতিহত কর।"

- অন্য এক হাদীসে আছে, "ছদকা কবরের গরমকে দূর করে দেয়, এবং মানুষ কেয়ামতের দিন স্বীয় ছদকার ছায়াতলে থাকবে।" (অর্থাৎ ছদকা যত বেশি হবে, ছায়াও তত বেশি হবে।)

- কৃপণতা সর্বাবস্থায় পরিহার করতে হবে। দীলের মাঝে মালের মহব্বত থেকেই কৃপণতা (বখীলী) পয়দা হয়। তাই যত পারা যায় দান করতে হবে।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। দান করতেন অত্যধিক। রমজানে এ দানের পরিমাণ আরো বেড়ে যেত। দানশীলতায় নবীজী ﷺ প্রবল বাতাসের চেয়েও দ্রুত ধাবমান ছিলেন।

- দানের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো- এত কম দান করা যাবে না, যাতে হাত কাঁধের সাথে বেধে রাখার মতো অবস্থা তৈরি হয়, আবার এতো উদার হস্তও হওয়া যাবে না যাতে করে নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হয়। মধ্যমপন্থাই উত্তম।

- কেউ হাত পাতলে তাকে ফিরিয়ে না দেয়া। অল্প কিছু হলেও দেয়া। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মতো দানশীল কেউ কখনো ছিল না। তিনি কাউকে

কোনোদিন ফিরিয়ে দেননি। কেউ তাঁর কাছে হাত পাতলে আর কিছু দেয়ার মতো সামর্থ্য না থাকলে ধার কর্জ করে হলেও অন্যকে দান করেছেন। বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে নবীজী ﷺ-এর নিকট হাদিয়া আসত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তা আবার গরীব সাহাবীদের মাঝে দান করে দিতেন।

- কোনো মানুষকে বড় অংকের দান করার আগে দেখতে হবে আসলেই সে অভাবী কিনা। কেননা বর্তমানে রাস্তাঘাটে অনেক ফকীর পাওয়া যায়, যাদের উপর যাকাত ফরয।

- আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি দান করতে হবে। মসজিদ, মাদরাসায়, দাওয়াতী কাজে, জিহাদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে। জিহাদের প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করতে হবে। কেননা, এতে সওয়াব সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়ত, মানুষ দান বলতে মসজিদ, মাদরাসায় দানই বুঝে। তাই এক্ষেত্রে দাতার অভাব নেই। কিন্তু জিহাদের প্রয়োজনে ব্যয়, মুজাহিদদের প্রয়োজনে ব্যয়, তাদের রেখে যাওয়া অসহায় পরিবার পরিজনদের জন্য ব্যয় করার মানুষ নেই, তাই এই খাতে ব্যয় করা অত্যন্ত জরুরী। এতে করে ঘরে বসেও জিহাদের সওয়াব হাছিল হবে। (তাই বলে জিহাদে না যাওয়ার গুনাহ থেকে বাঁচা যাবে না।)

- অন্য ভাইকে জিহাদ ও হিজরত করতে সহযোগিতা করতে ব্যয় করা। তাবুক যুদ্ধে যোগদান করার জন্য আনসার ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে সাতজন মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে সওয়ারী জানোয়ার চাইলেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। নবীজী ﷺ তাঁদেরকে সওয়ারী বাহন দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। ফলে তাঁরা জিহাদে যেতে না পেরে

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান। ইতিহাসে এরা 'বাকাউন' অর্থাৎ ক্রন্দনকারী নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে দু'জন হযরত আবু লায়লা আব্দুর রহমান ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রদিয়াল্লহু আনহুমাকে কাঁদতে দেখে হযরত ইবনে ইয়ামীন ইবনে উমায়ের রদিয়াল্লহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কাঁদছ কেন?" তাঁরা বললেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়েছিলাম তাবুক অভিযানে যাওয়ার জন্য সওয়ারী চাইতে। কিন্তু তিনি দিতে পারেননি। আমাদের কাছেও এমন কিছু নেই যা দ্বারা তাঁর সাথে অভিযানে যেতে পারি।" তখন ইবনে ইয়ামীন তাদেরকে একটি উট এবং কিছু খোরমা দিলেন। তাঁরা ঐ সওয়ারীতে চড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অভিযানে চলে গেলেন।

- হক্কানী পীর-সাহেব, উলামায়ে কেরামদের সাথে মহব্বত বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। তাই তাদেরকে বেশি বেশি হাদিয়া দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, তাদেরকে বিল্ডিং বানিয়ে দেয়া, কিংবা দুনিয়া ভোগের কোনো সামগ্রী দেয়া যাবে না (যেমন: এ.সি কিনে দেয়া), বরং নগদ অর্থ, কিংবা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেয়া যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয়, আগে খোঁজ নেয়া, তাঁদের কোনো অভাব বা পেরেশানী আছে কিনা, যদি জানা যায়, তাহলে সেমতে তাঁদের অভাবকে পূরণ করা, পেরেশানীকে দূর করার চেষ্টা করা।

- মসজিদ, মাদরাসায় দান করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যতক্ষণ বুনিয়াদী কাজ চলতে থাকবে ততক্ষণ সেখানে দান করবে। পানি, ওযু ও টয়লেটের ব্যবস্থা করার জন্য দান করবে। যদি এই দান মসজিদ বা মাদরাসার শোভা বর্ধন, যেমন টাইল্স লাগানো, রঙ-বেরঙের লাইটিং

ইত্যাদির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, কিংবা এসি লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহলে দান করা যাবে না। এটা দ্বীন নয়। এটা অপচয় ও দুনিয়াদারী। কিয়ামতের আলামত তৈরিতে সহযোগিতা করা যাবে না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এবাদতের সম্পর্ক কষ্টের সাথে। কষ্ট-মুজাহাদার সাথে যে ইবাদত করা হয় তাতে নূর থাকে বেশি।

০৪. মৌলিক চাহিদাসমূহঃ পানাহার, বস্ত্র, বাসস্থান, গৃহের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

যেসব জিনিসের উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেগুলোকে 'মৌলিক চাহিদা' বলে। এগুলো হলো- ক. পানাহার, বস্ত্র, বাসস্থান, গৃহের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। বর্তমান যামানায় কোটিতে একজন মুসলমান পাওয়া যাবে না, যিনি এই তিনটি বিষয়ে সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী। হয়তো কিছু বিষয়ের উপর আমল করা হয়ে থাকে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীকে সামনে রাখলে একথা বুঝে আসে যে, আমরা আসলে উনাদের যিন্দেগীর অনুসারী নই। অথচ এগুলো এমন কয়েকটি বিষয় যেগুলো হতে মানুষের পৃথক হওয়ার সুযোগ নেই। একজন মানুষের প্রতিদিনের জীবনে তাকে খেতেই হয়, পোশাক পরিচ্ছেদ না পরিধান করে সে থাকতে পারেনা, ঠিক তেমনিভাবে মাথা গোজার জন্য একটি ঠাঁই তার লাগবেই। অপরিহার্য এই বিষয়গুলোতে কেমন ছিলেন আমাদের নবীজী ﷺ? আর তাঁর উম্মত হিসেবে আমরাই বা কতটুকু উনার অনুসরণ করি? চলুন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং তাঁর নিজ হাতে গড়া প্রিয় সাহাবীদের সাথে আমাদের যিন্দেগীর একটু তুলনা করা যাক।

ক. পানাহার:

পানাহারের ক্ষেত্রে প্রিয় নবীজী ﷺ -এর সুন্নতগুলোকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। যথা:

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ খানার কী কী আদব (দুআ ও তরীকা) শিক্ষা দিয়েছেন?

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ কী কী খানা বেশি পছন্দ করতেন, এবং কী কী অপছন্দ করতেন?

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ কতক্ষণ পর পর কী পরিমাণ খেতেন?

বর্তমানে দ্বীনদার মহলে আহারের সুন্নত বলতে কেবল প্রথমটিকেই বুঝায়, আর দ্বিতীয়টির প্রচলন অল্প-বিস্তর কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয়টি? এই সুন্নতটি একদম উঠে গিয়েছে, এবং পানাহারের ক্ষেত্রে এটিই অপরিচিত (গরীব) সুন্নত। অথচ সাহাবায়ে কেরাম এই সুন্নতটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কেননা, দুনিয়াদার হওয়া না হওয়ার সাথে সম্পর্ক কেবল তৃতীয় সুন্নতটির আর তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম এটিকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের সাথে আমল করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন/চারদিন পরপর আহার করতেন, তাও পেট ভরে নয়, পাকস্থলির তিনভাগের একভাগ বা আরো কম। অধিকাংশ সাহাবাদের অভ্যাস এটিই ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লহু আনহু একাধারে ছয়দিন অনাহারে থাকতেন। তাও তাঁরা একবারে এক তরকারীর বেশি কখনো আহার করতেন না।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করার ফযীলত সংক্রান্ত কতগুলো হাদীস -

১. হাদীস- "তোমরা ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা সহ্য করে নিজ নিজ প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম কর। এই সংগ্রামে কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদের সমান সওয়াব মিলবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করা অপেক্ষা অন্য কোনো কাজ আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় নয়।"

২. হাদীস- "যে ব্যক্তি পেট পুরে আহার করে, বেহেশতের দিকে তার জন্য পথ মুক্ত হয় না।"

৩. হাদীস- "পুরাতন কাপড় পরিধান কর, অর্ধ পেট ভরে পানাহার কর, এটি নবীসুলভ কাজের অংশবিশেষ।"

৪. হাদীস- তাফাক্কুর তথা আল্লাহ তাআলার ধ্যান করা অর্ধ ইবাদত আর অল্প পরিমাণে আহার করা পূর্ণ এবাদত।"

৫. হাদীস- "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ধ্যান করে এবং ক্ষুধার যাতনা সহ্য করে, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম, আর যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আহার করে এবং অধিক পরিমাণ নিদ্রা যায়, সেই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার শত্রু।"

৬. হাদীস- "অতিরিক্ত পানাহার করে তোমরা তোমাদের অন্তরকে প্রাণহীন বানিয়ে ফেলো না। কেননা, তোমাদের অন্তর শস্য ক্ষেত্রস্বরূপ। ক্ষেতে অতিরিক্ত পানি হইলে ক্ষেত অনুর্বর ও নির্জীব হয়ে পড়ে।"

৭. হাদীস- "পেটের চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট কোনো জিনিসকে মানুষ পূর্ণ করে না। যে কয়টি লোকমা তার মেরুদণ্ড সবল ও সোজা রাখতে পারে,

সে কয়টি লোকমা আহার করাই যথেষ্ট। অগত্যা যদি বেশি খেতেই হয়, তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য, এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নির্ধারিত করবে।" অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, "শেষ তৃতীয়াংশ আল্লাহ তাআলার যিকিরের জন্য রাখবে।"

৮. হাদীস- মুমিন এক ভুঁড়ি পুরা করে আহার করে আর মুনাফেক সাত ভুঁড়ি পুরে আহার করে। অর্থাৎ মুনাফেকের খাদ্যের পরিমাণ মুমিন ব্যক্তি অপেক্ষা সাতগুণ।

৯. হাদীস- একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে হযরত হুযাইফা রদিয়াল্লহু আনহুর ঢেকুর উঠেছিল। এতে হুযুর ﷺ বললেন, "এই ঢেকুর দূরে রাখ। কেননা, ইহলোকে যে ব্যক্তি খুব তৃপ্তি সহকারে ভোজন করবে, সে পরকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকবে।"

১০. এক হাদীসে জীব্‌রীলে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ তাআলা বান্দাদের তিনটি কাজ অত্যন্ত পছন্দ করেন, **এক.** জান-মাল খরচ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, **দুই.** গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করা এবং **তিন.** ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতঃ ছবর করা।" (মুনাব্বেহাত, হাফেয ইবনে হাজার রহ.)

১১. একদিন মা ফাতেমা রদিয়াল্লহু আনহা একটি রুটি নিয়ে নবীজী ﷺ এর দরবারে আসলে নবীজী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফাতেমা! তোমার হাতে এটি কি?' হযরত ফাতেমা রদিয়াল্লহু আনহা নিবেদন করলেন, "আমি একটা মাত্র রুটি বানিয়েছি, আপনাকে এর কিছু অংশ না দিয়ে নিজে আহার করার ইচ্ছা হচ্ছিল না।" হুযুর ﷺ

বলিলেন,"একাধারে তিন দিন অনাহারে কাটাবার পর এটিই প্রথম খাদ্য, যা তোমার পিতার মুখে যাবে।"

১২. একদিন হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহু নবীজী ﷺ-এর ঘরে আসলেন। তখন নবীজী ﷺ বসে বসে নামায আদায় করছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে বসে নামায আদায় করতে দেখছি, আপনার কী হয়েছে? তিনি ﷺ বললেন, ক্ষুধা, হে আবু হুরাইরা! একথা শুনে হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহু কেঁদে দিলেন। নবীজী ﷺ বললেন, হে আবু হুরাইরা, কেঁদো না। যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় দুনিয়াতে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করবে, কেয়ামতের দিন সে হিসাবের কড়াকড়ি থেকে রেহাই পাবে।

১৩. একবার এক সাহাবী রদিয়াল্লহু আনহু নবীজী ﷺ-এর কাছে এসে ক্ষুধার অভিযোগ করলেন এবং দেখালেন যে তিনি ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পেটে একটি পাথর বেঁধেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পেট মোবারক উন্মুক্ত করে ঐ সাহাবীকে দেখালেন। তিনি দেখলেন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ পেটে দুইটি পাথর বাঁধা।

১৪. কোনো কোনো ছাহাবী কিংবা তাবেয়ীর আহার ও পোশাকের অবস্থা দেখে হযরত আবু যর গিফারী রদিয়াল্লহু আনহু তাদেরকে তিরস্কার করে বলতেন, 'হায় হায়! তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ের সেই মহান অভ্যাস হতে ফিরে গেছ। তোমরা যবের আটা ছেকে খাওয়া শুরু করেছ, হালকা-পাতলা রুটি খেতে শুরু করেছো, একাধিক রকমের তরকারি খেতে অভ্যস্থ হয়ে গেছ। রাতে ও দিনে পৃথক পৃথক পোশাক

পরিধান করতে শিখে গেছ। অথচ হুযুরে আকরাম ﷺ এর যামানায় এরকম জাঁকজমক ছিল না। মদীনার মসজিদের বারান্দায় অবস্থানকারী আহলে ছোফ্‌ফাদের মধ্যে প্রতি দুই জন লোকের খাদ্য ছিল এক মোদ (৫৮.৫ তোলা) খোরমা, তাও আবার আটিগুলো ফেলে দিতেন (ফলে খাবারের পরিমাণ আরো কম হতো)।”

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, এহইয়াউ উলূম)

১৫. খুলাফায়ে রাশেদার সময় একবার মদীনায় একজন রোমান চিকিৎসক আসলেন। তিনি দুই বছর চেম্বার করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়! দুই বছরেও বেচারার চেম্বারে একজন রুগীও আসল না। সেই চিকিৎসক চলে যাওয়ার সময় একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি মানুষ না জ্বীন, নাকি ফেরেশতা? সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বলুনতো? চিকিৎসক বললেন, আমি মদীনায় দুই বছর ছিলাম, কিন্তু একজন মানুষকেও অসুস্থ হতে দেখলাম না। তার কারণ কী? তখন ঐ সাহাবী বললেন, এর কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে দুটি অভ্যাস শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের মাঝে দুটি গুণ আছে, যে কারণে আমরা কখনো অসুস্থ হই না, এক. আমরা ক্ষুধা না লাগলে খাই না, দুই. পেটে ক্ষুধা থাকা অবস্থায়ই আবার খানা পরিত্যাগ করি। (পেট ভরে কখনো আহার করি না।)

তখন চিকিৎসক বুঝলেন, আসলে সকল রোগের উৎস অধিক পানাহার করা।

আমাদের কী পরিমাণ আহার করা উচিত:

হযরত ইমাম গায্যালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "দিন-রাত্রির মধ্যে (২৪ ঘন্টা পর পর) একবারের বেশি আহার করা সঙ্গত নয়। দুই দিনে এক সন্ধ্যা (৪৮ ঘণ্টা পর পর) আহার করাই পূর্ণ বৈরাগ্য (যুহদ)। একদিনে দুইবার আহার করলে বৈরাগ্য (যুহদ) থাকে না। সে ব্যক্তি ইলমের নূর পাবে না, যে তিনদিনের কম সময় পর পর পানাহার করে।" (এহইয়াউ উলূম, কিমিয়ায়ে সাআদাত)

ক্ষুধার্ত থাকার উপকারিতা:

১. আত্মা নির্মল এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠে, পক্ষান্তরে পেট ভরে খাওয়ার দ্বারা আত্মা অন্ধ এবং মেধাশক্তি অকর্মন্য হয়ে উঠে।
২. হৃদয় হালকা হয়, ফলে যিকির এবং মুনাজাতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়।
৩. ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করলে অহংকার এবং গাফলতি দূর হয়।
৪. ক্ষুধার্ত থাকলে ঘুম কম হয়, মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়, মেধা তীক্ষ্ম হয়, দুরদর্শিতা বৃদ্ধি পায়।
৫. কম পানাহার করলে অসুখ-বিসুখ হতে হেফাযত থাকা যায়, যেমন: গ্যাসের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, ডায়াবেটিস, উচ্চ-রক্তচাপ, স্ট্রোক, হার্ট এ্যাটাক, স্থূলতা জনিত রোগ, কোমর ব্যথা, পিঠ ব্যথা, হাঁটু ব্যথা ইত্যাদি।
৬. সবচেয়ে বড় লাভ হলো, নফস্ দুর্বল হয়ে বাধ্য-অনুগত হয়ে যায়।

অতিরিক্ত পানাহারের ক্ষতি ছয় প্রকার। যথা:

১. এবাদতের স্বাদ পাবে না।
২. হেকমত তথা জ্ঞানগর্ভ বিষয় স্মরণ থাকবে না।
৩. মানুষ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না। কেননা সে মনে করবে দুনিয়ার সকলেই তার মতো পরিতৃপ্ত পানাহার করে থাকে।
৪. ইবাদত করা তার জন্য কষ্ট সাধ্য হবে।
৫. ভোগ করার ইচ্ছা এবং কামরিপু প্রবল হবে।
৬. যখন মুসল্লীগণ মসজিদে অবস্থান করে, তখন অতিভোজী পায়খানায় আবদ্ধ থাকে।

হোটেলে বা বাহিরের খাবার পরিহার করবে:

কয়েকটি কারণে হোটেল বা বাহিরের খাবার পরিত্যাজ্য। যেমন:

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রান্না করার সময় যথাযথভাবে খাবার পাক করা হয় না। বিশেষতঃ গোশত এবং ডিম। আর নাপাক খাবার খাওয়া হারাম। তাই হোটেলে বা বাহিরে খানা না খাওয়া চাই। একান্ত যদি খেতেই হয় কেবল মাছ খাওয়া।

২. রুটি যেখানে গরম করা হয়, একই জায়গায় ডিম ভাজা হয়। ফলে তাওয়াটিও নাপাক হয়ে যায়। তাই রুটিও নাপাক হয়ে যায়। এজন্য রুটিও না খাওয়া। একান্ত খেতে হলে ভাত খাওয়া।

৩. যে খানা খায় তার উপর যিনি বাবুর্চি, তার আমল-আখলাকের মারাত্মক প্রভাব পড়ে। বুযুর্গদের উক্তি এবং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, বাবুর্চি যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে, তাহলে তার পাকানো খানা খেলে দীলের মাঝে কবীরা গুনাহ করার আগ্রহ পয়দা হয়। তাই যারা গুনাহ

থেকে বাঁচতে পারছি না বা গুনাহের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারছি না, তারা যেন এসবের উৎপত্তি খানার মাঝে খুঁজি। কেননা সকল প্রকার শারীরিক ও আত্মিক ব্যাধির মূলে রয়েছে খাবার-দাবার।

৪. আর একই কারণে অমুসলিমের হাতের রান্না কখনো খাবে না। হিন্দুদের/অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের হোটেল বা মিষ্টির দোকান কিংবা মুসলমানদের দোকানে অমুসলিম বাবুর্চি বা কারিগর থাকলেও তা খাবে না। আমাদেরকে খাবারের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।

হঠাৎ করে খাওয়া কমিয়ে দিবে নাঃ

যারা পেট ভরে খেয়ে অভ্যস্ত, তাদের জন্য আহারের মাত্রা হঠাৎ করে অত্যধিক হ্রাস করা বা একেবারে বন্ধ করে দেয়া উচিত নয়। কেননা, এতে একেবারে এই ধাক্কা সামলানো সহজ হবে না, তখন এতে উপকার না হয়ে অপকারই হবে বেশি। অতএব, একবারে অধিক পরিমাণে আহারের মাত্রা না কমিয়ে অল্প অল্প করে ক্রমে ক্রমে কমানোর অভ্যাস করা উচিত।

প্রথমে তিন বেলার বাহিরে অন্য কোনো খাবার খাবে না। তারপর ধীরে ধীরে দুই বেলা, এরপর ধীরে ধীরে একবেলা খানায় অভ্যস্ত করবে। আমার লেখা পড়ে প্রথম দিকে এই কাজকে খুব কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু কেউ হিম্মত করে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই নিজেকে এক বেলা খানায় অভ্যস্ত করা সম্ভব। যখন এক বেলায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন মাঝে মাঝে একাধারে কয়েকদিন না খেয়ে থাকবে। এভাবে না খেয়ে থাকার কারণে এমন নূর হাসিল হবে, যা অন্য কোনো আমলের দ্বারা হাসিল করা সম্ভব নয়। তখন নামায, দোয়া ও অন্যান্য ইবাদতে ধ্যান

পয়দা হবে। তাহাজ্জুদের সময় আপনা আপনিই ঘুম ভেঙে যাবে, এলার্ম ঘড়ির প্রয়োজন হবে না।

ভুখা থাকলে প্রথম দিকে কিছুটা দুর্বল লাগবে, মাথা ঘুরাবে, কিন্তু খুব শীঘ্রই শরীর এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে দেখা যাবে দুই দিন পর্যন্ত ক্ষুধা বা দুর্বলতা কিছুই অনুভব হয় না, তৃতীয় দিন কিছুটা দুর্বল লাগে। কিন্তু এর দ্বারা নামায ও ইবাদতে যে স্বাদ অনুভব হয় তা অনেক সুস্বাদু খানা ও দুনিয়ার অন্যান্য সকল মজা থেকে উত্তম।

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ! বর্তমান যামানায়ও এমন ব্যক্তি আছেন যারা তিন দিন একাধারে না খেয়ে থাকতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কবুল করুন। তাদের দ্বারা দ্বীনের বড় বড় খেদমত নেন। এবং আমাদেরকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দেন। আমীন।

অতিরিক্ত পানাহারের দরুন উম্মত কী হারাল:

নফসকে কাহিল করার উপায় হলো এটাকে ভুখা রাখতে হবে। যত বেশি এটাকে ভুখা রাখবে এটা তত বেশি নিস্তেজ হয়ে যাবে। তখন এর মধ্যে আনুগত্য পয়দা হবে। আজ মুসলমান রকমারি মজাদার খাবার খেয়ে খেয়ে নফসকে খুব শক্তিশালী করে ফেলেছে। তাই সারা দুনিয়ার মুসলমান আজ এতো গুনাহে লিপ্ত ও দীন থেকে বহু দূরে। এ কারণেই মুসলমানরা দুনিয়াতে অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের সাহায্য থেকে দূরে।

এক সাহাবী থেকে বর্ণিত, "নবীজী ﷺ ফজরের নামায শেষে ঘরে এসে ব্রেকফাস্ট খেলেন, সকাল দশটার দিকে বনু হাশিম গোত্রের কয়েকজন লোক নবীজী ﷺ-এর সাথে দেখা করতে আসলে তাদেরকে তিনি মেহমানদারী করলেন এবং তাদের সাথে তিনিও হালকা নাস্তা

করলেন, তারপর দুপুরে লাঞ্চ করলেন, বিকালে একটু ক্ষুধা অনুভূত হওয়ায় কিছু চা-নাস্তা খেলেন এবং ইশার নামাযের পর ডিনার করে বিছানায় গেলেন"।

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- হা হা হা! এই রকম হাদীস কোথায় আছে?

আমরা যে তিন বেলা খাই, কুরআন বা হাদিসের কোথায় এই নিয়ম লেখা আছে?

আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব ﷺ-কে দিনের পর দিন না খাইয়ে রাখতেন অকারণে নয়। অকারণে সাহাবায়ে কেরাম ভুখা দিন পার করতেন না। এটা এক আজিমুশ্বান আমল, যা যমিন থেকে হারিয়ে গেছে। ভুখা থাকার দ্বারা আল্লাহ পাক রূহে ও শরীরে শক্তি দান করেন।

আজ মুসলমান তিন, চার, পাঁচ বেলা খানা খাওয়ায় ও বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে তাদের নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছে। মুসলমান জানে না তার জন্য কতটুকু খাওয়া চাই। সকলের জন্য জরুরি হলো নিজের ব্যক্তিগত খোরাকির একটি পরিমাণ নির্ধারণ করা। আমি সপ্তাহে এতটুকু চাল খাবো, আটা খাবো বা অন্যান্য কিছু খাবো। এক তরকারির বেশি একবারে খাবো না। এই পরিমাণ খুব অল্প হতে হবে। তারপর এর বাহিরে সকল ধরণের খানা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। চায়ের দোকানে বসে একটু চা-বিস্কুট বা কলা খাওয়া এবং এরকম অহেতুক সকল হালাল খানা থেকে নিজেকে এমনভাবে বিরত রাখবে, যেমন কিনা আল্লাহর নেক বান্দারা নিজেদেরকে হারাম থেকে বিরত রাখেন।

উম্মতের রূহানীয়াতকে সেদিন দাফন করা হয়েছে, কাশ্‌ফ, এলহাম ও ইলমে লাদুন্নির দরজা সেদিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যেদিন এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে-"বর্তমানে উম্মত দুর্বল, তাই বেশি বেশি খেয়ে বেশি বেশি দ্বীনের কাজ করতে হবে এবং উম্মতের বিজ্ঞজনেরা (আলেম সমাজ) এই শয়তানী স্লোগানের সাথে একাত্মতা পোষণ করেছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা রদিয়াল্লহু আনহাকে বলেছিলেন, "হে আয়েশা! তুমি দিনে একবারের বেশি আহার করো না, দিনে একবারের বেশি আহার করা অপচয়।"

অন্যদিকে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

"আর তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না, নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ তাআলা) অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।" (৭ সূরা আরাফ: ৩১)

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ

"নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (১৭ সূরা বণি-ইসরাঈল: ২৭)

শয়তানী স্লোগান:

উম্মত এখন দুর্বল, তাই কম খেয়ে সাধনা করা যাবে না, বেশি বেশি খেয়ে বেশি বেশি দ্বীনী কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।

তাহলে আমরা যারা দিনে দুই বা তিন বেলা আহার করি তারা কি শয়তানের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করছি না? আম্মাজান হযরত আয়েশা রদিয়াল্লহু আনহা বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর প্রথম যে বিদআত চালু হয়েছে, তা হলো পেট ভরে আহার করা।" বর্তমান সময়ে কোন্ আলেম আছেন, যিনি দুইবেলা বা তিনবেলা পেট ভরে আহার করাকে বিদআত মনে করেন? অথচ হাদীসে এসেছে, "সকল বিদআতই পথভ্রষ্টতা।"

সুতরাং, যারা বিদআতী ও শয়তানের ভাই তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে পথ প্রদর্শন করবেন, ইলমের নূর কিভাবে দিবেন? ইলম তো আর কিছু বাক্য ও শব্দের ভাণ্ডার নয়, প্রকৃত ইল্ম হলো 'দ্বীনের উপলব্ধি'। যে ইল্ম আমাদের যিন্দেগীকে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী বানায় না, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে দেয় না, তা মোটেও ইল্ম নয়, বরং জাহেলিয়াত।

আপনি যত বড় মাদরাসা হতেই ফারেগ হোন না কেন, আপনার জন্যেও একই কথা?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান, "বেওকুফ ঐ ব্যক্তি যে তার নফসের খাহেশের অনুসরণ করে, আবার আল্লাহ পাকের দরবারে আশা করে।" এই হাদীসের মানে হলো, যে নিজের খাহেশ পূরণ করে, তার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট কিছু আশা করা বোকামি। এদের দোয়া কখনো কবুল হয় না। সারা দুনিয়ার মুসলমান আজ খাহেশে লিপ্ত। এদের দোয়া কিভাবে কবুল হবে? আমরা তো আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব এরকম সকল খাহেশ পুরা করি। আর যেটা সামর্থ্যের বাইরে সেটার জন্য আফসোস করি।

আজ আমাদের মাদরাসাগুলোতে কোনো আল্লাহওয়ালা আলেম বা মেহমান আসলে "সুন্নতী মেহমানদারী"র নামে কিংবা "আল্লাহওয়ালাদের তাযীমের নামে" অথবা "কুরআনের তাযীমের নামে" ত্রিশ-চল্লিশ পদের আইটেম করা হয়। হাদীসে বলা হয়েছে, "আল্লাহ পাক ভূঁড়িওয়ালা আলেমদেরকে পছন্দ করেন না।" (এহইয়াউ উলূম)

আবার অন্যদিকে, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথীদের "নুসরতের" নামে চল্লিশ-পঞ্চাশ আইটেমের ব্যবস্থা করা হয়। যারা জিহাদের ময়দানে আছি, তারাও তিন-চার বেলা না খেয়ে থাকতে পারি না। এক হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ তাআলা নাদুস-নুদুস মুমিনদেরকে পছন্দ করেন না।" (এহইয়াউ উলূম)

আহ্! এগুলো কোন্ ইসলাম? এটা আর যাই হোক, নবুয়তের যামানার ইসলাম নয়, এটি খুলাফায়ে রাশেদার ইসলাম নয়।

তাই আমাদের খুব তাওবা করা চাই। আমরা দিনে একবারের বেশি, এক আইটেমে পানাহার পরিত্যাগ করি। নিজেদের দুর্গতির জন্য আমরাই দায়ী। এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হলে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলবার তাওফীক দান করেন।

প্রকৃত এলেম এবং প্রকৃত আলেমঃ

ভুখা থাকার দ্বারা রূহানি শক্তির সাথে সাথে অনেক এলেম হাছিল হবে। কুরআন হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যসমূহ প্রকাশ পাবে। ভুখা অবস্থায় তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে রাতের শেষাংশে তিলাওয়াত করবে। এতে করে কাশফ হাছিল হবে এবং গায়েবের এমনসব জিনিস নজরে ভাসবে যা ঈমানের মজা দিবে। এভাবে আস্তে আস্তে মারেফত হাছিল হবে।

আছহাবে সুফ্‌ফার সাহাবী রদিয়াল্লহু আনহুমগণ দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত থেকে দ্বীন শিখেছেন। হাদীসের ইমাম হযরত আবু হুরাইরাহ রদিয়াল্লহু আনহু ভুখা থাকতে থাকতে বেহুশ হয়ে পরে যেতেন, লোকেরা তাকে পাগল মনে করে ঘাড়ে পদাঘাত করতেন। ভুখা থাকা এলেমের শর্ত। আগেই বলেছি, হযরত ইমাম গায্‌যালী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “তিন দিন পর পর এক বেলা আহারের অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত ইলমের নূর হাছিল হবে না।” আর তাই আজ যমিন থেকে ইলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

জমিন থেকে এলেম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, এটা আমাদের মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণ মানতে চাইবেন না। হাজারো মাদরাসা কেবল

হিন্দুস্তানেই আছে। সারা দুনিয়াতে কত লক্ষ মাদরাসা আছে আল্লাহই ভালো জানেন। না জানি কত লাখো-কোটি কুরআন ও হাদিসের কিতাব মওজুদ আছে, তাহলে এলেম উঠিয়ে নেয়া হলো কিভাবে?

একবার নবীজী ﷺ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, *ইলম তুলে নেয়ার সময় হয়ে গেছে।* একথা শুনে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এলেম কিভাবে উঠে যাবে, অথচ আমরা নিজেরা কুরআন শিখছি এবং আমাদের সন্তানদেরকেও শিখাচ্ছি? তখন নবীজী ﷺ বললেন, আমি তোমাকে অনেক বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। ইহুদী-খ্রিস্টানরাও তো তাদের কিতাব পড়ে ও তাদের সন্তানদের পড়ায়। এতে তাদের কী ফায়দা হয়েছে?

এলেম কখনই শুধু কিতাব পড়ার নাম নয়।

কোন্ এলেম প্রকৃত এলেম?

খুব ভালো করে বুঝে নিন-

এলেম হলো আল্লাহ পাকের পরিচয় (মারেফাত) লাভের মাধ্যম।

সেই এলেমই প্রকৃত এলেম যা মুমিনের অন্তরে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং তাঁর রাহে জিহাদ করাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে শিখায়;

সেই এলেমই প্রকৃত এলেম, যে এলেম দীল থেকে গাইরুল্লাহর ভয় দূর করে এক আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে দেয়, ফলে বান্দা মাখলূখের গোলামী থেকে মুক্ত হয়;

সেই এলেমই প্রকৃত এলেম যা দীলের মাঝে দুনিয়ার হাকীকত পয়দা করে দেয় এবং দুনিয়া ছাড়তে এবং দুনিয়া থেকে পলায়ন করতে বাধ্য করে;

সেই এলেমই প্রকৃত এলেম যা মুমিনকে আখিরাতের প্রতি আগ্রহী করে, আখিরাতের স্মরণ পয়দা করে, মৃত্যুর ভয় দূর করে, মৃত্যুর মহব্বত পয়দা করে।

পূর্বোক্ত হাদীসে এই এলেমকে উঠিয়ে নেয়ার কথাই বলা হয়েছে। বর্তমান যামানায় বিশ্বব্যাপী কুরআন হাদীসের চর্চা আছে কিন্তু উল্লেখিত বিষয়গুলোর এহতেমাম নেই। বরং এগুলো আমরা ভুলে গিয়েছি।

মনে রাখবেন, যার মধ্যে আল্লাহ পাকের ভয় পয়দা হয়েছে, সে এলেম হাছিল করে নিয়েছে, যদিও সে কখনো মাদরাসায় পড়েনি। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ- إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءُ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহ পাককে ভয় করে।" [৩৫ সূরা ফাতির: ২৩]

এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে বর্তমান যামানায় সার্টিফিকেটওয়ালা সকল আলেমই নিজের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে বলে দাবী করেন। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, আলেমরাই আমাকে ভয় করে আর আমি যেহেতু আলেম হয়েছি, তাই আমি আল্লাহকে ভয় করি।

বাহ্! কি সুন্দর যুক্তি। অথচ "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহ পাককে ভয় করে।" এটি হলো শাব্দিক অর্থ। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে আলেম কেবল তারাই, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে। যার প্রমাণ পাওয়া যায়, হাদীস শরীফ থেকে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, এক সাহাবী রাযি.

নবীজী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি ইরশাদ ফরমালেন, "যে আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।" শুধু জানার মাধ্যমেই আলেম হওয়া গেলে শয়তান হতো যামানার সবচেয়ে বড় আলেম।

আবার, লক্ষ্য করুন, ভয়ের প্রকৃত স্বরূপ কী?

অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ তাআলার 'বড়ত্ব ও প্রতাপ' স্মরণের ফলে দীলের মাঝে যে অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাকে 'আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া' বলে।

না, এটি মোটেও ভয়ের সংজ্ঞা নয়। কেননা আল্লাহ তাআলাকে এই ভয় শয়তানেও করে থাকে। যেমন, কুরআনে পাকে এরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"আর যখন শয়তান তাদের (কুফ্ফারদের) কার্যকলাপকে নিজেদের দৃষ্টিতে সুদৃশ্য করে দিল এবং বলল যে, আজকের দিনে কোনো মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনি হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নেই,

আমি দেখছি- যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন।" (৮ সূরা আনফাল: ৪৮)

"আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া"র প্রকৃত সংজ্ঞা হলো- "আল্লাহ তাআলার 'বড়ত্ব ও প্রতাপ' স্মরণের ফলে দীলের মাঝে উৎপন্ন অবস্থার কারণে যদি আল্লাহ পাকের নাফরমানী ছেড়ে দেয়া হয় এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানতে নিজেকে বাধ্য করা হয়, তবেই তাকে 'আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া বা পরহেযগারী' বলা হবে।"

এখন, আমার মধ্যে ভয় পয়দা হয়েছে কিনা বুঝব কিভাবে? আমার ভিতর ভয় পয়দা হওয়ার আলামত কি এটি যে, আমি মাদরাসা থেকে সার্টিফিকেট লাভ করে আলেম হয়েছি??? না, কক্ষনো না!

ভালো করে বুঝে নিন, 'ভয়' দাবী করার বিষয় নয়, প্রমাণ করার বিষয়!!!

সেই 'ভয়'তো ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচায় না!
সেই 'ভয়' তো ভয় নয়, যেই ভয় আমার রাতের ঘুম হারাম করে না!
সেই 'ভয়' তো ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে শেষ পরিণতি ও আখিরাতের চিন্তায় অস্থির করে তুলে না!
সেই 'ভয়' তো ভয় নয়, যেই ভয় আমার দীল থেকে দুনিয়ার মহব্বত দূর করে না, আমাকে দুনিয়া ছাড়তে বাধ্য করে না!
সেই 'ভয়' তো ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে দাওয়াতের ময়দানে ছুটায় না!

সেই 'ভয়' তো ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে বাতিলের বিরুদ্ধে হক কথা বলার সাহস যোগায় না!
সেই 'ভয়' তো ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে (আল্লাহর পাকড়াওয়ের আশঙ্কায়) ঘর থেকে বের করে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যায় না!

সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ কিতাব পড়ে আলেম হননি। নবুয়তের জামানায় তো কুরআনের আয়াত ব্যতীত হাদীস লেখারও অনুমতি ছিল না। তাহলে তাঁরা একেক জন কিভাবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আলেম হলেন? তাঁরা আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে শুনে, তাঁর যিন্দেগী দেখে দেখে নিজের যিন্দেগী সেভাবে বানিয়ে, তাঁর কদম অনুসরণ করে করে, এরপর কুরআন তিলাওয়াত করে তা উপলব্ধি করে করে এলেম হাছিল করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই!

খ. বস্ত্রঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর পোশাকের সুন্নত কী কী ছিল?

✓ পোশাকের বৈশিষ্ট্য কী ছিল? যেমনঃ ঢিলাঢালা হওয়া, লম্বা হওয়া, মোটা কাপড়ের হওয়া ইত্যাদি।

✓ কোন রঙ নবীজী বেশি পছন্দ করতেন? যেমনঃ সাদা, সবুজ, কালো ইত্যাদি।

✓নবীজী ﷺ-এর কাপড়ের সংখ্যা কত ছিল? যেমনঃ অধিকাংশ সময় এক সেট, (হঠাৎ) বেশি হলে সর্বোচ্চ দুই সেট।

পানাহারের মতো এখানেও আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় সুন্নতটিকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি, আর তৃতীয়টিকে আমরা কোন গুরুত্বই দেই না। অথচ আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কাপড়ের বৈশিষ্ট্য এবং রং নিয়ে তিনি লৌকিকতা বিবর্জিত উদারনীতি অবলম্বন করতেন, এ ব্যাপারে উনার তেমন কোন মাতামাতি ছিলো না, কিন্তু যে বিষয়টিকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন তা হলো কাপড়ের সংখ্যা। তিনি এক সেটের বেশি কাপড় পরিধান করতেন না, কখনো দুই সেট থাকলে এক সেট জুমুআ/ঈদের দিনের জন্য রেখে দিতেন।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, দুনিয়াদার হওয়া নির্ভর করে বস্ত্রের সংখ্যার উপর, বস্ত্রের মোটা/ চিকন হওয়ার উপর এবং বস্ত্রের দামের উপর, কাপড়ের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের উপর নয়।

অনেকে চিকন কাপড়ের দামী দামী বহু সংখ্যক কাপড় পরিধান করে থাকেন। আর দলীল হিসেবে পেশ করেন, শরীয়তের অমুক ইমাম এতগুলো বস্ত্র পরিধান করতেন, অমুক আকাবীর এত দামী, এতগুলো

কাপড় ব্যবহার করতেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের পর কোনো শরীয়তের ইমাম কি 'যিন্দেগী অনুসরণের ক্ষেত্রে' শরীয়তের দলীল হতে পারেন? অনেকে আবার এই দলীল দেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।" অন্য এক হাদীসে এসেছে,"নিশ্চয় আল্লাহ পাক ললিত এবং তিনি লালিত্যকে পছন্দ করেন।" আরেক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও দান তোমার দেহে প্রকাশ পাওয়া উচিত।"

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করি এবং আমাদের দুনিয়ার মহব্বতকে, দুনিয়াপ্রীতিকে জায়েয করি। অথচ আমরা চিন্তা করি না, যিনি এ কথাগুলো বলেছেন, তিনি নিজে কিভাবে এগুলোর উপর আমল করেছেন! তিনি নিজে কি একটার বেশি বস্ত্র পরিধান করতেন? তিনি কি মোটা কাপড়ের তালিযুক্ত পুরাতন কাপড় পরিধান করতেন না? এগুলোর গুরুত্ব কেন উঠে গেল? তিনি কি এগুলো এমনি এমনিই শখে করতেন? নাকি এ ধরণের বস্ত্র পরিধান করার পিছনে উনার কোনো লক্ষ্য ছিল? তিনি কি উম্মতকে শিখানোর জন্য এরকম করতেন না? তিনি কি উম্মতের জন্য ভালাইটাই চাইতেন না? উম্মতকে তিনি কি ভালাইয়ের রাস্তা দেখিয়ে যান নি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই শ্রেষ্ঠ। তিনি নিজে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর উপর নাযিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনুল কারীম, আর তাঁর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তিনি সকল মানবকুলের নেতা দুনিয়া ও আখিরাতে, তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা রদিয়াল্লহু আনহা সকল জান্নাতী রমণীদের সরদারনী আর তাঁর নাতিদ্বয় জান্নাতী যুবকদের সরদার। এভাবে

তাঁর সমস্ত কিছুই শ্রেষ্ঠ। তাঁর তরীকা সর্বশ্রেষ্ঠ তরীকা, তাঁর যিন্দেগী সর্বশ্রেষ্ঠ যিন্দেগী, তাঁর পানাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পানাহার, তাঁর পোশাক সর্বশ্রেষ্ঠ পোশাক। তাঁর ঘর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর। তিনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেছেন, নিজের পরিবারের জন্য যা পছন্দ করেছেন, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর মধ্যেই রয়েছে উম্মতের ভালাই। উম্মতের প্রকৃত কল্যাণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল নিজেই এমন ধরণের পোশাক পরিধান করতেন তা নয়, সাহাবাদেরকেও শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লহু আনহু কাপড় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কি চট পরিধান করেননি? আর আল্লাহ তাআলাও খুশি হয়ে আসমানের সকল ফেরেশতাদেরকে চট পরিধান করার নির্দেশ দিলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লহু খলীফা থাকা অবস্থায়ও তো চৌদ্দটি তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেছেন? মা ফাতেমা রাদিয়াল্লহু আনহার পরনে এই পরিমাণ কাপড় ছিল না, যা পরিধান করে একজন কন্যা তার পিতার সামনে আসতে পারে। আহ্! উনারা কি দ্বীন বুঝেন নাই? নাকি উনাদের হেকমতের কিছু কমতি ছিল? নাকি তাদের টাকা পয়সা কিছু ছিল না? তারা কি এতই গরীব ছিলেন যে, তারা ইচ্ছা করলে একটি কম দামী পোশাকও ক্রয় করতে পারতেন না? (নাউযুবিল্লাহ)
উনারা দুনিয়াকে কিভাবে ত্যাগ করেছেন! উনারা দুনিয়াকে কতটা ভয় করতেন! উনারা দুনিয়া থেকে কিভাবে বেঁচে থাকতেন! উনারা দেখিয়ে গিয়েছেন মুসাফিরের যিন্দেগী কাকে বলে!!!

হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “দুনিয়া ত্যাগীদের পরিধেয় বস্ত্র তিন প্রকারের- এক. চট বা ছালার টাট যা নিতান্ত সামান্য ধরণের পরিচ্ছদ, দুই. পশমী কম্বল বা মোটা বস্ত্র যা মধ্যম শ্রেণির পোশাক,

তিন. সূতীর মোটা বস্ত্র যা উৎকৃষ্ট শ্রেণির পোশাক। এই উৎকৃষ্ট শ্রেণির পোশাক পরিধানকারীরা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্যায়ের সংসারত্যাগী বলে গণ্য হবেন। অন্যদিকে, মিহিন ও কোমল বস্ত্র ইচ্ছাপূর্বক পরিধান করলে সে ব্যক্তি সংসারত্যাগী বা পরহেযগার শ্রেণি হতে বহিষ্কৃত হবেন।” (কিমিয়ায়ে সাআদাত, খণ্ড ৪, পৃ. ১৬৮)

একটু চিন্তা করুন, কী বললেন তিনি? এগুলো কি শুধু সেই যামানার জন্যই ছিল, নাকি বর্তমান যামানায়ও এই কথাগুলো প্রযোজ্য? ইসলাম কি শুধু নবুয়তের যামানার জন্য, বা ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহর যামানার জন্য নাকি সকল যামানার জন্য? বর্তমানে যে যত চিকন কাপড় পরিধান করেন, ফিটফাট থাকেন, তিনি নাকি তত বড় আল্লাহওয়ালা? আহ্! যাই কোথায়?

রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাতের পর আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লহু আনহা একখানা সূতীর মোটা লুঙ্গী ও একখানা পশমী কম্বল বের করে বলেছিলেন, “এটিই রাসূলকুল শিরোমণি হযরত নবী করীম ﷺ -এর সাকুল্য পোশাক।”

এক ভাই বললেন, “আল্লাহর রাসূলের যামানায় তো বর্তমানের মতো চিকন কাপড় পাওয়া যেত না। তাই তিনি মোটা কাপড় পরতেন।”
ভাই, আপনার এই কথার দলীল পেশ করুন। আমি আপনাকে উল্টা দলীল পেশ করছি।
নবীজী ﷺ এর ওফাতের অনেকদিন পর একবার হযরত সালমান ফারসী রদিয়াল্লহু আনহুকে এক ব্যক্তি চিকন, মিহি কাপড়ের একটি জামা হাদিয়া দিলেন। তিনি জামাটি দেখে বললেন, “এটি আমি পরতে পারবো না,

কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ জীবনে কোনোদিন চিকন কাপড়ের জামা গায়ে দেননি।" (الزهاد مأة ,মুহাম্মাদ সিদ্দীক মিনশাভী)

একবার কোনো এক ব্যক্তি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে একটি বুটাদার বস্ত্র হাদিয়া দিলেন। তিনি তা পরিধান করেছিলেন। কিন্তু কাপড়ের নকশার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি তাঁর পবিত্র দেহ হতে কাপড়টি খুলে ফেলেন এবং কোনো এক সাহাবীকে বললেন, ইহা আবু জুহাইমাকে দিয়ে তার কম্বলটি আমার জন্য নিয়ে আস। এই কাপড়ের নকশা আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলেছে।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতা মোবারকে পুরাতন ফিতা খুলে নতুন ফিতা লাগানো হলো। কিছুক্ষণ পরেই তিনি তা খুলে ফেলে পূর্বের সেই ফিতা লাগানোর জন্য আদেশ দিয়ে বললেন, "নামাযের মধ্যে এই ফিতাগুলোর সৌন্দর্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছিল।"

আরেকদিন হুযুরে আকরাম ﷺ -এর জন্য এক জোড়া নতুন জুতা ক্রয় করে আনা হলো। তা দেখা মাত্র তিনি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে সেজ্‌দা করলেন। এরপর ঘরের বাইরে এসে যে ফকিরকে প্রথম দেখতে পেলেন, তাকেই জুতাজোড়া দান করে দিলেন। এরপর বললেন,"এই জুতা দুটি আমার দৃষ্টিতে অনেক সুন্দর লেগেছিল। তাতে আমি আশঙ্কা করলাম, কি জানি আল্লাহ তাআলা এই কারণে আমাকে শত্রু বলে মনে করেন; সুতরাং এই ভয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করেছি।"

রাসূলে মাকবুল ﷺ আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রদিয়াল্লহু আনহাকে বলেছেন, "যদি তোমরা কাল কিয়ামতের দিন আমার সাথে মিলিত হতে ইচ্ছা রাখ, তবে পৃথিবীতে কেবল পাথেয়স্বরূপ জীবনধারণের

পরিমাণ অন্ন-বস্ত্রে পরিতৃপ্ত থাক এবং ছিঁড়বার পর তালি না লাগিয়ে কোনো জামা-কাপড় শরীর হতে খুলবে না।”

হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহুর পরিধেয় বস্ত্রে চৌদ্দটি তালি লাগান ছিল। বহু ছাহাবী রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈন তা গণনা করেছিলেন।

হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ রদিয়াল্লহু আনহু সিরিয়ার প্রশাসক ছিলেন। তিনি এক হাতে খরচ করতেন আর অভাবীদের আনন্দ দিতেন। আরেক হাতে উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে আঘাত হানতেন আর শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করতেন। নবীজী ﷺ তাকে “আমীনুল উম্মত” (উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি) হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন ইউরোপের রাজা বাদশাহদের ঘুম হারামকারী মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি। সিরিয়া বিজেতা, জান্নাতের দশজন সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন। অথচ তাঁর পোশাক এমন ছিল যে, তাঁকে দেখলে তাঁকে দান করার জন্য তুমি হাত বাড়িয়ে দিতে। (الزهاد مأة ,মুহাম্মাদ সিদ্দীক মিনশাভী)

আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওফাতের অনেকদিন পর এক সাহাবী মক্কায় আসলেন। মক্কায় এসে তাওয়াফরত তাবেয়ীদের দেখে সতর ঢাকে পরিমাণ কাপড় রেখে তিনি গায়ের সকল পোশাক খুলে ফেললেন। খালি গায়ে কাবা ঘরকে সামনে রেখে নামায আদায় করা শুরু করে দিলেন। তাবেয়ীরা তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন এবং তাঁর চারপাশে এসে ভিড় জমালেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তাঁকে তাঁর জামা কাপড় খোলে খালি গায়ে নামায আদায় করার রহস্য জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তিনি বললেন,“তোমাদেরকে দ্বীন শিখানোর জন্য.... আমরা সাহাবারা এক কাপড় দিয়ে যিন্দেগী পার করে দিতাম....তালিযুক্ত কাপড় পরতাম.... তিন-চারদিন না খেয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে যেতাম....আর তোমরা এমন সব

নতুন নতুন পোশাক পড়ছ....এত এত খানা খাচ্ছ.... এটা কোন্ ইসলাম?.... তাই তোমাদেরকে শিখালাম, কাপড় ছাড়াও নামায আদায় করা যায়.... আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো যায়.... ।”

যাইহোক, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনে সেরকম পোশাক পরিধান না করে দীন-হীন পোশাক পরিধান করে, তবে তার পরিবর্তে তাকে পরকালে বেহেশতের বিচিত্র কারুকার্যময় সুন্দর পোশাক ইয়াকূত পাথর নির্মিত নৌকার মধ্যে বোঝাই করে দান করা আল্লাহ তাআলার উপর তার প্রাপ্য দাবীরূপে অবধারিত হয়ে পড়ে।” (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

পরিধেয় বস্ত্র	উঁচু পর্যায়ের যুহদ	সর্বনিম্ন পর্যায়ের যুহদ
জুব্বা/পাঞ্জাবী	১ বা ২ টি	২ টি
গেঞ্জি	০ বা ১ টি	২ টি
পায়জামা	০ বা ১ টি	১ টি
লুঙ্গি	১ টি	২ টি
টুপি	১ টি	১ টি
পাগড়ি	১ টি	১ টি
কম দামী সেন্ডেল	১ জোড়া	১ জোড়া

উল্লেখ্য, এরপর যুহদের আর কোনো স্তর নেই। এর বেশি যাদের পোশাক আছে, তারা যাহিদ শ্রেণি থেকে বহিষ্কৃত। উপরোক্ত তালিকায় সর্বোচ্চ কোনো স্তর দেয়া হয়নি, কেননা সর্বোচ্চের কোনো শেষ সীমা নেই। যে যত কম সংখ্যক, কম দামী, বেশি মোটা বস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকবে সে তত বড় যাহিদ। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করার তাওফীক দেন। আমীন।

কেমন ছিল দেখতে সাহাবায়ে কেরামের সেই দুর্ধর্ষ বাহিনীঃ

এখানে সাহাবায়ে কেরামের যুগের ইসলামী বাহিনী সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা সমীচীন মনে করছি। ইসলামী বাহিনীর নির্দিষ্ট কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। যাঁর যেমন কাপড় ছিল তিনি তেমনই পরিধান করতেন। অনেক সময় দেখা যেত যে, কিছু সিপাহী বহু মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করেছে, অথচ সিপাহসালার (প্রধান সেনাপতি), নায়েব সালার (উপ-প্রধান সেনাপতি) প্রমুখের পরনে একদম সাদামাটা পোশাক। কারণ এই ছিল যে, সিপাহীরা গণীমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত কাপড় পরিধান করত।

ইসলামী বাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সেনাপতি-উপসেনাপতিদের কোনো বিশেষ ইউনিফর্ম বা ব্যাজ ছিল না। বর্তমান যুগের মত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জেনারেল ও সিপাহীদের যে ভেদাভেদ তা সে সময় ছিল না। গোত্রের সর্দারও অনেক সময় সিপাহী হত আর তারই গোত্রের সাধারণ লোক হয়ে যেত কমান্ডার। পদ-পদবীর এত বাছ-বিচার ছিল না। কোনো ব্যক্তি সাধারণ সিপাহী হয়ে বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর

নিজস্ব দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে দু'চার দিন পর কমান্ডার হয়ে যেত। সে যুগে দেখা হতো যুদ্ধজ্ঞান ও যোগ্যতা। এমনও হতো যে, এক যুদ্ধে কেউ অফিসার/কমান্ডার আর পরের যুদ্ধেই সে সিপাহী হয়ে গেছে।

ইসলামী শিক্ষায় অফিসারগিরি ও অধীনস্থতার চিত্র কিছুটা ভিন্ন ধরণের ছিল। কাউকে অফিসার বানানো হলে দায়িত্বের একটি পর্যায় পর্যন্ত সে অফিসার হত। তার কোনো নির্দেশ ব্যক্তিগত পর্যায়ের হতো না। যেহেতু অফিসার নির্বাচনের মাপকাঠি অন্য কিছু ছিল তাই তখনকার সময়ে এ বিষয়ে খোশামোদ ও সুপারিশের কোনো নাম-গন্ধও ছিল না।

বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন তখন থেকে তরান্বিত হয়, যখন মুসলমানরা অফিসার ও সিপাহীতে ভাগ হওয়া শুরু হয়েছে, কর্মকর্তারা অধীনস্থদের শাসিত মনে করা শুরু করেছে এবং সুপারিশ ও স্বজনপ্রীতির রোগ তাদের আক্রান্ত করেছে।

তৎযুগে মুসলিম বাহিনীর হাতিয়ারের মধ্যেও তেমন পার্থক্য ছিল না। ছিল না উঁচু-নিচুর মানদণ্ড। প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র নিয়ে বাহিনীতে শামিল হতো। বর্ম, শিরস্ত্রাণ প্রত্যেকের ছিল না। মুসলমানরা যে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত তা দুশমনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া ছিল। বর্তমান যুগে যেমন সৈন্যদের উচ্চতা ও বয়স এক ধরণের হয়, ইসলামী বাহিনীতে তেমন কোনো নিয়ম ছিল না।

ইসলামী বাহিনীর যাত্রা প্রশিক্ষিত বাহিনীর মতো হত না। তারা অবিন্যস্ত অবস্থায় কাফেলার মত চলত। খোরাক ও রসদ তাদের সাথেই থাকত। গরু, গাভী, দুম্বা এবং ভেড়া-বকরী যা সৈন্যদের খোরাক হত-তা সৈন্যদের সাথে সাথেই থাকতো। রসদের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অনেক পরে করা হয়েছিল।

অশ্বারোহীরা চলার সময় পায়ে হেঁটে চলত, যাতে ঘোড়া আরোহী বহন করে ক্লান্ত হয়ে না যায়। আসবাবপত্র উটে বোঝাই করে আনা হত। স্ত্রী এবং বাচ্চারা সঙ্গে থাকত। তাদেরকে উটে চড়িয়ে দেয়া হতো।

এক কথায়, তৎযুগের ইসলামী সৈন্য দেখে কেউ বলতে পারত না যে, এরা সৈন্য। তাদের পোশাক-আশাক ও চলাফেরা এতটাই সাদামাটা ও সাধারণ হতো যে, তাদেরকে কাফেলা মনে করা হতো।

একটু চোখ বন্ধ করুন তো!

একটু চিন্তা করুন। কিছুক্ষণের জন্য কল্পনার জগতে হারিয়ে যান। মনে করুন, দুপুরের খানা (যা আপনি স্বাভাবিক ভাবে খান তা) খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আর চিন্তা করছেন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাহাবীদের যিন্দেগী কেমন ছিল! আহ্! সেই যামানায় যদি আমার জন্ম হতো! তাঁদেরকে যদি দেখতে পারতাম!

মনে করুন, হঠাৎ আপনার দরজায় নক করার শব্দ আর আপনি দরজা খোলার জন্য আপনার পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে আসলেন, দরজা খুলে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন! এমন অদ্ভূত কাউকে আপনি আগে কখনো দেখেননি!

আপনি দেখলেন, তিন চার দিন না খাওয়া হাড্ডিসার প্রায়, জীর্ণ-শীর্ণ, চৌদ্দটি তালিযুক্ত জামা পরিহিত একজন মানুষ। আপনার কাছে মনে হচ্ছে, একটু ঝড়ো হাওয়া বইলেই লোকটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সম্ভবত আপনার এলাকার ফকীররাও এমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে না।

তাদের পোশাকও মনে হয় আরো স্মার্ট, তারাও মনে হয় আরো হ্যান্ডসাম্! ভাবলেন, লোকটি কি পাগল-টাগল নাকি!

আপনি ভাবলেন, হয়তো লোকটি ভিক্ষা করতে এসেছে। আপনি সাহায্য করার জন্য পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দিলেন কিংবা বাড়ির ভিতর থেকে কিছু চাল নিয়ে আসলেন লোকটিকে ভিক্ষা দেয়ার জন্য।

লোকটি আপনাকে বললেন, আমি ভিক্ষা নিতে আসিনি।

আপনি বললেন, ও! আপনি বোধ হয় খানা চাইতে এসেছেন। আপনাকে খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে।

লোকটি আপনাকে আবারো বললেন, না, আমি খানা খেতেও আসিনি।

তখন আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনি কে, এখানে কী চান?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

লোকটি দ্ব্যর্থহীনভাবে বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের একজন সাহাবী! আমি আপনাকে আল্লাহর রাসূলের রেখে যাওয়া গরীব (অপরিচিত) ইসলাম শিখাতে এসেছি! সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী কাকে বলে তা দেখাতে এসেছি"!!!!!

ইন্‌শাআল্লাহ, খুব শীঘ্রই পৃথিবীর মঞ্চে এমন-ই কিছু অপরিচিত, জরাজীর্ণ, আনস্মার্ট মানুষের আবির্ভাব ঘটবে, যাদেরকে এ যামানার সাধারণ দ্বীনদাররাও চিনে না, এ যামানার সাধারণ ধার্মিক কিংবা বিশেষ দ্বীনদার মহল (আলেম সমাজ)-এর সাথেও যাদের যিন্দেগী মিলে না, অবাক বিস্ময়ে পৃথিবী এমন কিছু ব্যতিক্রমধর্মী মুসলমানদের দেখবে, যাদের মতো মানুষ পৃথিবী এর আগে চৌদ্দশত বছর পূর্বে দেখেছিল, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ছাড়া আর কিছুই বুঝবে না, পৃথিবীর কোনো পরাশক্তির রক্তচক্ষু তাদেরকে ভীত করতে পারবে না, বিপরীতে তারাই সাহাবাদের মতো পৃথিবীকে শেষবারের মতো কাঁপিয়ে তুলবে, দুনিয়ার সকল ত্বগুত ও বাতিলের মসনদকে তছনছ করে গুড়িয়ে দিবে, এক আল্লাহ তাআলার আইন প্রতিষ্ঠা করবে! যুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়-ইন্‌সাফ কায়েম করবে। ইন্‌শাআল্লাহ, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়!!!

رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তারাও আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট হবে; তারাই আল্লাহর বাহিনী; শুনে রাখ! আল্লাহর বাহিনীই সফলকাম হবে।" (৫৮ সূরা মুজাদালাহ: ২২)

فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ

"নিশ্চয়ই, আল্লাহর বাহিনীই বিজয়ী হবে।" (৫ সূরা মায়েদা: ৫৬)

কারা হবেন সেই ‘অপরিচিত’ মুসলমান?
কারা হবেন সেই ‘কামিয়াব’ আল্লাহর বাহিনী?
কারা হবেন সেই ‘সুনিশ্চিত বিজয়ী’ বাহিনী?
কারা থাকবেন সেই সাহাবাওয়ালা বাহিনীতে?
হ্যাঁ, বন্ধু! আল্লাহ তাআলা চাইলে হতে পারি আমরাও তাদের-ই একজন।
তাই আসুন যিন্দেগী পাল্টাই!
নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী গঠনের মেহনতে নেমে পড়ি, এখনি, জলদি!!!
সময় খুব কম, সীটও অল্প!!!
অতএব, কালক্ষেপণ না করে, আমাদের যিন্দেগীতে কায়েম করি হারিয়ে যাওয়া সেই “গরীব ইসলাম”!!!

****

গ. বাসস্থানঃ

ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষতিকর প্রাণি আর চোর-ডাকাতের উপদ্রুপ হতে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য মানুষ বাড়ি-ঘর তৈরি করে। কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের ﷺ মেজাজ কী ছিল? বাড়ি-ঘর নির্মাণের সুন্নত তরীকা কি? কী ধরণের বাসস্থান দুনিয়া বিমুখতার পরিপন্থী?

এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো, "এই অস্থায়ী পৃথিবীতে বাসগৃহের যত অস্থায়ী ব্যবস্থা করা যায়, ততই দুনিয়াত্যাগী হওয়ার পক্ষে অধিক হিতকর।" এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তিন প্রকারের বাসগৃহ পাওয়া যায়-

এক. স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নিজের কোনো ঘর না থাকা, মসজিদ বা অন্যের মুসাফিরখানায়, পাহাড়ের গুহায়, বনে-জঙ্গলে কিংবা যাযাবরের যিন্দেগী অবলম্বন করা। **এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুনিয়া ত্যাগ।** এই ধরণের বসবাস সংসারের প্রতি মন আদৌ আকৃষ্ট হতে পারেনা। পরিবার পরিজন নিয়ে এইভাবে বসবাস করা নিতান্ত কঠিন। **এটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হলেই কেবল সহজ হয়।**

দুই. অন্যের বানানো বাড়িতে স্থায়ীভাবে ভাড়া থাকা।

তিন. নিজের জন্য ও নিজের পরিবারের জন্য চিরস্থায়ী বাড়ি বানানো।

আবার, বাড়ি কি দিয়ে বানানো হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে বাড়ি তিন প্রকার। যথা:

এক. মাটি, ছন বা বাঁশের বেড়া বা এ জাতীয় নিম্নমানের বস্তু দ্বারা বানানো ঘর।

দুই. টিন দ্বারা বানানো ঘর।

তিন. ইট বা পাথর দ্বারা বানানো বিল্ডিং/দালান ।

১. স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নিজের কোন ঘর না থাকা, মসজিদ বা অন্যের মুসাফিরখানায়, পাহাড়ের গুহায়, বনে-জঙ্গলে কিংবা যাযাবরের যিন্দেগী অবলম্বন করা।

২. মাটি, ছন বা বাঁশের বেড়া বা এ জাতীয় নিম্নমানের বস্তু দ্বারা বানানো ঘরে ভাড়া থাকা।

৩. টিন দ্বারা বানানো ঘরে ভাড়া থাকা।

নিকৃষ্টতম

৪. নিজের মালিকানায় মাটি, ছন বা বাঁশের বেড়া বা এ জাতীয় নিম্নমানের বস্তু দ্বারা বানানো ঘরে বসবাস

৫. নিজের মালিকানায় টিন দ্বারা বানানো ঘরে বসবাস করা

৬. ইট বা পাথর দ্বারা বানানো বিল্ডিং/দালানে ভাড়া থাকা

৭. নিজের মালিকানায় ইট বা পাথর দ্বারা বানানো বিল্ডিং/দালানে বসবাস করা

উপরোল্লিখিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বলা যায়, পরিবার নিয়ে থাকার মতো সর্বোত্তম বাড়ি হচ্ছে, অন্যের বানানো মাটি, ছন বা বাঁশের বেড়া বা এ জাতীয় নিম্নমানের ঘরে ভাড়া থাকা। আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বাড়ি হচ্ছে নিজের পয়সায় ইট বা পাথর দ্বারা বানানো বিল্ডিং/দালান। এ ধরণের ঘর যারা বানায় তারা 'যাহিদ' শ্রেণি হতে বহিষ্কৃত হবে।

দুনিয়াত্যাগীর জন্য ঘরের আয়তন আবশ্যকতার পরিমিত হওয়া উচিত। অনাবশ্যক উঁচু, কিংবা প্রশস্ত হলেও **দুনিয়াত্যাগীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না।**

একজন দুনিয়া ত্যাগীর ঘর ছয় গজের অধিক উচ্চ, অধিক প্রশস্ত, দেয়ালে নানাবিধ লতা-পাতার বিচিত্র নকশা অঙ্কিত এবং জাঁকাল আসবাবপত্রে সজ্জিত হতে পারে না।

হযরত হাসান বসরী রদিয়াল্লহু আনহু এবং হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ (যাকে ইসলামের পঞ্চম খলীফা বলা হয়, তিনি) বলেন, "হযরত রাসূলে কারীম ﷺ সারা জীবনে নিজের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য কখনও একখানি ইটের উপর আর একখানি ইট স্থাপন করেন নাই এবং একটা কাঠের সাথে আরেকটি কাঠও জোড়া দেন নাই।"

হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন,"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাসগৃহ এত উচ্চ ছিল যে, একজন মানুষ মেঝের উপর দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করলে তার ছাদ স্পর্শ করতে পারত।"

সুব্‌হানাল্লাহ! মুসলিম উম্মাহর মাঝে এই আদর্শ এখন গেল কোথায়?

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা যার অমঙ্গল চান, তার ধন সম্পদ পানি ও মাটির মধ্যে বিনষ্ট করে দেন।" (অর্থাৎ বাসগৃহ নির্মাণের জন্য মাটি ও পানির সাহায্যে ইট প্রস্তুতের কাজে ব্যয় করে দেন।)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, একদিন রাসূলে কারীম ﷺ আমাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি করতেছ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একখানা কুঁড়েঘরে ছিল, ভেঙ্গে গেছে। আমরা তা মেরামত করছি। তিনি বললেন, তোমরা এখন যে কাজে হাত দিয়েছো, আসল কাজ তা অপেক্ষা আরোও নিকটবর্তী। সময় পাবে কিনা বলা যায় না। অর্থাৎ মৃত্যু মাথার উপর দণ্ডায়মান।

আরেকদিন তিনি বলেন, " যে ব্যক্তি (আয়তনে বা সংখ্যায়) আবশ্যকের অতিরিক্ত গৃহ নির্মাণ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে আদেশ করা হবে, এই গৃহ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।"

হযরত নবী করীম ﷺ বলেন, "মানুষ সংসারে যে সমস্ত বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য ভীষণ শাস্তির কারণ হবে। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম হতে আত্মরক্ষার জন্য যত বড় গৃহের একান্ত প্রয়োজন তত বড় গৃহ নির্মাণ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে না।"

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু একবার সিরিয়ায় যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে ইট নির্মিত কতগুলো বিল্ডিং দেখে বললেন, "ইতিপূর্বে আমি ধারণাও করতে পারিনি যে, হামান ফেরাউনের জন্য যে উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, একসময় মুসলমানরাও ইট দিয়ে তদ্রূপ উঁচু দালান বানাবে।"

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লহু আনহু একটি উচ্চ বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। হুযুরে আকরাম ﷺ-এর আদেশে পরে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়।

হযরত সালমান ফারসী রদিয়াল্লহু আনহু মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত হলেন। সেখানে তাঁর কোনো ঘর ছিল না। কোনো ঘর পেলে ঘরের ছায়ায় আশ্রয় নিতেন। এক লোক তাঁকে বলল, আমরা আপনার জন্য একটি ঘর বানাতে চাই। শীত ও গরম থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি রাজি হলেন। লোকটি চলে যেতে উদ্যত হলে তিনি লোকটিকে বললেন, ঘরের ধরণ কেমন হবে? লোকটি বলল, "ঘর হবে বাঁশের। দাঁড়ালে মাথা ছাদ স্পর্শ করবে। শুলে পা দেয়াল স্পর্শ করবে।" তিনি রাজি হলেন। যেমন বলা হলো ঠিক তেমনি ঘর বানানো হলো।

একদিন নবীজী ﷺ কয়েকজন সাহাবী রদিয়াল্লহু আনহুমদের সাথে বের হলেন। তিনি একটি গম্বুজ বিশিষ্ট পাকা বাড়ি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাড়িটি কার? সাহাবা রাদিয়াল্লহু আনহুম জানালেন, অমুক আনসারির। এ কথা জানতে পেরে নবীজী ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন এবং সেখান হতে চলে গেলেন। পরবর্তীতে একদিন সেই আনসার সাহাবী নবীজী ﷺ-এর খেদমতে এসে সালাম দিলেন, কিন্তু নবীজী ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং সালামের উত্তর দিলেন না। সেই আনসার সাহাবী কয়েকবার সালাম দিলেন, কিন্তু প্রতিবারই নবীজী ﷺ চুপ রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, নবীজী ﷺ কোনো কারণে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অন্যান্যদের নিকটে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা জানালেন, নবীজী ﷺ বাইরে গিয়েছিলেন এবং পথে তোমার বাড়ি দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এ কথা শুনে সেই আনসার সাহাবী সেখান থেকে চলে গেলেন এবং নিজের বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। এরপর অন্য একদিন নবীজী ﷺ সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই পাকা বাড়িটি দেখতে না

পেয়ে সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই গম্বুজটির কি হলো? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, সেই বাড়ির মালিক আনসারি আমাদের নিকট আপনার মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমরা তাকে বলেছিলাম, আপনি তার দালান দেখেছেন। তাই সে ভেঙ্গে ফেলেছে। তখন নবীজী ﷺ বললেন, প্রত্যেক পাকা দালান তার মালিকের জন্য আযাব হবে, তবে সেই ঘর ব্যতীত যা মানুষ নিতান্ত প্রয়োজনে নির্মাণ করে। আনসারি সাহাবীর উক্ত ঘটনাটি হতে বুঝা যায়, আল্লাহর রাসূল ইটের বিল্ডিং কতটা অপছন্দ করতেন।

কোনো একজন সাহাবী রাযি. নবীজীর ওফাতের অনেকদিন পর মদীনায় ঢুকে নতুন কিছু বিল্ডিং দেখে এক লোককে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন্ শহর? লোকটি জানাল, এটি নবীজী ﷺ-এর শহর। তখন ঐ সাহাবী রাযি. মন্তব্য করেছিলেন, "ও! আমি মনে করেছিলাম, এটা ফিরাউনের শহর!" কথাটি ঐ ব্যক্তির নিকট বেআদবীমূলক মনে হওয়ায় সে ঐ সাহাবীকে ধরে তৎকালীন খলিফার নিকট নিয়ে যায়। খলীফা সাহাবীর পরিচয় পেয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তার এহেন মন্তব্যের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন সাহাবী রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, "আল্লাহর রাসূলের ﷺ যামানায়তো আমরা এগুলো কখনো দেখিনি, এগুলো বানানোর কথা চিন্তাও করিনি, বরং অপছন্দ করতাম, কেননা আল্লাহর রাসূলের ﷺ মুখে শুনেছি, ফিরাউন উঁচু উঁচু বিল্ডিং বানাত।"

হায়! আজ যদি সাহাবায়ে কেরাম কেউ জীবিত হয়ে আসতে পারতেন না জানি এই যামানার মুসলমানদের বিল্ডিংগুলো দেখে কী মন্তব্য করতেন আর এই বিল্ডিংগুলোরই না জানি কী হালত করতেন!!

❖ বর্তমান যামানায় ইসলাম:

● বর্তমানে সাধারণ মুসলমানদের তো বটেই, এমনকি বড় বড় আলেম উলামাদেরও আজীবনের স্বপ্ন-সাধ থাকে একটি পাকা বাড়ি বানানোর। আমার শহরে যতগুলো বড় বড় মাদরাসা আছে, তার প্রতিটির মুহতামিম সাহেবদের দুই চার তলা ইটের দালান রয়েছে। হায়রে উম্মত! একটুও চিন্তা করে না, রহমতের নবী যে কারণে তাঁর প্রিয় আনসারী সাহাবীর সালামের জবাব দিলেন না, এমনকি তার দিকে মুখ ফিরেও তাকালেন না, সেই নবী আমার-আপনার মতো গুনাহগারকে কি কিয়ামতের ময়দানে বুকে টেনে নিবেন? সাহাবীদের প্রতি এক আচরণ আর আমি আলেম বলে আমার সাথে আরেক আচরণ করবেন, সেটা কিভাবে সম্ভব? যেই সকল আলেম দুই-চার তলা পাকা দালান নির্মাণ করেন, তাদের কতগুলো যুক্তি আছে। যেমন:

১. আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রশস্ত বাড়ি, একটি বাহন ও নেক স্ত্রীর জন্য দুআ করেছেন।

মন্তব্য: ভালো কথা। যিনি ﷺ দুআ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা সেই নবীজী ﷺ-কে তাঁর দুআর প্রেক্ষিতে কি ধরণের বাড়ি দিয়েছিলেন?

২. বাড়িটি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বানানো হয়েছে?

মন্তব্য: প্রয়োজন আর নিতান্ত প্রয়োজন কি এক কথা হলো? বাড়ি বানাতেই যদি হবে, পাকা বাড়ি কেন?

৩. মাদরাসা পড়িয়ে যে টাকা বেতন পাওয়া যায়, তা দিয়ে সংসার চলে না, চললেও টাকা পয়সার পেরেশানীর কারণে দীনী ফিকির করতে সমস্যা হয়, তাই টাকা পয়সার একটি উৎস হিসেবে বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেয়া

হয়েছে। ভাড়ার টাকা দিয়ে সংসার চলবে আর আমি নিশ্চিন্তে চব্বিশ ঘন্টা দীনের খেদমত করব।

মন্তব্য: সংসার না চললে বাড়ি বানানো হয় কিভাবে? দুনিয়া অর্জন করে দীনী ফিকির করতে হবে, এটি কি আল্লাহর রাসূলের সুন্নত? বরং সুন্নত হলো দুনিয়া বর্জন করে যতটুকু দীনের কাজ করা যায়। না হলে উম্মত আমাকে দেখে দুনিয়া শিখবে, দুনিয়াদার হওয়ার জন্য আমাকে দলীল হিসেবে পেশ করবে। আর সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত হলো রুজি রোজগারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণ মেহনত করতেন, বাকি সময় দীনের খেদমত করতেন।

উলামায়ে কেরামের প্রসঙ্গটা কেন আনলাম? কারণ, হযরত সাঈদ বিন জুবাইর রদিয়াল্লহু আনহুকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, হে আবু আব্দুল্লাহ! মানুষের ধ্বংস হওয়ার আলামত কী? তিনি বললেন, তাদের আলেম সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

এর কারণ, মানুষ আলেমদের দেখে দেখে ইসলাম শিখবে। আমার নবীর যিন্দেগী শিখবে। সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী শিখবে। তাদের মেজাজ দেখে দেখে নবীওয়ালা/সাহাবাওয়ালা মেজাজ শিক্ষা করবে। সাধারণ মানুষ যখন দেখবে তার পীর সাহেব/ কোন বড় আলেম চার-পাঁচতলা বিল্ডিং বানিয়েছেন, তখন সে কী ভাববে? সে ভাববে-

- আমার পীর সাহেব/ঐ আলেম কত বড় আল্লাহ ওয়ালা, তার উপর আল্লাহর কতই না রহমত, তাকে আল্লাহ তাআলা কত কত নিয়ামত দিয়েছেন, তাকে বাড়ি, গাড়ি দিয়েছেন, তাকে দুনিয়াতে বাদশাহী দিয়েছেন! আলেমরা দুনিয়ারও বাদশা, আখেরাতেরও বাদশা!

- দুনিয়াতে যে আলেমের যত বাদশাহী যিন্দেগী, সে আলেম তত বড় আল্লাহওয়ালা, পরহেযগার, মুত্তাকী! কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেছেন, পরহেযগারদের জন্য আল্লাহ তাআলা তার ধারণার বাইরে থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।
- আমার পীর/বড় আলেম যদি বিল্ডিং বানাতে পারে, তাহলে আমার সমস্যা কোথায়?

একটু চিন্তা করুন! সাধারণ মানুষ কিন্তু কখনোই কারো যিন্দেগীকে আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর সাথে মিলাবে না, বা মিলানোর ক্ষমতা রাখে না, ফলে ফেতনায় জর্জরিত এই সকল আলেমদের দেখে মানুষ ফেতনাকে হিদায়াত আর বদদ্বীনকে দ্বীন মনে করা শুরু করেছে। 'দুনিয়ার বাদশাহী' বলতে অধিক টাকা পয়সার মালিক হওয়া, বিলাসবহুল যিন্দেগী লাভ করা, বাড়ি-গাড়ি-নারীর প্রাচুর্যকে বুঝায় না।

'উলামায়ে কেরামের দুনিয়ার বাদশাহী' বলতে বুঝায় "উলামায়ে কেরাম যখন আমার নবীর ﷺ যিন্দেগীকে আঁকড়ে ধরবে, তখন সাধারণ মানুষের অন্তরে আল্লাহ পাক তার প্রতি এমন মহব্বত আর সম্মান ঢালবেন, যা দেশের বাদশাহর কপালেও জুটে না। ফলে আম-জনতার উপর তার এমন প্রভাব সৃষ্টি হবে, যার প্রেক্ষিতে তারা সেই আলেমের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখন যদি দেশের বাদশাহ থাকে একদিকে আর ঐ আলেম থাকেন আরেকদিকে, তাহলে মানুষ ঐ আলেমের দিকেই ঝুঁকবে, এটাই দুনিয়াতে আলেমের বাদশাহী।

একটি সুন্দর উদাহরণ দেয়া যাক! আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে "উভয় জাহানের বাদশাহ" বলে থাকি। তাই না? তাই যদি হয় উনার রাজ প্রাসাদ কোথায়? উনার রাজ পোশাক কোথায়? শাহী খানা-দানার ইতিহাস কোথায়? উনার বাদশাহীর তাহলে অর্থ কি? আশা করি আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই!!!

যাইহোক, উম্মতকে এভাবে গোমরাহ করার দায়ভার কে নিবে? এভাবে উম্মতকে আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর কথা ভুলিয়ে দেওয়ার পেছনে কারা দায়ী থাকবে?

- বর্তমান যুগে দ্বীন শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতেও (মাদরাসাগুলোতেও) একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেই মাদরাসার বিল্ডিং যত সুন্দর, যত আধুনিক, যত রুচিশীল, যত উঁচু, সেই মাদরাসার মুহতামিম তত বড় আল্লাহওয়ালা, তত বড় বুযুর্গ। কেননা তিনি তো এই বিল্ডিং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে চেয়ে ফয়সালা করিয়ে নিয়েছেন। বুযুর্গদের আরামের নামে মেহমানখানাগুলোকে কতরকম ভাবে সাজানো হয়, ফ্রীজ-এ.সির ব্যবস্থা করা হয়। আহ্! এইগুলো হলো আমাদের যামানার নষ্ট মানসিকতা। আমরা ভুলে যাই, ইটের দালানে থাকতে থাকতে আমাদের ত্বলীবুল ইলমদের দীলটাও ইটের মতোই শক্ত হয়ে যাচ্ছে, রূহানীয়াত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সবচেয়ে বড় কথা, দুনিয়াদার হওয়ার তালীম নিয়ে মাদরাসা থেকে বের হচ্ছে। এরা কি আরো কোনোদিন ইটের দালান ছাড়া থাকতে পারবে? জিহাদের প্রয়োজনে পাহাড়-পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিতে পারবে? কখনোই পারবে না। আল্লাহ, তুমি এই উম্মতকে বুঝ দাও।

- আমাদের সমাজে আরেকদল 'গণ্ডমূর্খ' আছে। এদের কার্যক্রম দেখলে মনে হয়, এরা 'নিরেট গর্দভ'! এরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে জাঁকজমক পূর্ণ মাসজিদ নির্মাণ করে এই আশায় যে, আল্লাহ তাআলাও তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ বানিয়ে দিবেন। কেননা নবীজী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ বানাবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ বানাবেন।"

আরে বোকার দল! তোমরা যা বানাচ্ছ, তাতো মসজিদ নয়, কিয়ামতের আলামত! আল্লাহর রাসূল ﷺ কি বলেছেন, ঝাকানাকা মসজিদ বানাতে হবে, টাইলস লাগাতে হবে, এ.সি লাগাতে হবে, অন্যের মসজিদ হতে তোমার মসজিদটা যেন সুন্দর হয়, 'আন-কমন' ডিজাইনের হয়? আরে, আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে কি মসজিদ বানাননি, বর্তমান যে মসজিদে নববী দেখছ, এটাই কি আল্লাহর রাসূল ﷺ বানিয়েছিলেন? কক্ষণো না। আমাদের সমাজে আরো "এক প্রকার গর্দভ" পাওয়া যায়, যারা সুন্নত জিন্দা হবে এবং একশ গলাকাটা শহীদের সওয়াব মিলবে মনে করে বর্তমান মসজিদে নববীর ডিজাইন অনুকরণে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মসজিদ বানিয়ে নাম দেয় "মদীনা মসজিদ"। হায়রে মূর্খ! বোকা কি গাছে ধরে, নাকি মানুষের মাঝে পাওয়া যায়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদের ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।" (সহীহ ইবনে খুযাইমা ২/২৮২; সহীহ ইবনে হিব্বান খ. ৪, পৃ. ৪৯৩)

নবীজী ﷺ আরো ইরশাদ করেন,"যখন কোনো সম্প্রদায়ের পাপ বেড়ে যায়, তখনই সমাজের মসজিদগুলো সুসজ্জিত হয়। আর দাজ্জালের

আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত মসজিদগুলো সুসজ্জিত হবে না।”
(আস্‌সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খ. ৪, পৃ. ৮১৯)

হযরত আবুদ্দারদা রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, “যখন তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে সাজাবে কুরআনের কপিগুলোকে অলংকৃত করবে, তখন বুঝে নিবে, তোমাদের ধ্বংস অবধারিত হয়ে গেছে।” (কাশফুল খাফা খ. ১, পৃ. ৯৫)

❖ কেমন ছিল আল্লাহর রাসূলের হাতের বানানো মসজিদ ও মাদরাসা?

খেজুর কাণ্ড মাটিতে তিন হাত পরিমাণ গর্ত করে সেখানে পুঁতে মসজিদের জন্য খুঁটি তৈরি করা হলো। নবীজী ﷺ তখন তলক ইবনে আলী রদিয়াল্লহু আনহু-কে কাদা গোলাবার হুকুম দিলেন। তারপর সকলে হাতে হাতে সেই কাদা ও (পাকা নয়,) কাঁচা ইট দিয়ে মসজিদুন নববীর দেয়ালগুলো তৈরির কাজ শেষ করলেন। এরপর খেজুর পাতা বিছিয়ে ছাদ দেয়া হলো। ছাদের উচ্চতা এতোটুকু ছিল যে, একজন মানুষ হাত উঠালে তা ছাদে লেগে যেতো। বৃষ্টি হলে মেঝে কর্দমাক্ত হয়ে যেতো। সিজদা দিলে কপালে কাদা লেগে যেত। এই তো ছিল নবীজী ﷺ-এর হাতে গড়া মসজিদ। সুন্নতী মসজিদ। আবার এটিই ছিল তাঁর হাতে গড়া ইসলামের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাদরাসা, যার ত্বলেবে এলেমদেরকে “আসহাবে সুফ্‌ফা” বলা হতো। এই মাদরাসা থেকেই বের হয়েছে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির, সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস্‌, সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ, সর্বশ্রেষ্ঠ দাঈ, সর্বশ্রেষ্ঠ সালেকীন, সর্বশ্রেষ্ঠ সিপাহ- সালারগণ, খুলাফায়ে রাশেদাগণ। সারা দুনিয়াতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য খেজুর পাতার ছাদের সেই মাদরাসাই যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ কি ইচ্ছা করলে কিসরা

আর কায়সারের প্রাসাদগুলোর ন্যায় সৌন্দর্যমণ্ডিত মসজিদ/মাদরাসা তৈরি করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু করেননি। আল্লাহ তাআলাকে সিজদাহ দেয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলা কী এই খেজুরের পাতার মসজিদের/মাদরাসার বদলায় তাঁর হাবীব ﷺ-কে জান্নাতে একটি প্রাসাদ দিবেন না? অবশ্যই দিবেন। তাই, কোটি টাকা মসজিদ/মাদরাসার দালানের পিছনে খরচ না করে সত্যিকারের নবীওয়ালা দ্বীন চর্চা এবং সেই দ্বীনের প্রচার প্রসারের কাজে ব্যয় করুন, দাওয়াত ও জিহাদের কাজে ব্যয় করুন, তাতে সওয়াব বেশি হবে, আল্লাহ তাআলা বেশি সওয়াব দান করবেন!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহাবাওয়ালা মেজাজ দান করুন। আমীন।

ঘ. গৃহের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি:

দুনিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, আমাদের গৃহের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। একজন মানুষের ঘর দেখলেই বুঝা যাবে, সে কি আল্লাহর রাসূলের অনুসারী দুনিয়াত্যাগী, নাকি বিলাসী দুনিয়াদার। সুন্নতের অনুসারী বলতে আমরা এখন বুঝি সেই ব্যক্তিকে যে বিভিন্ন আমলে সুন্নতের খুব পাবন্দী করে, যেমন: মসজিদে ঢুকার ও বের হওয়ার সুন্নত আদায় করে, সুন্নত তরীকায় ওযু, গোসল, নামায আদায় করে, ইস্তিঞ্জায় প্রবেশ করা ও বাহির হওয়ার আদব খেয়াল করে, খেয়াল করে করে ডান পার্শ্ব হতে ভালো কাজগুলো করে, আর নিম্নমানের কাজগুলো বাম পার্শ্ব হতে শুরু করে, মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করে ইত্যাদি। অবশ্যই এই সুন্নতগুলো অনেক দামী। বরং সাত আসমান যমিন এক পাল্লায় আর আদনা একটি সুন্নতকে আরেক পাল্লায় রাখা হলে, সুন্নতের পাল্লাই ভারী হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যেটি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে, এই ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সুন্নতের আংশিক অনুসারী বলতে পারি, কিন্তু এতটুকু থাকলেই তাকে আমরা "আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর অনুসারী" বলি না। কতিপয় সুন্নতের অনুসারী হওয়া আর আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর অনুসারী হওয়া ভিন্ন জিনিস। যতক্ষণ পর্যন্ত তার যিন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর প্রতিফলন না পাবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে নবীজীর ﷺ যিন্দেগীর অনুসারী কিংবা পরিপূর্ণ সুন্নতের অনুসারী বলতে পারি না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি মাত্র বালিশ ছিল। চামড়া দ্বারা নির্মিত খোলের মধ্যে খেজুর গাছের সরু আঁশ ভর্তি করে তা বানানো হয়েছিল।

একটি পশমী কম্বলকে দুই ভাঁজ করে তাঁর বিছানা বানানো হয়েছিল। তাঁর ঘরে কোনো খাট, চৌকি বা আসবাবপত্র ছিলো না।

একবার আম্মাজান আল্লাহর রাসূলের ﷺ আরাম হবে চিন্তা করে কম্বলটিকে চার ভাঁজ করে দিলেন। এতে নবীজীর ﷺ ঘুম একটু বেশি হয়ে যায়। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে কম্বলকে চার ভাঁজ করা হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন।

একবার এক আনসারি মহিলা আম্মাজান আয়িশা রদিয়াল্লহার সাথে দেখা করতে আসলেন। তিনি দেখলেন, নবীজী ﷺ -এর বিছানা হলো একটি হাতাবিহীন আলখাল্লা, যা ঘুমানোর সময় দুই ভাজ করে বিছিয়ে দেয়া হতো। তখন তিনি ফিরে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পশম ভর্তি একটি তোষক আম্মাজানের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তোষকটি আম্মাজান খুব পছন্দ করলেন। পরে যখন নবীজী ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তোষকটি দেখে আম্মাজানকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আয়েশা! এটা কী? আম্মাজান উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক আনসারি মহিলা আমার কাছে এসেছিলো, সে আপনার বিছানা দেখে গিয়ে আমার কাছে এটা পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন নবীজী ﷺ বললেন, তুমি তা ফিরিয়ে দাও। একথা শুনে আম্মাজান একটু মন খারাপ করলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, তোষকটা তার ঘরে থাকুক। কিন্তু নবীজী ﷺ আবার বললেন, হে আয়েশা! তুমি তা ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! যদি আমি চাইতাম, তাহলে আল্লাহ পাক আমার সাথে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড় চালিত করতেন।

অনেক সময় আল্লাহর রাসূল শুধু চাটাইয়ের উপরই ঘুমাতেন, কোন কম্বলও ব্যবহার করতেন না।

একবার নবীজী ﷺ তাঁর ঘরের মহিলাদের সাথে অভিমান করে কিছুদিনের জন্য আলাদা একটি কামরায় অবস্থান করলেন। এ সময় একদিন ওমর রদিয়াল্লহু আনহু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। অনুমতি নিয়ে হযরত ওমর রদিয়াল্লহু কামরায় প্রবেশ করে দেখলেন যে, নবীজী ﷺ -এর ঘরের এক কোণে কিছু যব পড়ে আছে, একটি চামড়া ঝুলানো রয়েছে এবং তিনি খালি গায়ে চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন, ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি এর থেকে নরম কোনো বিছানা গ্রহণ করতেন! তখন নবীজী ﷺ বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ হলো ঐ ঘোড়ায় আরোহীর মতো, যে গ্রীষ্মের দিনে পথ চলে অল্প সময়ের জন্য কোনো গাছের ছায়ায় আরাম করে, তারপর সেখান থেকে উঠে চলে যায়।

নবীজী ﷺ -এর ঘরের সামানপত্রের অবস্থা দেখে ওমর রদিয়াল্লহু আনহুর চোখে পানি এসে গেলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লহু আনহুর চোখে পানি দেখে নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তখন ওমর রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অথচ রোম ও পারস্যের বাদশা কিসরা ও কায়সার ভোগ বিলাসে আছে। একথা শুনে নবীজী ﷺ রাগান্বিত হয়ে বসে গেলেন। বললেন, হে খাত্তাবের বেটা! তুমি কি সন্দেহের মধ্যে আছো? ওরা তো এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পার্থিব জীবনেই সকল আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের উপকরণ দিয়ে দেয়া হয়েছে। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া, আর আমাদের জন্য হবে আখিরাত। তখন

হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এর উপর (সন্তুষ্ট আছি এবং) আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছি। এর কিছুদিন পর অভিমান শেষে নবীজী ﷺ ঘরে ফিরে যান।

সাহাবায়ে কেরামগণও নবীজী ﷺ-কে দুনিয়াত্যাগের ব্যাপারে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। যেমন উস্তাদ, তেমন সাগরেদ! হযরত হাসান বছরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি সত্তর জন ছাহাবী রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈনদের সাহচর্য লাভের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছি। তাঁদের সকলের জীবন যাপনের পদ্ধতি একই রকম ছিল। তাঁরা নিতান্ত সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত ধরণের এক প্রস্থ মাত্র কাপড় পরতেন। কাপড়টি পরিধান করে খাট, চৌকি অথবা বিছানায় না শুয়ে শুধু মাটির উপর নিজের পাঁজর বা পিঠ স্থাপন করে শুয়ে পড়তেন। দেহের মধ্যে ধূলাবালি লাগবে কি লাগবে না, সেই সঙ্কোচ করতেন না। শুধু মাটির উপর শুয়ে চাদর দিয়ে শরীর ঢাকতেন। সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগী যাপনের ধারা ছিল এরূপ সাধারণ ও আড়ম্বরবিহীন।"

হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু তাঁর খিলাফত কালে সিরিয়া সফরে গেলেন। প্রজাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। সাথীদের অবস্থা দেখছিলেন। রাতে সিরিয়ার গভর্নর হযরত আবূদ্ দারদা রদিয়াল্লহু আনহুর দরজায় এলেন। বড় আওয়াজে বললেন, আস্সালামু আলাইকুম।

আবূদ্ দারদা জবাব দিলেন, ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম।

-আসতে পারি?

চিনতে না পেরে বললেন, আসুন।

হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু দরজা ধাক্কা দিলেন। দরজা খোলা। লাগানোর কোনো ছিটকিনি নেই। ঘর অন্ধকার, কোনো বাতি নেই। অন্ধকার হাতড়ে হযরত আবূদ্ দারদা রদিয়াল্লহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছলেন। বালিশে হাত দিয়ে অনুভব করলেন এটা বালিশ নয়। মাথার নিচে রাখা হয়েছে উটের জিন। বিছানা মনে করে হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন, এটা বিছানা নয়, মাটি। শরীরের ওপর দেওয়া চাদরে হাত দিয়ে বুঝলেন, এটি একদম জরা-জীর্ণ।

হযরত আবূদ্ দারদা রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, কে? আমীরুল মু'মিনীন?

- হ্যাঁ, আল্লাহ রহম করুন! আপনি কি ভাতা পান না?

- রাসূলের ঐ হাদীসটি কি স্মরণ আছে?

- কোনটি?

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب

"তোমাদের একেকজনের সম্বল যেন হয় মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ।"

- হ্যাঁ, স্মরণ আছে।

হযরত ওমর রদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে কাঁদতে বললেন, রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর আমরা কী করছি? উভয়ে কাঁদতে লাগলেন। ফজরের আযান পর্যন্ত তাঁরা কাঁদলেন।

হযরত সালমান ফারসী রদিয়াল্লহু আনহু মৃত্যু শয্যায় শায়িত। সাদ ইবনে ওয়াক্কাস রদিয়াল্লহু আনহু তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁর কাছে বসলেন। সাদ রদিয়াল্লহু আনহুকে দেখে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

সাদ রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? মৃত্যুর সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। আগামীতে হাউযে কাউসারে তাঁর সাথে দেখা হবে।

হযরত সালমান ফারসী রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না। কিংবা দুনিয়ার লোভেও না। কাঁদছি এজন্য, রাসূল ﷺ আমাদের থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন- ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب
"তোমাদের একেকজনের সম্বল যেন হয় মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ।" আমার মনে হয় আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। এই বলে কাঁদতে লাগলেন। অথচ তাঁর কাছে সম্পদ বলতে ছিল শুধু- একটি আহার করার থালা, অযু করার বদনা এবং কাপড় ধোয়ার একটি পাত্র।

নবীজী ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম আসলেই কি এত দরিদ্র ছিলেন?

কেউ কেউ বলতে পারেন, আরে ভাই! আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামকে দারিদ্র্য দিয়েছিলেন আর তিনি বর্তমানে উম্মতকে অনেক সচ্ছলতা দিয়েছেন। সুতরাং উম্মত যদি একটু আরাম-আয়েশের যিন্দেগী যাপন করি তাতে সমস্যা কি? সাহাবায়ে কেরাম তো আরাম আয়েশের যিন্দেগী যাপন করার মতো উপকরণই পাননি!

ও আচ্ছা! তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়া দিয়েছেন আর সাহাবায়ে কেরামকে দুনিয়া থেকে বঞ্চিত করেছেন, এজন্য তাঁরা এত কষ্ট করেছেন? আসলে কি ব্যাপারটি তাই?

ইমাম কাস্তালানী রাহিমাহুল্লাহ 'মাওয়াহেব' কিতাবে লেখেছেন, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাথীগণ সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা

অনেক বেলা ক্ষুধার্ত থাকতেন। খাওয়ার মতো তাঁদের কাছে কিছুই থাকতো না। কখনও খেজু খেয়ে দিন কাটাতেন এবং কখনো খেজুর পাওয়া না গেলে কেবল পানি পান করেই কাটিয়ে দিতেন। কখনো কখনো উপর্যুপরি তিন তিনটি চাঁদ অতিবাহিত হয়ে যেত (অর্থাৎ পূর্ণ দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যেত); অথচ নবীজী ﷺ-র ঘরে চুলো গরম হতো না। শুধু খেজুরের দানা আর পানিই ঘরের খাদ্য ছিলো।

অপরদিকে রেওয়ায়েতসমূহে এসব তথ্যও পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজনকে সারা বছরের ভরণ-পোষণ একবারেই দিয়ে দিতেন। তিনি চল্লিশ জন সাহাবীদের মধ্যে চল্লিশটি উট বিতরণ করেছেন। হজ্জ ও ওমরার মধ্যে তিনি শত শত উট যবেহ করেছেন। তিনি কোনো এক বেদুঈনকে ছাগলের পাল দান করেছেন। তাঁর কিছুসংখ্যক সাহাবী প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক ছিলেন। তাঁদের উদার দানশীলতার বহু ঘটনা রয়েছে। যেমন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওসমান গণী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈন প্রমূখ। তাঁরা তাঁদের ধন-সম্পদ দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। অতএব যদি এমনি সুখ-স্বচ্ছন্দ ও ধনাঢ্যতা থাকবে, তাহলে কয়েকদিন যাবত ক্ষুধার্ত থাকা এবং মাসের পর মাস চুলা না জ্বালার অর্থ কি? আর যদি এমনি দারিদ্র থাকবে যে, পানাহারের জন্যে কিছুই পেতেন না, তবে এই দান-দক্ষিণা কেমন করে হতো? এ পরস্পর বিরোধী চিত্রটি সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় স্বভাবতই তালগোল পাকিয়ে দেয়।

ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনা এবং ফতহুল বারীতে এ প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের এই কষ্টভোগ বাস্তবে দারিদ্র্য কিংবা অপারগতার কারণে ছিলো না। এমন সাহাবীর সংখ্যা

কমই ছিল, যাঁরা বাস্তবিকই নিঃস্বতা ও দারিদ্র্যের জীবন যাপন করতেন। আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের ক্ষুধার্ত থাকা কদাচিৎ অক্ষমতার কারণে হয়েছে।

সাধারণভাবে তাঁরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট, মাল সামানার অপ্রতুলতা, ধন-সম্পদের অপর্যাপ্ততা, এগুলো স্বেচ্ছায় বরদাশত করতেন, যাতে করে অপরের ত্যাগ তিতিক্ষার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং পার্থিব ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের প্রতি ঘৃণা এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ তারা দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগের মানসিকতা থেকেই এমনটি করতেন।

আবু উমামা রদিয়াল্লহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন," "আল্লাহ আমাকে বলেছেন, হে নবী! আপনি ইচ্ছা করলে সমগ্র মক্কা উপত্যকা আপনার জন্য স্বর্ণে পরিণত করে দেয়া হবে। আমি আরয করলাম, পরওয়ারদেগার! আমি বরং একদিন উপবাস করা, আরেকদিন পেট ভরে আহার করা পছন্দ করি, যেন উপবাসের দিন আপনার দরবারে কান্নাকাটি ও একান্তভাবে আপনারই স্মরণে মশগুল থাকতে পারি। পক্ষান্তরে যেদিন পেট ভরে খাই, সেদিন অন্তরের অন্তস্তল থেকে আপনার শোকরগোজারী ও প্রশংসা করি।" (ফতহুল বারী, মাদারেজুন্নবুওয়ত)

নবী করীম ﷺ বলেন, "আমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও দারিদ্র্য ও উপবাসের কঠোরতা ভোগ করেছেন। আল্লাহ তাআলার অনুকম্পা সমূহের মধ্যে এ অনুকম্পাটিও আমি সর্বাধিক পছন্দ করি।"

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লহু আনহা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও তৃপ্ত হয়ে খাদ্য গ্রহণ করতেন না এবং কখনও কারও কাছে এ সম্পর্কে মুখও খোলেননি। কেননা, তিনি দারিদ্র্যকে ধনাঢ্যতা অপেক্ষা অধিক পছন্দ

করতেন। তিনি প্রায়ই ক্ষুধার কারণে সারারাত্রি অস্থির থাকতেন, কিন্তু এই ক্ষুধা পরবর্তী দিন রোযা রাখা থেকে বিরত রাখতে পারতো না। রাত্রিতে কোনো কিছু পানাহার না করেই তিনি রোযা রাখতেন। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাআলার কাছে পৃথিবীর সমগ্র ধন-ভান্ডার, সর্বপ্রকার নেয়ামত ও প্রাচুর্য প্রার্থনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি দারিদ্র্য ও উপবাসকে বিলাস-ব্যসনের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমি রাসূলে কারীম ﷺ-এর এ অবস্থা দেখে কান্না জুড়ে দিতাম। ক্ষুধার কারণে স্বয়ং আমার অবস্থাও শোচনীয় হত এবং আমি পেটে হাত বুলাতাম আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতাম, হায়! আমাদের যদি জীবন ধারণোপযোগী পানাহার সামগ্রী থাকত। স্বচ্ছন্দ ও বিলাসিতা না হোক, কমপক্ষে সুখে জীবন যাপনের যদি সুযোগ হতো!' আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, "হে আয়েশা! দুনিয়া দিয়ে আমরা কী করব? আমার পূর্বে আমার অনেক মহান পয়গম্বর ভাই অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা দুনিয়াতে এসে আমার চেয়ে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তাঁরা সবর করেছেন এবং সবরের অবস্থায়ই আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন। সেখানে তাঁদেরকে সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে এবং নানারকম নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে। আমার আশংকা, আমাকে এ দুনিয়ায় স্বচ্ছন্দ দান করা হলে আখেরাতের অক্ষয় নেয়ামত হ্রাস পাবে। আমার কাছে এর চেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় কোনো কিছুই পাওয়ার নেই যে, আমি পরকালে আমার বন্ধু ও ভাইদের সাথে এ দারিদ্র্যাবস্থায় মিলিত হই।"

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লহু আনহা বলেন, "যে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন, সে দিনের পর একমাসও তিনি আমাদের

মাঝে থাকেননি; তিনি পরম প্রভু আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে চলে যান।” (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।) (শেফা, মাদারেজুন্নবুওয়ত, শামায়েলুর রসূল)

হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর দানের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো কল্যাণ কাজে আমরা হযরত আবু বকরের আগে যেতে পারিনি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিলো চল্লিশ হাজার দীনার। সবই তিনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিয়েছিলেন। তাঁতে যে কোনো ধরণের হস্তক্ষেপের অধিকার রাসূল ﷺ-এর ছিল।

‘বিদআত’ নিয়ে কিছু কথা:

‘বিদআত’ কি? আমাদের সমাজে যেই সংজ্ঞা প্রচলিত আছে তা হলো, নবীজী ﷺ বা সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ কোনো ইবাদতকে করেননি, এমন কোনো কাজকে ইবাদত মনে করে করা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তাহলে ‘পেট ভরে খাওয়া’ বিদআত হলো কি করে? কেননা খাওয়াটা তো মূলত কোনো ইবাদত নয়, একটি নিছক দুনিয়াবী কাজ। আসলে এটি বিদআতের সংজ্ঞাই না। এটি বিদআতের মাপকাঠি না। বিদআতের মাপকাঠি হচ্ছে- “আল্লাহর রাসূলের পবিত্র যিন্দেগী।” কুরআন কারীমে নেই বা আল্লাহর রাসূলের ﷺ জীবন-যাপন পদ্ধতির সাথে যা মিলবে না তাই বিদআত।

এর দলীল? খুব বিখ্যাত, কিন্তু খুব কঠোর সেই হাদীস-

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَ خَيْرَ الْهَدِى هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ

"আল্লাহর কিতাবই সর্বোত্তম কথা। আর মুহাম্মাদ এর তরীকাই সর্বোত্তম তরীকা (যিন্দেগীর আদর্শ)। আর নিকৃষ্ট কাজ হলো এর মধ্যে নতুন কিছু আনা। আর প্রত্যেক নতুন জিনিস হলো বিদআত, প্রত্যেক বিদআত গুমরাহী, আর প্রত্যেক গুমরাহীর স্থান হলো জাহান্নামে।"

উপরোক্ত হাদীসকে সামনে রাখলে "বিদআতের" সংজ্ঞা স্পষ্ট হয়। নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীর সাথে যা মিলবে না, হযরত আয়েশা রদিয়াল্লহু আনহার মতে "তা বিদআত"। এজন্য তিনি পেট ভর্তি করে খানা খাওয়াকেই বিদআত বলেছেন।

বর্তমানে মুসলমানদের হায়াতের পুরোটাই এমন সব নতুন জিনিস দিয়ে পূর্ণ যা কুরআনে বলা হয়নি বা নবীজী ﷺ-এর জিন্দেগীতে ছিলো না। এখন এই জিন্দেগী যদি আমি আল্লাহ পাকের সামনে পেশ করি, আর আল্লাহ পাক যদি আমার এই জিন্দেগীকে নাকচ করে দিয়ে একথা বলেন, তোমার পুরো জিন্দেগীই বিদআত, তাহলে সেই দিন আমাকে বাঁচানোর কেউ থাকবে কি?

বিদআতের উপরোক্ত সংজ্ঞা শুনে এক ভাই বললেন, নবীজী ﷺ তো বিমানে চড়েন নাই, তাই বিমানে চড়া বিদআত। ভাই, দ্বীন নিয়ে টিটকারি না করা চাই। বিমান বাহন, যুগের সাথে সাথে জিনিসের শেকেল বা আকৃতির পরিবর্তন হতে পারে, এটা গ্রহণ করা বিদআত নয়। সেই জামানায় তরবারি দিয়ে যুদ্ধ হতো, এই জামানায় বন্দুক। সেই জামানায়

উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ছিলো বাহন, এই জামানায় গাড়ি, ট্রেন বা বিমান। এগুলো বিদআত নয়।

অন্যদিকে, আমরা অনেক সময় এই ভ্রান্ত ফতোয়া দিয়ে বসি, "দুনিয়াকে যদি আখিরাতের নিয়তে করা হয়, তাহলে তা আখিরাত।" এর দ্বারা আমরা আমাদের খাহেশাত ও দুনিয়াদারীকে হালাল ও জায়েয করি এবং পাক্কা দুনিয়াদার হয়েও এই আত্মতৃপ্তিতে ভুগি- "আমি তো আখিরাতের জন্যই এসব করছি।" অথচ, ফতোয়াটা হওয়া উচিত ছিল এরকম- "দুনিয়ার কাজকর্ম যদি আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর মূলনীতি অনুসারে হয়, তাহলে তা আখিরাত। নাহলে নয়। কেবল নিয়তই একটি দুনিয়াবী কাজকে আখিরাতের কাজ বানায় না।" যেমন: কেউ চিন্তা করলো, আমি তিন বেলা খেয়ে শক্তি অর্জন করে আল্লাহর ইবাদত করবো, কিংবা জিহাদ করবো। নিয়ত তো সুন্দর, কিন্তু কাজটি বিদআত। (আম্মাজান হযরত আইশা রদিয়াল্লাহু আনহার ফতোয়া অনুসারে।) আবার, একজন চিন্তা করলো, আমি এজন্য ডিগ্রি করছি, যেন আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষের মাঝে দাওয়াতের কাজ করতে পারি। এই নিয়তকে বাস্তবায়ন করতে সে তার সমস্ত যিন্দেগী ডিগ্রির ধান্দায় কাটিয়ে দিল। ফলে সাহাবাওয়ালা যিন্দেগীর সাথে তার যিন্দেগীর পার্থক্য হয়ে গেল। নিয়ত তো অতি উত্তম, কিন্তু সে যা করলো তা হলো বিদআত। (আম্মাজান আইশা রদিয়াল্লহু আনহার পূর্বোক্ত ফতোয়ার ওযনে)।

আমি জানি, বিষয়টা আপনাদের অনেকের কাছে, বরং অধিকাংশ আলেমের কাছেও খটকা লাগছে, অস্পষ্ট লাগছে। এই বুঝ না থাকার কারণেই আমরা সাহাবাওয়ালা যিন্দেগীর ধারে কাছেও যেতে পারছি না।

আমরা সাহাবাদের থেকে কোথায় কোথায় পিছিয়ে আছি, কেন পিছিয়ে আছি, তা বুঝতে পারছি না। সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী বানাতে হলে আমাদের কী করণীয় তাও বুঝে উঠতে পারছি না। তাই বিষয়টি নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক মনে করছি।

খুব ভালো করে বুঝে নিন- **জীবন পদ্ধতি বা যিন্দেগীর উদ্দেশ্য বা মূলনীতির কথা বলা হচ্ছে।** সেই জামানায় নবীজী ﷺ-এর প্রকৃত অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমদের জিন্দেগীর উদ্দেশ্য দুনিয়া ছিলো না, দুনিয়া কামাই করে তা দিয়ে আখিরাত কামানো বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ছিল না (যাকে বর্তমানে আমরা দ্বীন মনে করি), বরং তাদের জিন্দেগীর উদ্দেশ্য ছিলো **আল্লাহর দীন জমিনে কায়েম করা, এর জন্য জান মাল যার যতটুকু আছে সব কুরবান হয়ে যাক এবং এর বিনিময়ে আল্লাহপাক রাজি হয়ে যাক।**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিন্দেগীর কিছু মূলনীতি ছিল। এই মূলনীতিগুলো থেকে সরে আসাটা বিদআত। এটাই বুঝানো হচ্ছে।

এরকম কিছু মূলনীতি লক্ষ্য করুন-

১. যিন্দেগী হতে হবে দুনিয়ামুক্ত, তাতে ভোগ-বিলাস, আরাম আয়েশ ও চাকচিক্য থাকতে পারবে না। 'যিন্দেগী চলে পরিমাণ' দুনিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মুসাফিরের সামানা পরিমাণ দুনিয়া থাকতে হবে।

এখন এই মূলনীতিকে ঠিক রাখতে হলে, আপনি পেট ভরে আহার করতে পারবেন না, একটা বা দুইটার বেশি জামা ব্যবহার করতে পারবেন না, খাট, তোশক, পালঙ্ক, সোফা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন না,

ফ্রীজ, এসির কথা বাদই দিলাম, নানান অজুহাত ও প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে ইটের পাকা বাড়ি বানাতে পারবেন না। এসব করাটা আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর/ তরীকার মূলনীতির খেলাফ হওয়ায় তা বিদআত। এই জন্যই আম্মাজান হযরত আইশা রদিয়াল্লহু আনহা পেট ভরে খানা খাওয়াকে বিদআত সাব্যস্ত করেছেন। তিন বেলা পেট ভরে খেয়ে শক্তি অর্জন করে আপনি যতই ইবাদত করেন না কেন, যতই জিহাদ করেন না কেন, আপনি বিদআতী। অন্যদিকে খেয়াল করুন, দূরের সফরের জন্য সময়, অর্থ ও শ্রম বাঁচানোর লক্ষ্যে বিমানে চড়া এই মূলনীতির খেলাফ নয়। তাই এটি বিদআত নয়।

২. "ধনসম্পদ মুমিনের জন্য বিষতুল্য। তবে আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য সহায়ক যতটুকু ধন-সম্পদ প্রয়োজন, একজন মুমিন ততটুকুই ধনসম্পদ অর্জন করবে।"

এই মূলনীতির ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে।

৩. "আল্লাহর রাসূল যে ইবাদাত যেভাবে করেছেন, তা সেভাবেই করতে হবে। নবীজী যা করেন নাই, তাকে ইবাদত বা সওয়াবের কাজ মনে করে করাটা বিদআত।"

নিজে থেকে কোনো ইবাদতের পন্থা তৈরী করা বিদআত। যেমন মিলাদ পড়া, তাজিয়া মিছিল করা, মাতম করা ইত্যাদি।

এই মূলনীতিটিই আমাদের সমাজে প্রচলিত, তাই আমরা সকলেই বুঝি। এ নিয়ে আমরা এর চেয়ে বেশি আর আলোচনা করবো না।

৪. "যিন্দেগীর সার্বিক উদ্দেশ্য- আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে জমীনে প্রতিষ্ঠা করার মেহনত করা। এর জন্য যার যতটুকু জান মাল আছে, সব কুরবান হয়ে যাক এবং এর বিনিময়ে আল্লাহপাক রাজি হয়ে যাক।"

আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণ কিভাবে যিন্দেগীর এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করেছেন। তারা কিভাবে দাওয়াত দিয়েছেন, জিহাদের ময়দানে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন, নিজের ঘর-সংসার, আরাম-আয়েশকে দ্বীনের জন্য কুরবানী করেছেন! যদি এই মূলনীতিকে আপনি নিজের যিন্দেগীর মূলনীতি হিসেবে ধরেন, তাহলে আপনি সারাজীবন আপনার পেশা ও ব্যবসা নিয়ে পড়ে থাকতে পারবেন না। ষোল ঘণ্টা দোকানে/অফিসে কাটাবেন না, ক্যারিয়ার ও ডিগ্রির ধান্দা করতে পারবেন না। মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে পেতে হলে, আপনাকে দ্বীনের ইলম হাছিল করতেই হবে, আত্মশুদ্ধি করতেই হবে, দাওয়াতের ময়দানে ছুটতেই হবে, জিহাদ করতেই হবে। আপনি তীর তলোয়ারের যুদ্ধই করুন আর কামান-ট্যাঙ্কের যুদ্ধই করুন, যুদ্ধ করাটাই মূলনীতি। যুদ্ধের প্রয়োজনে যা করা দরকার তা করতে হবে। কৌশল হিসেবে বা শক্তি বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ বিমান বা সাবমেরিন ব্যবহার করাটা বিদআত নয়।

আশাকরি, বিষয়টি আমি বুঝাতে সক্ষম হয়েছি।

আম্মাজান আইশা রদিয়াল্লহু আনহার ইজতিহাদ এবং উল্লেখিত এসব মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তাই বলা যায়–

- আজকে মুসলমান দুনিয়াতে কিছু বনার জন্য, ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন নিয়ে, সম্পদ হাছিল করার জন্য জিন্দেগী কাটাচ্ছে, এটা বিদআত।
- সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম দুনিয়া ভোগ করতেন না, আজ মুসলমান ভোগের মধ্যে মত্ত, এটা বিদআত।
- আগে মুসলমান পেট ভরে খেত না, এক বেলা খেলেই চলতো, বর্তমানে চলে না; এক বা সর্বোচ্চ দুই সেট পোশাক হলেই উম্মতের যিন্দেগী পার হতো, এখন হয়না; আগে মুসলমান পাকা বাড়ি বানাতো না, বর্তমানে বাড়ি-গাড়ি করাকেই দুনিয়ার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা মনে করে, এগুলো বিদআত।
- সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম মজদুরি বা ব্যবসা অল্প সময়ে সেরে নিতেন, যোহরের নামাযের পর আর ব্যবসা করতেন না। আর এখন মুসলমান সারাদিন বা কেউ কেউ রাতেরও একটি বড় অংশ সময় নিয়ে চাকুরি, ব্যবসা বা অন্যান্য কাজ করে, এটা বিদআত।
- সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম ততটুকুই মাল কামাই করার নিয়ত করতেন যতটুকু তার পরিবারের খাওয়া পরার জন্য দরকার। এখন মুসলমান জানেনা তার কতটুকু কামাই করতে হবে। যতই কামাই করে, সে আরো বেশি কামাই করতে চায়, এটা বিদআত।
- সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম অতিরিক্ত মাল জমা করে রাখাকে গোনাহ মনে করতেন, অথচ এখন মুসলমান মাল জমা করাকেই জীবনের সফলতা মনে করে, এটা বিদআত।

বিদআত শুধু মিলাদ পড়া, মিলাদে কিয়াম করা বা কুলখানি করার নাম নয়। বিদআত কোন্ জিনিস সেটি সাহাবায়ে কেরামের চোখ দিয়ে দেখতে হবে, আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখলে হবে না। নতুবা আমরা প্রকৃত হিদায়াত হতে বঞ্চিত হয়ে যাব। বিদআতে লিপ্ত হয়ে গুমরাহীতে পতিত হবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেন নাঃ

এক ভাই বললেন, বর্তমান যামানায় উম্মত অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। তাই যেমন ভাবে সাহাবায়ে কেরাম যিন্দেগী পরিচালনা করেছেন, তেমনভাবে বর্তমানে উম্মত এত কষ্ট বরদাশত করতে পারবে না।

একজন আলেমের মুখে শুনলাম, বর্তমান যামানায় সাহাবাদের অনুসরণ করা যাবে না। আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে নিকটবর্তী আকাবীরদের।

আহ্! এসব কথার দলীল কোথায়? এগুলো উম্মতকে কে শিখিয়েছে? যদি বর্তমান জামানার উম্মত তা না-ই পারে, তাহলে তারা সুন্নতের অনুসারী হবে কিভাবে? তিনি যে হুকুম দিলেন, "আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে পরহেয করে চল" কিংবা তিনি যে বললেন,"হে মুমিনগণ তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর"- এগুলো কি এমনি এমনি হুকুম করেছেন? আল্লাহ তাআলা যে সাহাবীদের মতো ঈমান আনতে বললেন, তা কি এমনি এমনিই হাছিল হয়ে যাবে? নাকি তিনি এমন এক হুকুম দিলেন, যা শেষ যামানার উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়? আল্লাহ তাআলা কি

জানতেন না, শেষ যামানার উম্মত দুর্বল হয়ে পড়বে, তারা তাদের রাসূলকে অনুসরণ করতে অপারগ ও অক্ষম হয়ে যাবে? আপনার কথা অনুযায়ী বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা এমন এক দ্বীন শেষ যামানার উম্মতের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, যার পরিপূর্ণ অনুসরণ করা কক্ষণো সম্ভব নয়। অথচ আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ

"আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার চাপিয়ে দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।" (২ সূরা বাকারা: ২৮৬)

আল্লাহ তাআলা যদি সত্য বলে থাকেন (অবশ্যই তিনি সত্য বলেছেন), তাহলে আপনাদের এসব কথার দ্বারা কি আল্লাহ তাআলার উপর অপবাদ আরোপ করা হলো না? আসলে এসব বাক্য 'দুনিয়াপ্রীতির' বহিঃপ্রকাশ মাত্র!

যারা বলেন, "বর্তমান যামানায় সাহাবাদের অনুসরণ করা যাবে না। আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে নিকটবর্তী আকাবীরদের।"
দয়া করে আপনাদের এসব ফালতু আলাপ বন্ধ করুন। শুধু শুধু 'আকাবীর', 'আকাবীর' করবেন না। আপনাদের মুখে 'আকাবীর' শব্দটা কিংবা আপনার পীরের নামটা একশতবার শুনা গেলে, একবার শুনা যায় 'সাহাবা' শব্দটা। হ্যাঁ, আপনি আকাবীরদের অনুসরণ করতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে-

- কোনো আকাবীর, তার কথা কিংবা তার যিন্দেগী কি শরীয়তের দলীল হতে পারে?

- কোনো আকাবীরের ঈমান কি কুরআনের ভাষায় স্বীকৃত আদর্শ মানের, যাকে আমরা অনুসরণ করব?
- এমন কোনো আকাবীর এমন আছেন কি, যিনি তার ২৩ বছরের যিন্দেগীতে অর্ধ পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম করেছেন? যদি তা না থাকে তাহলে শেষ যামানায় উম্মতের জন্য কখনোই তা আদর্শ হবে না, কেননা, শেষ জামানায় ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সময় মাত্র সাত বছরে পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল জয় হবে, যা সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও যিন্দেগীর আদর্শ অনুসরণ ব্যতীত সম্ভব নয়।

দুঃখজনক কিন্তু বাস্তব কিছু আত্মসমালোচনা:

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ প্রাপ্ত হচ্ছেন উম্মতের আলেম সমাজ। কেননা তাঁরা ইলমে ওহীর বাহক। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সম্মানিত করেছেন দুনিয়া ও আখিরাতে কুরআনের হামেল তথা বাহক হওয়ার কারণে। একবার নবীজী ﷺ সাহাবাদের সামনে বললেন, "পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ তাআলার খাস পরিবারভূক্ত লোক।" সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, তারা কারা? তখন নবীজী ইরশাদ করেন, "তারা হচ্ছেন কুরআন ওয়ালারা।" (সুব্হানাল্লাহ)

আল্লাহ তাআলা এতো মর্যাদা দিয়েছেন উলামায়ে কেরামকে, নিজের খাস পরিবারভূক্ত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন! একটা কথা মনে রাখতে হবে, নৈকট্যশীল ব্যক্তিদের সামান্য ভুল-ত্রুটিও অনেক গুণ বর্ধিত হয়ে মহা ভুলের আকৃতি ধারণ করে। নৈকট্যশীলদের সাধারণ একটি সগীরা গুনাহ্ও আল্লাহ তাআলার নিকট কবীরা গুনাহ্র বরাবর। বিশেষতঃ উলামায়ে

কেরামের অবস্থান আল্লাহ তাআলার কাছে নবী-রাসূলগণের ঠিক পরে হওয়ায়, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আশা করেন, তাদের যিন্দেগীও নবী-রাসূলগণের মতোই হবে। নবী-রাসূলগণ যদিও ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন আর উলামায়ে কেরাম ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নন, তবুও এটি আল্লাহ তাআলার চাওয়া যেন উলামায়ে কেরাম যথাসাধ্য ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে থাকুন। কেননা নবীদের অবর্তমানে উম্মত উলামায়ে কেরামের যিন্দেগী দেখেই নবীদের চিনবে। নবীদের আমল-আখলাক চিনবে। এছাড়া সাধারণ মানুষের দ্বীন শিখার আর কোনো রাস্তা নেই। উলামায়ে কেরামের যিন্দেগী যেমন হবে, সাধারণ দ্বীনদারদের যিন্দেগীও তেমনই হবে। উলামায়ে কেরাম যতদিন আল্লাহ তাআলার গোলামী করবে, সাধারণ মানুষও আল্লাহ তাআলার গোলামী করবে, উলামায়ে কেরাম যদি দুনিয়ার গোলামী করা শুরু করেন, তাহলে সাধারণ মানুষও তাই করা শুরু করবে। তাই উলামায়ে কেরামের ছোট-খাট ভুল গুলোও কেয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত হতেই থাকবে, যতদিন মানুষ বংশ পরম্পরায় সেই ভুলগুলোর অনুসরণ করতে থাকবে। এ কারণে নিম্নে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। যদিও বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তথাপি উম্মতের স্বার্থে আমাকে সত্য প্রকাশ করতেই হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَ نْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهٗ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

“নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। আর নবীগণ ওয়ারিশদের জন্য দীনার বা দিরহাম রেখে যান না, বরং তারা এলেম রেখে যান। সুতরাং যে তা গ্রহণ করলো সে বড় সৌভাগ্য গ্রহণ করলো।”

যারাই মাদরাসা থেকে পাশ করে ডিগ্রি অর্জন করেছে, এই হাদীসটির উপর ভিত্তি করে নিজেদেরকে "আলেম" মনে করেন এবং দাবী করেন যে, "আমি আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশ"। খুব ভালো কথা! আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে 'আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশ' হিসেবে কবুল করেন বা 'নায়েবে নবী' হিসেবে কবুল করেন, তাহলে তো আমাদের সৌভাগ্যের সীমাই নেই। কিন্তু ব্যাপারটা মনে হয় এতটা সহজ নয়!

হায়! আমরা যদি এই হাদীসটির মর্ম এই যামানায় উপলব্ধি করতে পারতাম! কেননা বর্তমানে এলেম বলতে বুঝায় শুধুমাত্র নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত বা বিয়ে ও তালাকের মাসআলা শিক্ষা করা, কুরআনকে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে শিখা, বুখারী, আবু দাউদ বা মেশকাতের মত মশহুর কিছু হাদীসের কিতাব যের, যবর ও পেশ ছাড়া দেখে দেখে পড়তে শেখা।

আলেমরা যদি কেবল মাসআলার ওয়ারিশ হয়ে থাকে, তাহলে নবীজী ﷺ-এর আখলাকের ওয়ারিশ কারা? নবীজী ﷺ-এর জিন্দেগীর ওয়ারিশ কারা? নবীজী ﷺ কি কেবল নামায-রোযা নিয়ে এসেছিলেন? শুধুই কি কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন? সাহাবীদের মাঝে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা করে টাকা ও আন্তর্জাতিক পদক অর্জন করা শিক্ষা দিয়েছিলেন? মদিনার মসজিদে হালকার জিকির করা শিক্ষা দিয়েছিলেন? কুরআন কি কেবল এতটুকুই আমাদের শিক্ষা দেয়?

হযরত সা'দ বিন হিশাম রদিয়াল্লহু আনহু আম্মাজান হযরত আইশা রদিয়াল্লহু আনহাকে প্রশ্ন করলেন, হে মুমিনদের আম্মা! আমাকে নবীজী ﷺ-এর আখলাক সম্পর্কে বলুন। আম্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি

কুরআন পড়ো না? সা'দ বিন হিশাম রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, হ্যাঁ। তখন আম্মা বললেন, কুরআনই হলো নবীজী ﷺ-এর আখলাক।

যেহেতু কুরআন নবীজী ﷺ-এর আখলাক, আর কুরআনই হলো সকল এলেমের উৎস, তাই নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীই হলো সকল এলেমের মূল কেন্দ্রবিন্দু। আর নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীর যে ওয়ারিশ হবে বা সেই পবিত্র যিন্দেগীকে যে নিজের যিন্দেগী বানাবে কেবলমাত্র তারাই হলো নবীজীর ওয়ারিশ, কেবলমাত্র তারাই আলেম। আলেমদের যিন্দেগী এমন হবে, তাদের উঠাবসা এমন হবে যে, মানুষ তাদেরকে দেখে দেখে আমার নবীজীর যিন্দেগী চিনবে। মানুষ আলেমদের আখলাক দেখে আমার নবীর আখলাক শিখবে, তাদের আমানতদারিতা দেখে আমার নবীর আমানতদারিতা শিখবে, তাদের ইবাদত দেখে আমার নবীর ইবাদত শিখবে, তাদের পরহেযগারী দেখে আমার নবীর পরহেজগারী শিখবে, সত্যকে সত্য বলে প্রকাশ করার সাহস দেখে আমার নবীর সাহস শিখবে। উম্মতের প্রতি তাদের দরদ দেখে সাধারণ মানুষ উম্মতের দরদ শিখবে। উম্মতকে সঠিক ইসলাম শিখাবে। নবীওয়ালা যিন্দেগী গড়ে দিবে। আল্লাহকে চিনাবে। আল্লাহর শক্তিকে চিনাবে। গাইরুল্লাহর ভয় দীল থেকে বের করে দিবে। জান্নাত-জাহান্নাম চিনাবে। আখিরাত চিনাবে। মৃত্যুর ভয়, দুনিয়ার মহব্বত দীল থেকে বের করে দিবে। ইলম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও জিহাদের গুরুত্ব বুঝাবে। এগুলো তো ছিল নবী-রাসূলদের কাজ। যদি এরকম না হয়, তবে সেই ব্যক্তি যত বড় মাদরাসা থেকেই সার্টিফিকেট অর্জন করুক না কেনো সে আসলে আলেম নয়, মূর্খ, উলামায়ে ছু (মন্দ আলেম)।

কিছুদিন আগে একজন ছাত্র ফেইসবুকে এক ওয়াজ-মাহফিলের পোস্টারের ছবি আপলোড করে, যাতে লেখা ছিলো "হুজুর আসিবেন হেলিকপ্টারে উড়িয়া"। তারপর সেই মাহফিল সম্পর্কে নিচে যে কমেন্ট ছিল তা নিম্নরূপ:

"হুজুর হেলিকপ্টারে উড়িয়া আমাদের মাহফিলে আসিলেন। মঞ্চে বসে মধুর কণ্ঠে বয়ান করিলেন, নবীজী ﷺ কোনো দিন পেট ভরিয়া খানা খান নাই, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যবের রুটিও পরপর দুই বেলা খেতে পান নাই, তাঁর ঘরে একটানা তিন মাস পর্যন্ত রান্না করার মত কিছুই থাকিত না। এই সমস্ত বয়ান করিয়া হুজুর নিজেও খুব কাঁদিলেন, শ্রোতাদেরকেও খুব কাঁদাইলেন। বয়ান শেষ করিয়া হুজুর ভুনাখাসী, মুরগীর রোস্ট, গরুর গোশত ও রুই মাছ দ্বারা কয়েক প্লেট পোলাও খাইলেন। তারপর এক লক্ষ টাকা পকেটে লইয়া হেলিকপ্টারে চড়িয়া উড়িয়া গেলেন।"

আজ সাধারণ ছেলে-পেলেরা আলেমদের সম্পর্কে এ রকম বেয়াদবী করার সাহস পায় কিভাবে? এজন্য কারা দায়ী? আজ আলেমদের উপর সাধারণ মানুষদের আস্থা নাই এই সকল দুনিয়াদার আলেমদের কারণে। যারা দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া হাছিল করে চলেছে তারা কি করে আলেম হয়?

আজ মুসলমানদের উপর আযাব কেন আসবে না? একবার হযরত হুযাইফা রদিয়াল্লহু আনহু লোকদের মাঝে বয়ান করলেন, তখন তোমাদের কী হবে যখন আল্লাহ পাক নবীজী ﷺ-এর উম্মতের উপর আযাব নাযিল করবেন? একজন আরজ করলো, 'আমরা গুনাহ করা সত্ত্বেও যেই আল্লাহ তাআলা আমাদের দান করা বন্ধ করেন না, সেই আল্লাহ তাআলা কি করে নবীজী ﷺ-এর উম্মতের উপর আযাব নাযিল করবেন?' "তোমরা কি

দেখতে পাচ্ছ! যখন লোকেরা ঐ জিনিসের রক্ষক হবে যা আল্লাহ পাকের নিকট মশার পাখা হতেও নগণ্য (অর্থাৎ এই দুনিয়া ও তার মাল-সম্পদ), সেই দিন আল্লাহ পাক নবীজী ﷺ-এর উম্মতের উপর আযাব নাযিল করবেন।”, হযরত হুযাইফা রদিয়াল্লহু আনহু বললেন।

যারা নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীর বয়ান করে টাকা কামাই করে চলেছে, এরা কি হাশরের ময়দানে নবীদের ওয়ারিশ হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবে? হযরত ওমর ফারুক রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, এই উম্মতের উপর মুনাফেক আলেমদের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হয়। একজন জিজ্ঞাসা করলো, মুনাফেক আলেম কারা? তিনি বললেন, মুখে আলেম। কিন্তু দীল ও আমলের হিসেবে জাহেল। হযরত ওমর রদিয়াল্লহু আনহু আরো বলেন, যে আলেমকে দুনিয়ার সাথে মহব্বত করতে দেখো, ধরে নিবে যে, তার দ্বীন ত্রুটিযুক্ত। কেননা যে যেই জিনিসের প্রতি মহব্বত রাখে তার মধ্যেই সে প্রবেশ করে।

হিন্দুস্তানের একজন স্বনামধন্য আলেম, টিভিতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাকে প্রায়ই দেখা যায়, তাকে কখনো এক জামা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে মনে হয় কেউ দেখেনি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কি ভাই, আপনার পাঞ্জাবী কতগুলো? তিনি একটু আনন্দ বা গর্ব করেই বললেন, হিসাব নাই। কমের পক্ষে ৪০-৫০ টা তো হবেই। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কি নবীজীর সুন্নতের মাঝে পড়ে? তিনি বললেন, **এখন কি আগের জামানা আছে?** এখন ঐ যামানা যে, আলেমরা প্রাডো গাড়িতে করে ঘুরবে, হাতে থাকবে আইফোন। তারপর উনার হাতের ঘড়িটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এরকম ঘড়ি থাকবে যার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। উনার কথা শুনে খুব কষ্ট হলো এবং এখনও মনে হলে আফসোস হয়।

রসায়ন বিষয়ের আমার এক বামপন্থী শিক্ষক ছিলেন। একদিন ক্লাসে তিনি বললেন, "ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই যামানার জন্য (প্রযোজ্য) নয়। বর্তমান সময়ের জন্য চাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।" এই লোককে যদি আপনি কাফের বা নাস্তিক বলেন, তাহলে ঐ আলেম (?)-কে আপনি কি বলবেন, যে বলে যে, "আল্লাহর রাসূলের জিন্দেগী (ইসলামী জীবনব্যবস্থা) এই যামানার জন্য নয়।" ? দুই জনের মধ্যে পার্থক্য কী? বরং সেই তথাকথিত আলেম আরো ভয়ংকর কথা বলেছে। কেননা, ঐ শিক্ষক শুধু ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অপ্রযোজ্য মনে করে, অন্য কোনো দিককে সে অপ্রযোজ্য মনে করে না। কিন্তু ঐ আলেম (?) "এখন কি আগের জামানা আছে?"-একথা দ্বারা পুরো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকেই ব্যাক-ডেটেড্ মনে করেছে। বর্তমান যামানার জন্য অনুপযুক্ত মনে করেছে। তাহলে এর ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী হবে?

নবীজী ﷺ একবার ইরশাদ করেন, "আমার পরে মুসলমানদের মধ্যে এমন একদল লোক উৎপন্ন হবে, তারা নানারকম উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করবে, নানা বিচিত্র কারুকার্যপূর্ণ বহু মূল্যবান পোশাক পরিধান করবে, মনোমোহিনী সুন্দরী কামিনী রাখবে, মূল্যবান অশ্ব (বাহন উদ্দেশ্য, যেমন: বর্তমান যামানায় গাড়ি) বাড়ির সামনে রাখবে, অল্প খানায় তাদের ভোজন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হবে না, অনেক পেলেও তাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না, তাদের সমস্ত শক্তি কেবল দুনিয়া অর্জনেই ব্যয়িত হবে। দুনিয়াকেই তারা প্রভু বলে মনে করবে। যা কিছু করবে দুনিয়া হাছিলের জন্যই করবে। আমি মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের প্রতি নির্দেশ দিচ্ছি: তোমাদের সন্তানরা তাদেরকে যেন সালাম না করে, তারা অসুস্থ হলে যেন তাদের সেবা না

করে। তাদের জানাযায় যেন না যায়, তাদের মুরুব্বীদের যেন সম্মান না করে। এই শ্রেণির ধনী লোকেরা ইসলামকে ধ্বংস করবে। তোমাদের সন্তানগণ যদি তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তবে তারাও ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হিসেবে গণ্য হবে।" (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহুকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, হে আবু আব্দুল্লাহ! **মানুষের ধ্বংস হবার আলামত কী?** তিনি বললেন, **তাদের আলেম সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া।**

কেননা সাধারণ দ্বীনদার ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের পীর-মাশায়েখ, মসজিদের ইমাম, স্বীয় ইসলামী দলের/জামাতের মুরুব্বী আলেমদের অনুসরণ করে থাকে। তাদেরকে সাধারণ দ্বীনদাররা/মুরীদরা/ অধীনস্ত কর্মীরা তাদের যিন্দেগীর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে তার মুরুব্বী যে নকশার টুপি পরিধান করে, সেও সে ধরণের টুপি পরিধান করে, তার মুরুব্বী যে স্টাইলের পাঞ্জাবী পরিধান করে, সেও সে ধরণের পাঞ্জাবী পরিধান করে। এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সাধারণ মুসলমানগুলো তাদের অনুসরণ করে। তার মুরুব্বীর রুচি-মেজাজ-প্রকৃতিকে সে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তার মুরুব্বীর মাঝে 'জালালিয়ত' থাকলে তার মেজাজও 'জালালী' তরবিয়তের হয়ে যায়, তার মুরুব্বীর তরবিয়ত 'জামালী' হলে, তার তরবীয়তও সাধারণ 'জামালী' হয়ে যায়। তার মুরুব্বী যদি আয়েশী হয়, সেও এটাকে দ্বীন মনে করে আয়েশী ও ভোগের যিন্দেগী গঠন করে। তার মুরুব্বী যদি আরামপ্রিয় হয়, বাদশাহী ও বাবুগিরির যিন্দেগী যাপন করে, সেও তা করতে শুরু হয়। তার মুরুব্বী

যদি দুই তলা বিল্ডিং বানায়, সে বানাবে চার তলা বিল্ডিং। দলীল কী!! আমার মুরুব্বী যদি এগুলো করতে পারেন, তাহলে আমি কেন পারবো না? আমার মুরুব্বী যদি ভোগের যিন্দেগী লালন করেও 'আল্লাহ ওয়ালা' হতে পারেন, তাহলে আমি কেন এভাবে আল্লাহওয়ালা হতে পারবো না?

এসকল কারণে একজন আলেমের ছোট্ট একটি আমলের ওজন অনেক বেড়ে যায়। তিনি যদি ছোট্ট কোনো নেক আমল করেন, তার ওজন একজন সাধারণ মানুষের অনেক বড় একটি আমলের চেয়ে ওজন দার হয়, কেননা তাঁকে অনুসরণ করবে আরো বহু সাধারণ দীনদার লোক আর তাঁকে যারা অনুসরণ করবে, তাদের সকলের সাওয়াব তিনি পাবেন। ঠিক একই রকম ভাবে যদি কোনো আলেম ব্যক্তি কোনো একটি গোমরাহীতে লিপ্ত হয়, তার ওজনও সাধারণ একজন দীনদার লোকের ছোট্ট গোমরাহীর চেয়েও বেশি হবে, কেননা, ঐ সাধারণ ব্যক্তিকে অন্যরা জাহেলই জানে, তাকে কেউ অনুসরণ করবে না, কিন্তু ঐ আলেম ব্যক্তিকে অনেকেই অনুসরণ করবে, তাঁকে দলীল হিসেবে পেশ করবে, এভাবে একটি জাতি গোমরাহ হয়ে যেতে পারে। তাই আলেমের গোমরাহী অনেক ভয়াবহ ও মারাত্মক। বর্তমান যামানায় মুসলমান আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগী কিংবা সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগী ভুলে গিয়েছে, কাদের কারণে? সাধারণ দুনিয়াদারদের কারণে? না, তা নয়, বরং মানুষ উলামায়ে কেরামকে যেভাবে দেখে, জাহেল সাধারণ দ্বীনদাররা তাকেই দ্বীন মনে করে অনুসরণ করে। ফলে এভাবে সুন্নতী যিন্দেগীর আদর্শগুলো আস্তে আস্তে মুসলিম সমাজে অপরিচিত হয়ে গিয়েছে। এর দায়ভার কখনোই সাধারণ মানুষের নয়, আলেম সমাজকেই বহন করতে হবে। একারণেই হাদীস শরীফে শেষ

যামানার এসকল দুনিয়াদার, ফেতনায় জর্জরিত আলেমদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, হযরত আলী রদিয়াল্লহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "মানুষের উপর এমন একটি জামানা আসবে, যখন কেবল নামটুকু ব্যতীত ইসলামের কিছুই বাকি থাকবে না। অংকিত অক্ষর ব্যতীত কুরআনের কিছুই বাকী থাকবে না। (সেই জামানার আলামত হলো), তখন মসজিদসমূহ সুসজ্জিত থাকবে। সেই সময়কার আলেমরা হলো আসমানের নীচে নিকৃষ্টতম মানুষ। এরাই সকল ফেতনা সৃষ্টি করবে, আর সেই ফিতনাতে নিজেরাই লিপ্ত হয়ে পড়বে।" (তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১২, পৃ. ২৮০)

মক্কার মসজিদের দিকে তাকিয়ে দেখো, এটাই সেই জামানা। মদিনার মসজিদের দিকে তাকিয়ে দেখো, এটাই সেই জামানা। দুনিয়ার হাজার হাজার মসজিদের দিকে তাকিয়ে দেখো, মসজিদগুলো আমাদেরকে সাক্ষী দিচ্ছে, এটাই সেই জামানা।

আমরা প্রত্যেক আলেমই ভাবি, এটি তো "উলামায়ে ছু" (মন্দ আলেম)-দের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা এটি চিন্তা করি না, হায়! আমিও কি উলামায়ে ছু-দের অন্তর্ভূক্ত হয়ে বসে আছি কিনা। যদি আমার মানসিকতা ও যিন্দেগী আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগী বা সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীর সাথে মিলে, তাহলেই কেবল আমি "উলামায়ে হক্ক", নতুবা আমিই উলামায়ে ছু। কেবল মাইকে উত্তপ্ত বয়ান করতে পারা, চারপাশে বহু মুরিদান থাকা, কিংবা দু-চার কলম লিখতে পারার নামই উলামায়ে হক্ক হওয়া নয়।

হাদীসে বর্ণিত জামানা বর্তমান জামানাই, যেই জামানার আলেমদের সম্পর্কে কঠিন ধমকি এসেছে, কেবল আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর সুন্নতগুলোকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য। কেননা আগেই বলেছি, উম্মতের মাঝে

সুন্নতকে জিন্দা রাখা, কিংবা কোনো সুন্নতকে দাফন করে দেয়া উভয়টিই নির্ভর করে উলামায়ে কেরামের আমল করা, না করার মাঝে। উলামায়ে কেরাম যখন নিজের এবং অন্যান্য মানুষের যিন্দেগীর উপর মেহনত ছেড়ে মসজিদ মাদরাসার বিল্ডিং-এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে মনোনিবেশ করবে, তখন তারা ইসলামকে ধ্বংস করবে, মুসলমানদের আত্মিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিবে, দীনের নামে সুন্নতের খেলাফ কার্যক্রমকে মানুষের সামনে দ্বীন হিসেবে উপস্থাপন করবে অর্থাৎ নতুন নতুন ফেতনার জন্ম দিবে, নিজেরাও সেই ফেতনায় জর্জরিত থাকবে। তখন তারা আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে, যদিও সে নিজেকে আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশ দাবী করে। কেননা তারা আল্লাহ তাআলার সেই প্রিয় দ্বীনকে মানুষের ময়দানে অপরিচিত করে দিয়েছে, যে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে রক্তাক্ত হতে হয়েছে, তাঁর দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছে, হাজার হাজার সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

এই ব্যাপারে আরো একটি ঘটনা বলি, যা হযরত শায়েখ হাতেম রাহিমাহুল্লাহর এক হজ্জ সফরে ঘটেছিল। পথিমধ্যে এক এলাকায় তিনি খবর পান যে, এই এলাকায় সবচেয়ে বড় আলেম কাজি শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল অসুস্থ। খবর পেয়ে তিনি তাকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কারণ, তাতে দুটি সওয়াব রয়েছে। এক. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া। দুই. একজন আলেমের জিয়ারত লাভ করা। তাই তিনি স্থানীয় এক ব্যবসায়ীকে সাথে নিয়ে তাকে দেখতে গেলেন। কাজি

সাহেবের বাড়ি বিশাল এক মহল। ব্যাপারটা তার ভালো লাগলো না। একজন আলেম কিনা মহলে বাস করেন।

যাহোক, তিনি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো। ভিতরের অবস্থা দেখেও হাতেম সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেলো। সেখানেও এক আলীশান অবস্থা এবং কাজি সাহেব গোলামদের ভীড়ের মাঝে শুয়ে আছেন। হাতেম সাহেবকে দেখে কাজি সাহেব ইশারায় বসতে বললেন, কিন্তু শায়েখ হাতেম বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে চাই। কাজি সাহেব বললেন, জিজ্ঞাসা করুন। শায়েখ হাতেম তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এলেম কার কাছে শিখেছেন? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য আলেমদের কাছে। শায়েখ হাতেম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেই আলেমগণ কার নিকট হতে এলেম শিখেছেন? তিনি বললেন, সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমগণের নিকট হতে।

শায়েখ হাতেম এবার জিজ্ঞাসা করলেন, সাহাবায়ে কেরাম কার কাছ থেকে এলেম শিখেছে? তিনি উত্তর দিলেন, নবীজী ﷺ-এর কাছ থেকে। তখন শায়েখ হাতেম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, নবীজী ﷺ কার কাছ থেকে এলেম শিক্ষা করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম থেকে। শায়েখ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম কার কাছ থেকে এলেম শিখেছেন? কাজি সাহেব বললেন, আল্লাহ পাকের নিকট হতে। অবশেষে শায়েখ হাতেম বললেন, যেই এলেম জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ পাকের নিকট হতে এনে নবীজী ﷺ -এর কাছে পৌঁছিয়েছেন, নবীজী ﷺ তা সাহাবায়ে কেরামের কাছে পৌঁছিয়েছেন, আর সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম তা নির্ভরযোগ্য

আলেমদেরকে দান করলেন, আর সেই আলেমদের নিকট হতে আপনি তা শিক্ষা করলেন। সেই এলেমের কোথাও কি এই কথা বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তির বাড়ি যত উঁচু ও বড় হবে তার মর্যাদা আল্লাহ পাকের নিকট সে রকম উঁচু হবে? কাজি সাহেব বললেন, না, এই কথা সেই এলেমের মধ্যে নেই। শায়েখ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে সেই এলেমের মধ্যে কী বর্ণিত হয়েছে? কাজি সাহেব বললেন, সেই এলেমের মধ্যে এই কথা বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, আখিরাতের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহ রাখে, গরীবদেরকে মহব্বত করে, নিজের আখিরাতের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে নেকি পাঠাতে থাকে, সেই আল্লাহ পাকের নিকট মর্যাদার অধিকারী। তখন শায়েখ হাতেম রাহিমাহুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনি কার অনুসরণ করছেন?

নবীজী ﷺ-কে? সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমদেরকে? মুত্তাকী উলামায়ে কেরামকে? না কি ফিরাউন ও নমরুদদেরকে? ওহে মন্দ আলেমের দল! আপনাদের মতো লোকদেরকে দেখে জাহেল দুনিয়াদাররা যারা দুনিয়ার নেশায় মত্ত, তারা এই কথা বলে যে, যখন আলেমদের এই অবস্থা তখন আমরা তো তাদের চেয়ে বেশি খারাপ হবোই। এই কথাগুলো বলে শায়েখ হাতেম রাহিমাহুল্লাহ সেখান থেকে চলে গেলেন।

যারা ধনাঢ্য সাহাবীদের দলীল পেশ করে দুনিয়াদারীকে জায়েয করে থাকেন:

হিন্দুস্তানের একজন বড় হক্কানী পীর সাহেব আছেন। আল্লাহ পাক উনাকে অনেক সম্পদ দিয়েছেন এবং তিনি বিলাশবহুল জীবন যাপন করেন। খুব পাতলা কাপড়ের পাঞ্জাবী পরিধান করেন এবং সেটা দ্বিতীয়বার না ধুয়ে ব্যবহার করেন না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, দ্বীনদার লোকেরা কেনো নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীকে নিজের যিন্দেগীর মধ্যে আনে না? এ বিষয়ে তাকে কয়েকজন সাহাবী উদাহরণ পেশ করা হয়, যার মধ্যে হযরত আবু যর গিফারী রদিয়াল্লহু আনহুর কথাও বলা হয়েছিল। তখন তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রদিয়াল্লহু আনহু ও ওসমান রদিয়াল্লহু আনহুর উদাহরণ টেনে বিলাশবহুল জীবন যাপনের পক্ষে বেশ কিছু কথা বললেন। মাওলানা যাকারিয়া সাহেব কান্ধলবি রাহিমাহুল্লাহ ফাযায়েলে সাদাকাত কিতাবে বিখ্যাত আরিফ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ মুসাহেবি রাহিমাহুল্লাহ দুনিয়াদার আলেমদের সম্পর্কে যা বলেছেন তা উল্লেখ করেছেন। সেই কথাগুলোই আমি এখানে উল্লেখ করছি:

দুনিয়াদার আলেমরা মনে করে যে, সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমদের নিকটও তো অনেক মাল ছিলো। এই বেওকুফরা সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমদের আলোচনা এই জন্য করে, যেনো মাল জমা করাকে সঠিক সাব্যস্ত করা যায়। তারা শয়তানের প্রতারণাকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। ওহে আহমকের দল! তোদের জন্য আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রদিয়াল্লহু আনহুর সম্পদ দ্বারা দলিল পেশ করা শয়তানের একটি ধোঁকা। শয়তান তোদের মুখে এই সব কথা এই জন্য বের করে যেনো তোরা ধ্বংস

হয়ে যাস। যখন তোরা এই কথা বললি যে, সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুমও সম্মান ও জাকজমকের জন্য মাল জমা করেছেন, তখন তোরা এই পবিত্র ব্যক্তিদেরকে অপবাদ দিলি এবং তাঁদের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর কথা বললি। যখন তোরা এই ফতোয়া দিলি যে, হালাল পন্থায় সম্পদ জমা করা সম্পদ পরিত্যাগ করা থেকে উত্তম, তখন তোরা নবীজী ﷺ-এর শানে বেয়াদবী করলি, সমগ্র নবীদের সাথে বেয়াদবী করলি, তাঁদেরকে অজ্ঞ মনে করলি।

আল্লাহ হেফাযত করুন। কেননা, তাঁরা তোদের মতো সম্পদ জমা করেননি এবং একে পছন্দও করেন নি। আর হালাল পন্থায় সম্পদ জমা করা তা পরিত্যাগ করা থেকে উত্তম, তোদের এই ফতোয়া দ্বারা তোরা এই দাবী করে বসলি যে, নবীজী ﷺ উম্মতের কল্যাণ কামনা করেননি। কারণ তিনি তো মাল জমা করতে নিষেধ করেছেন। আসমান-যমিনের রবের কসম! তোরা তোদের এই দাবীর দ্বারা নবীজী ﷺ-কে মিথ্যাবাদী প্রতীয়মান করলি। নবীজী ﷺ-এর কদমে আমার ও আমার খান্দানের জান কুরবান যাক, তিনি তো তাঁর উম্মতের প্রতি বড় রহম দীল ছিলেন, সর্বদাই কেবল উম্মতের ভালাই চাইতেন। তিনি উম্মতের জন্য অত্যন্ত দয়ালু ও অত্যন্ত মেহেরবান।

আরে আহমকের দল! আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রদিয়াল্লহু আনহু তাঁর জ্ঞান ও গুণের পরিপূর্ণতা, তাঁর তাকওয়া ও পরহেযগারী, তাঁর দানশীলতা ও দয়া, আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সম্পদ খরচ করা, সবচেয়ে বড় ব্যাপার নবীজী ﷺ-এর সাহাবী হওয়া এবং ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া যাদেরকে নবীজী ﷺ দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন,

আশ্‌আরে মুবাশ্‌শারা, এতোসব গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শুধু সম্পদের কারণে কেয়ামতের ময়দানে তিনি আটকা পড়ে গেলেন এবং গরীব মুহাজীরগণের সাথে জান্নাতে যেতে পারলেন না। আল্লাহর রাসূল ﷺ পেরেশান হয়ে গেলেন, সব সাহাবী জান্নাতে চলে এসেছে, কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রদিয়াল্লহু আনহু নেই। দেখা গেলো, তিনি তখনোও আল্লাহর কাছে মালের হিসাব দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় তোদের মতো লোকদের ব্যাপারে কী ধারণা হতে পারে! যারা দুনিয়া কামাইয়ের ধান্দায় ডুবে আছিস। আফসোস, বড়ই আফসোস তাদের প্রতি যারা দুনিয়ার ফেতনায় পতিত আছে, যারা হারাম ও সন্দেহযুক্ত মালের গোলমালে জড়িয়ে আছে এবং লোকদের ময়লা (সদকার মাল) খায়, ফাহেশা, জাঁকজমক ও পরস্পর দম্ভ ও অহমিকার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে।

হায় আফসোস! হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রদিয়াল্লহু আনহু তো আমাদের ধরাছোঁয়ার অনেক দূরে। তার জান্নাত তো এই দুনিয়া থেকে কোটি কোটি গুণ বড়। উনি তো প্রথম জামানার প্রথম দশ জন সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত। বরং মক্কা বিজয়ের পর যারা সাহাবী হয়েছেন তাদের সাথেই বা আমরা কী করে নিজেদের তুলনা করি? আমাদের সারা জীবনের নেকিসমূহ যদি একত্রিত করি, তাও তো তাদের ছোট্ট একটি নেকির কাছাকাছি হবে না। আমরা গুনাহকে যেই পরিমাণ ভয় করি না, তারা তো তাদের নেক আমল কবুল না হওয়াকে তার চেয়ে বেশি ভয় করতেন। আমরা মুনাফিক হয়েও নিজেদেরকে পাক্কা ঈমানদার মনে করি। আর তাঁদের ঈমানকে স্বয়ং আল্লাহ পাক মানদণ্ড ঘোষণা করার পরেও তারা নিজেদেরকে মুনাফিক মনে করতেন। আমরা হারাম থেকে যতটুকু দূরে যেতে পারি নাই, তারা তো হালাল থেকেও তার চেয়ে বেশি দূরে ছিলেন।

যারা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বা উসমান রদিয়াল্লহু আনহুমা থেকে দলীল নিয়ে মাল জমা করা শুরু করেছে, বাড়ি-গাড়ির মোহে দীন বিক্রি ও বিকৃত করছে, তাদের সামনে কি আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু বা ওমর রদিয়াল্লহু আনহুর যিন্দেগী নেই? তারা কেনো ওমর রদিয়াল্লহু আনহুর ১৪ তালিযুক্ত কাপড়ের উদাহরণ জানেনা? তারা কোনো আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর চট পরিধান করার উদাহরণ আনে না? তারা কেনো আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর স্ত্রীর মিষ্টি খাওয়ার উদাহরণকে দলীল হিসেবে পেশ করে না? এমনকি তারা নিজেদের উপর শয়তানের ধোঁকাকে হালাল করার জন্য নবীজী ﷺ-এর একটি দামী জামার উদাহরণ টানে। এই উদাহরণ যারা টানে তারা তো আসলে সুন্নতের সংজ্ঞাই জানেনা। নবীজী ﷺ-তো একবার দাঁড়িয়েও প্রস্রাব করেছেন, তাই বলে কি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করাকে সুন্নত বলা যাবে?

নবীজী ﷺ-তো একবার দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন, তাই বলে কি দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে সুন্নত বলা যাবে? নবীজী ﷺ উম্মতের প্রতি বড় রহম দীল। উনি উম্মতের জন্য রাস্তা প্রশস্ত করে রেখে গিয়েছেন। উনি যেই কাজ কখনো করেননি, সেই কাজতো উম্মতের জন্য হারাম। যদি উনি দামী কাপড় খরিদ না করতেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব না করতেন বা দাঁড়িয়ে পানি পান না করতেন, তাহলে তো উম্মত কোনো অবস্থাতেই এগুলো করতে পারতো না। কিন্তু এগুলো কখনোই সুন্নত নয়। যদি এগুলো সুন্নত হতো, তাহলে কি হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহুর সুন্নতের প্রতি কোনো মহব্বত ছিলো না? উনি কেন তালিযুক্ত ফাটা কাপড় পরতেন? উনি কি নবীজী ﷺ-কে চিনতে ভুল করেছিলেন? এখন মর্তবা হিসেবে কে বড়? হযরত ওমর

রদিয়াল্লহু আনহু নাকি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ও ওসমান ইবনে আফ্ফান রদিয়াল্লহু আনহুমা?

কেমন ছিল হযরত উসমান রদিয়াল্লহু আনহুর যিন্দেগী?

সত্য কথা হলো, যারা ঐসকল সম্মানীত সাহাবীদের দলীল দিয়ে নিজেদের দুনিয়ার মহব্বতকে জায়েয করে, তারা শুধু ঐসব সাহাবীদের মালের দিকেই তাকিয়ে থাকে, তাদের যিন্দেগীর দিকে তাকায় না। হযরত উসমান রদিয়াল্লহু আনহুর কথাই ধরা যাক।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক সম্পদ দিয়েছিলেন। কথা সত্য! কিন্তু দানের ক্ষেত্রে তাঁর হাত ছিল তুলনাহীন। সম্পদ ছিল তাঁর নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত স্বরূপ। যখনই আল্লাহ চাইতেন সঙ্গে সঙ্গে দান করে দিতেন। উসরা যুদ্ধের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে যথাসম্ভব দান করতে তশকীল করলে তিনি জিনপোশ ও সরঞ্জামাদিসহ প্রথমে একশ উট, তারপর দুইশ উট, অবশেষে তিনশ উটের কথা স্বীকার করলেন। নবীজী হাসিমুখে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। নেমে বললেন- "এরপর উসমানের জন্য আর কোনো নেক আমল না করলেও চলবে।"

হযরত উসমান রদিয়াল্লহু আনহু যতটুকু বলেছিলেন ততটুকুতে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি দানের লাগাম ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাড়ে নয়শ উট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিলেন। সঙ্গে পঞ্চাশটি ঘোড়া দিয়ে এক হাজার পূর্ণ করেন। এছাড়াও তিনি এ যুদ্ধে এক হাজার দিনার নবীজী ﷺ -এর হাতে তুলে দেন দরিদ্র সাহাবীদের পিছনে খরচ করার জন্য।

তিনি মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের জন্য জায়গা ক্রয় করে দেন। বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিনি মদীনার মুসলমানদের জন্য এক ইহুদীর কাছ থেকে কূপ ক্রয় করে দেন। এভাবে তিনি দুইবার জান্নাত ক্রয় করেন।

হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহুর খিলাফতকালে মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি খাদ্য শস্যে ভরা একশো উট দরিদ্র সাহাবীদের জন্য দান করে দেন।

কল্পনা করা যায় কি, তাঁর কি পরিমাণ ধন সম্পদ ছিল? এত ধন সম্পদ যার আছে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা যায়, তিনি বিলাসী জীবন যাপন করতেন, তাঁর চল্লিশ-পঞ্চাশটা না হোক আট-দশটা জামা কাপড় তো অবশ্যই ছিল, পানাহারের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তিনি অন্যান্য দরিদ্র সাহাবীদের মতো দিনে একবার বা দুই/তিন/চার দিনে একবার খানা খেতেন না, বরং দিনে দুই-তিনবার বা আমাদের মতো দিনে চার-পাঁচবার খেতেন, কেননা তাঁর তো অজস্র খানা ছিল। নিশ্চয় তিনি কোনো প্রাসাদ বানিয়েছিলেন, কমপক্ষে ইটের দালানতো অবশ্যই বানিয়ে থাকবেন। তাঁর ঘর নিশ্চয় দামী আসবাবপত্রে ভর্তি ছিল। তাই না?

কিন্তু না! এগুলো সব ভুল ধারণা, যা আমাদের যামানার কিছু ফিতনায় জর্জরিত দুনিয়াদার আলেমরা করে থাকে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা নিজেদের দুনিয়াদারীকে হালাল করার জন্য হযরত উসমান রদিয়াল্লহু আনহুর দলীল পেশ করে। প্রকৃত ব্যাপার হলো এই-

প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাঁর যিন্দেগী ছিল অভাবীদের মতো। তিনি দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন। তিনি লোকদের ভালো খাবার খাওয়াতেন, নিজে খেতেন সিরকা ও তেল (যা সেই যামানায় অত্যন্ত

নিম্নমানের খাবার ছিল)। জীবনভর তিনি রাতজেগে ইবাদত করতেন। দিনের বেলা তিনি রোযা রাখতেন।

তাঁর যিন্দেগী ছিল অত্যন্ত সাধাসিধে। আব্দুল মালেক ইবনে শাদ্দাদ বলেন, "আমি জুমার দিনে হযরত উসমান রদিয়াল্লহু আনহুকে খুতবা দিতে দেখেছি। তাঁর পরনে ছিল পুরোনো একটি ইয়ামানী লুঙ্গি। যার মূল্য মাত্র চার দিরহাম। অথচ তিনি তখন আমীরুল মুমিনীন।"

হযরত হাসান রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, "খলীফা অবস্থায় আমি হযরত উসমান রদিয়াল্লহু আনহুকে মসজিদে দুপুরে ঘুমাতে দেখেছি। তাঁর শরীরে ছিল চাটাইয়ের দাগ।"

দুনিয়া ছিল তাঁর কাছে আখিরাতের বাহন। দুনিয়াতে তিনি ছিলেন দরিদ্র কিংবা মুসাফিরের মতো, যে সওয়ারির অপেক্ষা করছে।

তিনি বলতেন, "আল্লাহ তোমাদের দুনিয়া দিয়েছেন এর দ্বারা আখিরাত উপার্জন করতে। দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ার জন্য দেননি।"

(الزهاد مأة ,মুহাম্মাদ সিদ্দীক মিনশাভী,পৃ. ৭৩-৭৪)

আলেম সমাজের এই অবস্থা কেন হলো?

হযরত হুযাইফা রদিয়াল্লহু আনহু। আল্লাহর রাসূলের ﷺ রহস্যবিদ সাহাবী। নবীজী ﷺ একমাত্র তাঁর নিকটই কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতের সকল ফিতনা ও ইসলামের সরলপথ চ্যুতির বিষয় বলে গিয়েছেন। আপনারা অবাক হবেন, সাহাবা রদিয়াল্লহু আনহুম জীবিত থাকা অবস্থাতেই হুজাইফা রদিয়াল্লহু আনহু মুসলমান সমাজে একটি ফিতনা সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। বিষয়টি বিশ্বাস করতে আপনাদের অনেকের

জন্য কষ্টকর হবে। মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বার ৩৬,৪৩৯ নং হাদীসে বলা হয়েছে, একদা হুজাইফা রদিয়াল্লহু আনহু মসজিদে ঢুকে দেখলেন, সেখানে *কিছু লোক অন্য কিছু লোককে এলেম শিখাচ্ছে।* তিনি আফসোস করে বললেন, *হায়, তোমরা যদি সঠিক পথের উপর থাকতে! তোমরা অনেক দূরের জিনিসকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছো।* একথা বলে তিনি তাদের মাঝে বসলেন এবং বললেন, আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) ছিলাম সেই কওম যারা এলেম শিখার আগে ঈমান শিখেছি। **শীঘ্রই এমন কওম আসবে যারা ঈমান শেখার আগে এলেম শিখবে।** লোকদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে কি এটাও (ঈমান শিখার আগে এলেম শিখা) ফিতনা? তিনি বললেন, অচিরেই এমন কিছু ব্যাপার তোমাদের সামনে আসবে যে তোমরা (সেসব বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গেলে নিজেরাই) অপরাধী বনে যাবে। এরপর অনবরত সেই জিনিসগুলো আসতেই থাকবে, আসতেই থাকবে। লোকজন পরামর্শ নিবে এমন দুব্যক্তি (আলেম) থেকে, যাদের একজন হবে অক্ষম ও অন্য জন হবে অসৎ। একথার সমর্থন পাওয়া যায় হযরত জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লহু-এর বর্ণনা থেকে। তিনি বলেন, "আমরা আমাদের নবীজী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তাই আমরা কুরআন শিখার আগে ঈমান শিখেছি। তারপর আমরা কুরআন শিখেছি। আর এভাবে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।"

আগেও বলেছি, আবারো বলছি, সাহাবায়ে কেরাম কলেমা পড়ে ঈমান আনার পর, নবীজী ﷺ-কে দেখে দেখে নবীওয়ালা যিন্দেগী কিভাবে গড়তে হবে তা শিক্ষা করেছেন। সর্বপ্রথম নবীওয়ালা মেজাজ গড়েছেন।

এরপর তারা কুরআন শিখেছেন, ইলম হাছিল করেছেন। এই ইলম তখন তাঁদের আরো উন্নতি সাধন করেছে। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করাকে সহজ করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতকে আরো বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবস্থা পুরোই উল্টো।

আমাদের দেশ তথা সারা দুনিয়াতে হাজার হাজার মাদরাসায় লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে দীনের কথা শিখছে। অথচ এদের অধিকাংশই তাদের পরিবার থেকে ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণা না নিয়েই মাদরাসায় আসে। জন্মের পর থেকে ঈমানী কোনো সবক তার পিতা মাতা তাদেরকে দেয়না বা দেওয়ার সামর্থ্য রাখে না। ফলে অনুপযুক্ত পাত্রে ঢেলে দেয়া হয় দ্বীনি পবিত্র সবক এবং তখন এদের অধিকাংশই এর মাহাত্ম্য বুঝতে ব্যর্থ হয়। এই জন্যই দেখা যায়, একজন দীনদার দুনিয়াবিমুখ আলেমের সন্তানই কেবল দীনদার দুনিয়াবিমুখ আলেম হয়। অন্যথায় মাদরাসার সার্টিফিকেটধারী লোকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আলেমরা দুনিয়া থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন এবং মানুষ ফিতনাকে দ্বীন মনে করতে শুরু করেছে।

আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, একবার নবীজী ﷺ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, *ইলম তুলে নেয়ার সময় হয়ে গেছে।* একথা শুনে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এলেম কিভাবে উঠে যাবে, অথচ আমরা নিজেরা কুরআন শিখছি এবং আমাদের সন্তানদেরকেও শিখাচ্ছি? তখন নবীজী ﷺ বললেন, আমি তোমাকে অনেক বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। ইহুদী-খ্রিস্টানরাও তো তাদের কিতাব পড়ে ও তাদের সন্তানদের পড়ায়। এতে তাদের কী ফায়দা হয়েছে?

যারা আমরা লোকসমাজে নিজেদেরকে আলেম বলে পরিচয় দেই, কিন্তু নবীজীর সুন্নত থেকে দূরে, তাদের উচিত আমরা যেনো নিজেদের সংশোধনের ফিকির করি। এখন যা কিছু দ্বীন ও গ্রহণযোগ্য মনে করা হচ্ছে, তা আসলে নবীওয়ালা বা সাহাবাওয়ালা দ্বীন নয়।

একদা আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লহু আনহু এক মজলিসে বসেছিলেন। তিনি বললেন, তখন তোমাদের অবস্থা কী হবে যখন ফিতনার চাদর তোমাদেরকে পড়ানো হবে? অল্প বয়সীরা সে সময় সীমা অতিক্রম করবে এবং বয়স্করা তখন দুর্বল হয়ে পড়বে। মানুষ সে সময় ফিতনাকে সুন্নত মনে করবে। আর সেই ফিতনাকে কেউ পরিবর্তন করতে চাইলে মানুষ তাকে বাঁধা দিয়ে বলবে, তুমি সুন্নতের মাঝে পরিবর্তন আনতে চাচ্ছো। তখন মজলিসের লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আবি আব্দুর রহমান, এ রকম কখন হবে? তিনি উত্তর করলেন, যখন তোমাদের মাঝে আলেমদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিশ্বস্তদের সংখ্যা হবে অনেক কম। (আলেমদের মাঝে আমানতদারিতা উঠে যাবে।) যখন তোমাদের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে ফয়সালাকারী (মুফতী সাহেবদের) সংখ্যা বেড়ে যাবে কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকের দীনের বুঝ থাকবে। আর যখন তোমরা আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়ার সন্ধান করবে।

যদি আমরা নিজেদেরকে সংশোধন না করি তাহলে আখিরাতে অনেক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। এক হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ঐ আলেমের, যার এলেম তার কোনোই কাজে আসেনি। গোনাহে লিপ্ত আলেমদেরকে যাবানিয়া নামক ফেরেশতারা কাফেরদের পূর্বেই পাকড়াও করবে। এই ফেরেশতারা

অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় স্বভাবের হবে। তখন বে-আমল আলেমরা বলবে, আমাদেরকে কেনো কাফেরদের পূর্বে পাকড়াও করা হচ্ছে? তাদেরকে জওয়াব দেয়া হবে, জেনে শুনে যারা অপরাধ করেছে ও যারা না জেনে অপরাধ করেছে তারা কখনো সমান হতে পারে না।

আমরা সকলে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাচ্ছি তাঁর ক্রোধ থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান কর। আমীন।

কারো মাঝে ইসলাম প্রবেশ করেছে কিনা তার লক্ষণ:

যারা কষ্ট স্বীকার করে এতক্ষণ 'দুনিয়া ও তার উপাদানসমূহ' নিয়ে আমার সুদীর্ঘ লেখা পড়েছেন, তাদের মনে নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন জেগেছে? প্রশ্নগুলো হয়তো এমন-

দুনিয়া নিয়ে কেন এতো আলোচনা করা হলো? কী দরকার ছিলো এসবের? যেভাবে আমরা দুনিয়া ভোগ করছি, তার পাশাপাশি দ্বীনের খেদমত করলে কি দ্বীনদারী হবে না? দশটা-বিশটা চিকন কাপড়ের জামা নিয়ে যদি মাদরাসার শিক্ষক হই, মুহতামিম হয়ে তিন-চার তলা বিল্ডিং বানালে সমস্যা কোথায়, দ্বীনের খেদমত কি করছি না? ঘরে থেকে মুরুব্বীর হাতে বাইয়াত হয়ে নিজের এসলাহ করলে কি দ্বীন পূর্ণ হলো না? ঘরে আসবাব পত্র থাকলে সমস্যা কি, আমি কি দাওয়াতের ময়দানে জীবনকে কুরবানি করে দিয়েছি না? অথবা দিনে তিনবার খেয়ে শক্তি অর্জন করে

জিহাদ করি, তাতে সমস্যা কোথায়? আমরা তো কোনো সমস্যা দেখছি না!

সমস্যা তো অবশ্যই আছে? যদি সমস্যা না-ই থাকতো, সাহাবায়ে কেরাম কি এমনি এমনি দুনিয়াবিমুখতার মশক করেছেন, এতো টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কি তারা শখে গরীব মানুষের মতো যিন্দেগী যাপন করেছেন?

যখন এই আয়াত নাযিল হলো-

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ

"আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" (৬ সূরা আনআম: ১২৫)

তখন ছাহাবাগণ হুযুর -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই উন্মুক্ত করা কিরূপ? নবীজী বললেন,"এটি এক প্রকার নূর (আলো) যা অন্তরের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং তার প্রভাবে হৃদয় উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়ে পড়ে।" সাহাবায়ে কেরাম আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই নূর (আলো) অন্তরে উৎপন্ন হওয়ার আলামত কি?" উত্তরে রাসূলে কারীম ইরশাদ করেন, "এই ধোকার ঘর (দুনিয়া) হতে মন উঠে যায়, সংসারের কোনো কিছুতেই মন আকৃষ্ট হয় না। চিরস্থায়ী পরকালের প্রতি মন ছুটে যায় (চরম আগ্রহী হয়) এবং মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য সম্বল সংগ্রহে লিপ্ত ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে (মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়)।"

একদিন হযরত হারেসা রদিয়াল্লহু আনহু নবীজী কে বললেন,"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যথার্থ মুমিন হতে পেরেছি।"

হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন,"(প্রত্যেকটি কথার তো একটি হাকীকত থাকে, তোমার দাবীর পক্ষে) প্রমাণ কী?" হযরত হারেসা রদিয়াল্লহু আনহু বললেন,"আমার মন দুনিয়ার ধোকার জাল ছিন্ন করে এমনভাবে পলায়ন করেছে যে, আমার দৃষ্টিতে স্বর্ণ এবং পাথরের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় বস্তুই আমার কাছে সমান তুচ্ছ মনে হয়। বেহেশত এবং দোযখকে আমি যেন দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।" হুযুর একথা শুনে বললেন,"ঈমানের যে অবস্থা তোমার পাওয়ার দরকার ছিল, তা তুমি সঠিকভাবে পেয়েছো। এখন একে সযত্নে রক্ষা করো। অতঃপর তিনি বললেন, 'عَبْدٌ نَوَّرَ اللّٰهُ قَلْبَه' "এই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দা। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে আলোকিত ও উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন।"
(কিমিয়ায়ে সাআদাত, খন্ড ৪, পৃ. ১৬০)

লক্ষ্য করুন, প্রকৃত ঈমানদার ও ইসলামওয়ালা (মুসলমান) হওয়ার মাপকাঠি হলো, কে কতটুকু দুনিয়া ছাড়তে পেরেছে। কার ভিতরে ইসলাম ও ঈমানের নূর কতটুকু ঢুকেছে তা পরিমাপ করার রাস্তা হচ্ছে, তার মাঝে দুনিয়া ছাড়ার যোগ্যতা কতটুকু হাছিল হলো তা দেখা। আপনি যত বড় মাদরাসার শিক্ষক বা মুহতামিম-ই হন না কেন, যত বড় বুযুর্গের হাতেই বাইয়াত হন না কেন, আপনি যত ঘণ্টাই দাওয়াতের মেহনত করেন না কেন, আর আপনি যত শক্তিমান বীর মুজাহিদই হন না কেন, দুনিয়া ছাড়তে পারেন নি তো ইসলাম আপনার মাঝে প্রবেশ করেনি। সুতরাং দুনিয়া ছাড়তে পারা প্রকৃত মুসলমান হওয়া, না হওয়ার প্রশ্ন। আমাদের মাঝে দুনিয়া ঢুকার কারণে আজ এত এত মসজিদ, মাদরাসা, মারকাজ, খানকাহ, তালীম, তরবীয়ত, দাওয়াত থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত ইসলাম নেই, যেই ইসলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের শিখিয়ে গিয়েছিলেন। যেই

ইসলামের শক্তি এই পরিমাণ ছিল যে, মাত্র তেইশ বছরে অর্ধ পৃথিবী ইসলামের ছায়াতলে এসে পড়েছিল। আর আজ আড়াইশ কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও এক ইঞ্চি মাটিতে ইসলাম নেই। হা হা! সত্যিই হাস্যকর। তারপরও কি আমরা বুঝবো না?

আচ্ছা বলুনতো! এই ধোকার ঘর হতে যদি কারো দীল উঠে যায় সে কি জামা-কাপড়, রকমারি খাবার-দাবার, টাকা পয়সা, নারী, বাড়ি, গাড়ির পিছনে ছুটবে? সম্মান ও জিম্মাদারি হাসিল বা সরকারের চাটুকারি করবে? যে চিরস্থায়ী ঘরের জন্য অস্থির হয়ে আছে, দুনিয়ার কোনো জিনিস কি তাকে আনন্দ দিবে? যে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে সে কি সত্য কথা বলতে শাসকের ভয় করবে? যে প্রিয় আপন-জনের মহব্বত নামক 'দুনিয়া'কে কুরবানী করতে পেরেছে, যে মৃত্যুর জন্য সদাপ্রস্তুত, যার মন আখিরাতে চলে গিয়েছে, যার দীলের মাঝে জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণ আছে, সে কি করে আল্লাহ তাআলার ধমকি শুনার পরও জিহাদ পরিত্যাগ করে ঘরে বসে থাকতে পারে?

তাই আবারো বলছি, দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, নিযামুদ্দিন বা কাকরাইলের মুরুব্বি বা জিম্মাদার সাথি, যে যে তবকার মুসলমানই হই না কেন, দ্বীনের মুজাহিদ হয়েও যদি সেই তিনটি আলামত আমাদের মাঝে না থাকে, তাহলে আমরা এখনো ইসলাম পাইনি বা মুসলমান হইনি। আমার ইসলাম যেনো আমাকে দুনিয়া বিসর্জন দিতে শিক্ষা দেয়, দুনিয়া কামাইয়ের মাধ্যম না হয়। আমার ইসলাম যেনো আমার নবীর ﷺ যিন্দেগীকে ভালোবাসতে শিখায়, তাঁকে অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে, হালাল সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে আসে, আর হারাম আসে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে। আমরা আরাম আয়েশের সকল উপকরণ ত্যাগ করি, নিজেদের প্রতি রহম করি। নিজেদের ঘরের সামানপত্র ও নবীজী ﷺ- এর ঘরের সামানপত্র তুলনা করি। খাট, সোফা, টেবিল ও অন্যান্য সামান পরিত্যাগ করে নিজেকে হালকা পাতলা রাখি, এই হুকুম কুরআনে এসেছে এবং ফরয। নিজেকে কিয়ামতের হিসাবের জন্য সহজ রাখি, নিজের প্রতি রহম করি।

দুনিয়ার মহব্বত উম্মতের কী ক্ষতি করলো?

দুনিয়াপ্রীতি উম্মতের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করেছে, তা হলো উম্মতের মধ্যে **"মৃত্যুর প্রতি অনীহা"** পয়দা করেছে। আর যার ফল দাঁড়িয়েছে- **মৃত্যুর ভয় এবং জিহাদ পরিত্যাগ।**

যে নিজের ঘরের সুন্দরী স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মহব্বতকে আল্লাহর জন্য কুরবানী করতে পারবে না, সে কিভাবে জিহাদে যাবে? সে কিভাবে একাকী কবরে থাকার কথা ভাবতে পারে?

যে আলোকোজ্জ্বল, ঝলমলে ঘর আর আরাম-আয়েশের বিছানার টান ছিন্ন করতে পারে নি, সে কিভাবে জিহাদের ময়দানে গুহার আঁধারে পাথরের বিছানাকে পছন্দ করবে? সে কি পারবে কবরের ভয়াবহ অন্ধকার আর মাটির বিছানার জন্য ময়দানে ঝাঁপ দিতে?

যে দশ-পনেরটা কাপড় পরিধান করে অভ্যস্ত, ইস্ত্রী ছাড়া কাপড় পরতে পারে না, সে কি পারবে ছিঁড়া, অপরিষ্কার, ইস্ত্রীহীন, তালিযুক্ত কাপড় পরে জিহাদের ময়দানে দিনাতিপাত করতে?

যে তিন-চার বেলা খেয়ে অভ্যস্ত, তার পক্ষে কিভাবে জিহাদের ময়দানে না খেয়ে কষ্ট করা সম্ভব? যার নফ্স অধিক খেয়ে পুষ্ট, তার নফ্স কি এখনি মরতে চাবে? নফস তো খাওয়ার জন্যই বাঁচতে চাবে!

আবার যে অধিক খেয়ে কামরিপুকে ধার করেছে, কামরিপু যাকে চব্বিশ ঘণ্টা বধ করে, যে ডানে-বামে-সামনে-পিছনে সর্বত্র শুধু 'কাম' দেখে, কামচিন্তা ছাড়া যে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারেনা, যার যিন্দেগীতে 'কাম' ছাড়া আর কিছুই নেই, প্রতিদিন যার স্ত্রী সহবাস না করলে চলে না, এক স্ত্রীতে যে সন্তুষ্ট হতে পারে না, সে কিভাবে ময়দানে 'কাম' ছাড়া বছরের পর বছর থাকবে?

যে প্রতিদিন গোসল না করে থাকতে পারে না, সে কি পারবে জিহাদের ময়দানে চল্লিশ দিন গোসল না করে থাকতে?

যে বাড়ি-গাড়ি আর ডিগ্রির ধান্দা করবে, সে কী পারবে, তার ডিগ্রি আর পেশা ছেড়ে অন্য কাজ করতে? জিহাদ তো অনেক পরের কথা!

যার দীল দুনিয়া থেকে উঠে যায়নি, আখিরাতের জন্য যার দীল আগ্রহী হয়নি, সে কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিবে? আর যে দুনিয়াকে এই পরিমাণ সঙ্কীর্ণ করেনি, নফসকে কষ্টে ফেলে নি, যার দুনিয়ার যিন্দেগীর প্রতি এখনও বিতৃষ্ণা তৈরি হয়নি, সে কি এখনি মরতে চাইবে? যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়নি, সে তো জিহাদের প্রতিটি পরতে পরতে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি

শুনবে, জিহাদ মানে তার কাছে মনে হবে আযরাঈলের থাবা! তাহলে সে জিহাদ থেকে কেন পলায়ন করবে না? মৃত্যুর ভয়ে তার অবস্থা কেন মূর্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো হবে না? সে তো তখন অন্য আমলের মাঝে জিহাদের সওয়াব তালাশ করবে এটাই স্বাভাবিক। তখন তার মনোভাব হবে, 'জিহাদ না করে, মৃত্যুর ঝুঁকি না নিয়ে যদি জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায়, তাহলেই তো ভালো!' তখন দেখা যাবে সে জিহাদ ত্যাগ করে যে জায়গা মৃত্যুর ঝুঁকিমুক্ত, 'আমলে সালেহ' এর নাম দিয়ে সেই রাস্তায়ই বেশি দৌঁড়-ঝাপ করছে।

তখন শয়তান ও তার নফ্স মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য তাকে নানা রকম বুঝ দিবে- ঘরে বসে নফসের রিয়াযত করলে ময়দানের চেয়ে বেশি সওয়াব (জিহাদে আকবর) হবে (!), গুনাহ থেকে বাঁচলেই এখন সবচেয়ে বড় হিজরত হবে (!), মাদরাসায় বসে জিহাদের তামান্না করলে জিহাদের সওয়াব মিলবে (!), ঘরে বসে কিতাবাদি লিখলেই এখন জিহাদের মর্তবা হাছিল হবে (!), দাওয়াতের রাস্তা মানেই 'আল্লাহর রাস্তা', মানে জিহাদ (!),আর দাওয়াতের ময়দানে কাজ করলে জিহাদের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে (!), গণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনীতি করলে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যাবে (!), মিছিল মিটিং করলে ময়দানে লড়াইয়ের সওয়াব মিলবে (!), পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছুড়লে বোমা নিক্ষেপ করার সওয়াব হাছিল হবে (!), আমার পীর 'আমীরে মুজাহিদ', তার হাতে বাইয়াত মানেই জিহাদ, আমিও মুজাহিদ (!)।

আরেকদল তো মরণের ভয়ে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে। বলবে- এখন জিহাদ ফরযে আঈন হয় নি (!), এখনো জিহাদ করার সময় হয়নি

(!), এখনো জিহাদের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি (!)। চারদিকে তো কেবল শান্তি আর শান্তি (!), জিহাদ করবো কার বিরুদ্ধে? (!) ইমাম মাহদীর আগমন? সে তো লক্ষ কোটি বছর পরে হবে (!)। এখন 'মক্কী যিন্দেগী' চলছে (!), এখন দাওয়াতের সময় (!), ইমাম মাহদী আসলে 'মাদানী যিন্দেগী' (!) শুরু হবে, তখন জিহাদ করতে হবে (!)।

জিহাদ করতে গিয়ে যেন মরা না লাগে সেজন্য আরেকদল জিহাদ থেকে পালানোর জন্য বলবে, জিহাদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র শর্ত, আগে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে, পরে খলীফা বললে জিহাদ করবো (!)। বর্তমানে যেহেতু আমরা দুর্বল, আমাদের শক্তি নেই, নেতা নেই, রাষ্ট্র নেই, তাই জিহাদও নেই (!)। যেহেতু আমেরিকার গোয়েন্দারা, সরকারের গোয়েন্দারা আমাদের সব কথা শুনে ফেলে, আমরা মাহফিলে যা বয়ান করি তা রেকর্ড করে ফেলে, এখন জিহাদী মেহনত মানে আত্মঘাতী মেহনত (!), তাই এখন আগের যামানার অবস্থা নেই, তাই এখন জিহাদ করা যাবে না (!), গণতন্ত্রই এখন প্রকৃত জিহাদ (!), এখন জিহাদ কাফেরের বিরুদ্ধে নয়, নফ্স ও শয়তানের বিরুদ্ধে (!), এখন ঈমানী মেহনত করতে হবে (!)। আগে মেহনত করে ঈমান ও ইখলাস হাছিল করতে হবে, পরে ময়দানে যেতে হবে (!)।

আরেকদল তো মৃত্যুর ভয়ে আরো বহুধাপ এগিয়ে 'কাপুরুষতা'র শেষ প্রান্তে পৌঁছবে, অণ্ডকোষ কেটে ফেলে নিজেদেরকে খোজা বানাবে, জিহাদ যেন পৃথিবীতেই না থাকে সেজন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে, সাত ভূঁড়ি খেয়ে 'গান্ধা' ফতোয়াবাজী করবে; অর্থ ও ক্ষমতা, পদ ও পদবীর লোভে সস্তায় নিজেদের ঈমান বিক্রি করে দিবে, বাতিলের তাবেদারী করবে

আর বলতে থাকবে - যারা জিহাদ করছে তারা শরীয়তসম্মত জিহাদ করছে না (!), তারা ভ্রান্ত (!), জিহাদকে 'জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাস' (!) হিসেবে চিহ্নিত করবে, বলবে, ইসলাম শান্তির ধর্ম (!), ইসলামে যত যুদ্ধ হয়েছে, তা ধর্মের কারণে ছিল না (!), ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষ (!), এ ধর্মে সকল বিধর্মীদের অধিকার দেয়া হয়েছে, তাই ইসলামে 'জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাস' বলে কিছু নেই (!), জিহাদ অন্য জিনিস (!), এরা যা করছে তা জিহাদ নয় (!), এরাই ইসলামটাকে নষ্ট করলো (!), এরা যুদ্ধবাজী না করলে 'বাতিল' উম্মতের উপর আক্রমণ করতো না, তাই উম্মতের ধ্বংসের জন্য এই মুজাহিদরাই দায়ী (!)।

ব্লা ব্লা ব্লা!!!

আবার অনেক গোমরাহ আছে, যারা যদিও মুখে বলে 'আমরা জিহাদ অস্বীকার করিনা', কিন্তু এদের আচার-আচরণ, চাল-চলন, হাব-ভাব, কথা-বার্তা পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝা যায়, এদের ভিতরে কী লুক্কায়িত আছে।

সুতরাং কথা স্পষ্ট! দুনিয়ার মহব্বতের শেষ পরিণতি কাপুরুষতা। একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর তাই উম্মত আজ কাপুরুষের যিন্দেগী যাপন করছে। জিহাদ ত্যাগ করেছে। যেই সব আলেম আজ উপরোক্ত এসব পঁচা ফতোয়া দিচ্ছে, এগুলো তাদের দীলের মধ্যে বিদ্যমান দুনিয়ার মহব্বত ও দুনিয়াতে বেঁচে থাকার স্পৃহাপ্রসূত উক্তি। এগুলো কস্মিনকালেও নবীওয়ালা কিংবা সাহাবাওয়ালা ঈমান ও ইসলাম নয়। এগুলো অক্ষম কাপুরুষোচিত উক্তি। মানসিক বার্ধক্য কিংবা বিকলাঙ্গতার পরিচায়ক। যদি কোনো আলেমের মুখে এসব কথা শুনা যায়,

সে “আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশ”দের তালিকা থেকে ছিটকে পড়বে। “নায়বে নবী” হওয়ার সর্বশেষ যোগ্যতাটুকুও হারাবে। বরং সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং ইসলামের দুশমন। এরাই উলামায়ে ‘ছু’। এরাই মন্দ আলেম। বরং এরা আলেম নয়, জাহেল। আলেম নামের কলঙ্ক। যাদের কারণে আজ উম্মত “আহলে হক” উলামায়ে কেরামের উপর আস্থা হারাচ্ছে। এরা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গেছে, যেমন ভাবে ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। এরাই মূক, বধির, অন্ধ, ফলে এরা আর সঠিক পথে ফিরে আসবে না। এরাই মুনাফিক। এরাই দাজ্জালের চেয়ে বেশি ভয়ংকর। এরাই নেক সুরতে, কুরআন হাদীসের দলীল দিয়ে, ভুল ব্যাখ্যা করে উম্মতকে গোমরাহ করছে। এরাই ইসলামের ধ্বংসকারী। এরাই আসমানের নীচে, জমিনের উপরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রজাতির প্রাণি। এরাই পথভ্রষ্ট। এদের মস্তক পশু-পাখির বিষ্ঠা দ্বারা ভরে গেছে। এদের মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই। এরাই কুলাঙ্গার, এরাই অভিশপ্ত।

এদের সম্পর্কেই নবীজী ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট, গোমরাহ আলেমদের সবচেয়ে বেশি ভয় করি।” (সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪২৪৯, তিরমিযী, হাদীস নং-২২২৯)

আরেক হাদীসে নবীজী ﷺ এরশাদ করেন, “আমি (উম্মতকে গোমরাহ করার ব্যাপারে) পথভ্রষ্ট আলেমদেরকে দাজ্জালের চেয়েও বেশি ভয় করি।”

আফসোস! দুনিয়া এই যামানার আলেমদেরকেও এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, তারা আজ একটি ‘ফরযে আঈন’ হুকুমের বিরোধিতা ও অস্বীকার করছে। অথচ, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, “জিহাদ

অব্যাহত থাকবে আল্লাহ আমাকে যেদিন প্রেরণ করেছেন, সেদিন থেকে শুরু করে আমার শেষ উম্মতটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করা পর্যন্ত। অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের সুবিচার কোনো কিছুই তাকে অবদমিত করতে পারবে না।" (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ৩, পৃ. ১৮)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, "এই দ্বীন চিরকাল বিদ্যমান থাকবে। এর পক্ষে একদল মুসলমান কেয়ামত অবধি লড়াই অব্যাহত রাখবে।" (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ৩, পৃ. ১৮, সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৫২৪)

শেষ জামানার আলেমগণ যে এ ধরণের উল্টাপাল্টা ফতোয়াবাজী করবে, আল্লাহ তাআলা কী তা জানতেন না? তিনি কি তাঁর হাবীব ﷺ-কে বিষয়টি অবগত করাননি? দেখুন, আল্লাহর রাসূল ﷺ কিভাবে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন?

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, "যতদিন পর্যন্ত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ সতেজ ও সুমিষ্ট থাকবে। আর অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যে যুগের শিক্ষিত লোকেরা (আলেম কিংবা ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদার ব্যক্তিরা) বলবে, এটি জিহাদের যুগ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি সে যুগটি পাবে, তার জন্য সেটি হবে জিহাদের শ্রেষ্ঠ যুগ।" সাহাবায়ে কেরাম অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুসলমান কি এমন কথা বলতে পারে? নবীজী বললেন, "হ্যাঁ, এমন মুসলমানরা বলবে, যারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপে অভিশপ্ত।" (আস্‌সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খ. ৩, পৃ. ৭৫১)

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা কি এসকল ভ্রান্ত আলেমদের ফতোয়া গ্রহণ করবেন, নাকি এদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ যে

ফতোয়া দিয়েছেন তা গ্রহণ করবেন? এরাই তো তারা, যারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপে অভিশপ্ত।

খুব ভালো করে শুনে রাখুন! হযরত হাসান রদিয়াল্লহু আনহু বলেছেন, "অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ বলবে, জিহাদ বলতে কিছু নেই। তো সেই যুগটি যখন আসবে, তখন তোমরা জিহাদ করবে। কারণ, তখন জিহাদই শ্রেষ্ঠ আমল।" (কিতাবুস্ সুনান, খ. ২, পৃ. ১৭৬)

হযরত ইবরাহীম রাহিমাহুল্লহ সম্পর্কে বর্ণিত, তাঁর সম্মুখে তথ্য উপস্থাপন করা হলো যে, মানুষ বলছে, এখন কোনো জিহাদ নেই। উত্তরে তিনি বললেন, "এটি শয়তানের উক্তি। মানুষের মাঝে এ কথাটি শয়তান প্রচার করছে।" (মুসান্নাফে আবী শায়বা, খ. ৬, পৃ. ৫০৯)

আসলে, এসব কুফুরী কথা দ্বারা এই গোমরাহ আলেমগুলো বাতিল ও ত্বগুতকে সন্তুষ্ট করছে। আর যে বাতিল ও ত্বগুতকে খুশি করবে, সে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জন করবে, আর যে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জন করবে, সে আল্লাহর আযাব ও গযবে নিপতিত হবে।

উপর্যুক্ত এ সকল কারণে উম্মত আজ পৃথিবীর খিলাফত ও নেতৃত্ব হারিয়েছে। কুফ্ফারদের দীল থেকে মুসলিম ভীতি উঠে গেছে। কাপুরুষকে তো ছাগলেও ভয় পায় না। তাই সারা দুনিয়ার বাতিল শক্তি আজ মুসলমানদের উপর চড়াও হয়েছে। আর উম্মতের নসীব হয়েছে অপমান ও জিল্লতির যিন্দেগী। এখন কি বুঝতে পারছেন, কী কারণে সাহাবায়ে কেরামকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এত গুরুত্বের সাথে দুনিয়াবিমুখতার মশ্ক করিয়েছেন? মৃত্যু ও আখিরাতকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন? ফলে তাঁরা

লাভ করেছিলেন বীরত্বের যিন্দেগী, সম্মান ও ইয্যতের যিন্দেগী। সহজেই তাঁরা বিশ্বের মঞ্চে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পেরেছিলেন।

আমরা যারা আলেম হয়েছি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ইলমের মতো মহা দৌলত দান করেছেন, তারা একটু চিন্তা করি। আমরা যারা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথে জুড়ে আছি, আল্লাহ তাআলা দাওয়াতের কাজের সাথে লাগিয়ে রেখেছেন, তারা একটু চিন্তা করি। আমরা যারা দ্বীনের মুজাহিদ, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে দ্বীন কায়েমের মেহনত করে যাচ্ছি, তারাও একটু চিন্তা করি। এছাড়া উম্মত যে যেখানে আছি, সবাই একটু চিন্তা করি। আমাদের দুআ কেন নবীদের মতো বা সাহাবীদের মতো কবুল হয় না? কারণ নবীদের সাথে আমাদের জীবনের কোনো মিল নেই। আলেমে দ্বীন, তাবলীগের সাথি, মুজাহিদ, কিংবা অন্য মেহনত করনেওয়ালা সাথি, কারো জীবনের সাথে আমাদের নবীজী ﷺ বা সাহাবা রদিয়াল্লহু আনহুমদের জীবনের কোনো মিল নেই। না ইবাদতের ক্ষেত্রে মিল আছে, না ঘর বাড়ির আসবাব পত্রের সাথে মিল আছে, না লেবাসের ক্ষেত্রে মিল আছে, না খানাপিনার ক্ষেত্রে মিল আছে, না জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে মিল আছে। নবীজী ﷺ ইরশাদ ফরমান, আমার পর তোমরা আবু বকর ও ওমরের (রদিয়াল্লহু আনহুমা) অনুসরণ করো। হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু ইসলামপূর্ব যুগে মালদার ছিলেন। ইসলামে তিনি যত পুরাতন হয়েছেন, তত নিঃস্ব হয়েছেন, দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক তত মজবুত হয়েছে। এখন আমরা শুরুতে সাধারণ মানুষ থাকি। আর যত পুরাতন হতে থাকি তত টাকার সাথে সম্পর্ক বাড়তে থাকে। আগে টিনের ঘরে থাকলে পরে আলিসান ফ্লাট বা নিজের বাড়িতে

থাকি। আগে এক দুইটি জামায় চলতো, এখন লাগে চল্লিশ-পঞ্চাশটি। আগে দুই বেলা খাবার পেতাম না, এখন খাই চার-পাঁচ বেলা। আগে ফ্লোরিং করে থাকতাম, এখন থাকি খাটে। আগে সাইকেলে চড়লে পরে চড়ি হেলিকপ্টারে। আগে সাধারণ মানুষের সাথে মিশতাম, এখন নারী প্রধানমন্ত্রীর সাথে মুসাফাহা করি। হা হা হা! আগে এমনভাবে থাকতাম যেন কেউ আমাকে না চিনে, আর এখন অর্থ, পদ ও ক্ষমতার লোভে নিজেকে প্রকাশ করি, মঞ্চে গরম গরম বক্তৃতা করি, 'গণতন্ত্র' নামক কুফরকে মেনে নিয়েছি।

এই যদি হয় আমাদের অবস্থা, এর নাম কি সুন্নতের যিন্দেগী? এর নাম কি ইত্তেবায়ে সুন্নত? এর নাম কি 'নবীর ওয়ারিশ হওয়া'? এর নাম কি দুনিয়াবিমুখতা? এর নাম কি নবীওয়ালা যিন্দেগী? এটিই কি সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী? এর নাম কি নবীওয়ালা কামকরনেওয়ালার যিন্দেগী? এটিই কি আল্লাহর রাসূলের শিক্ষা?

কেন আমাদের সাথে আল্লাহ তাআলার মদদ থাকবে? কেন আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নুসরত করা হবে? কেন আমাদের দুআগুলোকে কবুল করা হবে?

কেন আমাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হবে না? কেন আল্লাহ পাক আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবেন না? কেন আমাদের উপর যালেম কুফ্ফারদের চাপিয়ে দিবেন না? কেন আমাদের রক্ত নিয়ে হায়েনারা উল্লাস করবে না? কেন? বলুন, কেন??? জবাব দিন!

চতুর্থ গুণ

কোন অবস্থাতেই মৃত্যুকে ভয় না পাওয়া

০৪. কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুকে ভয় না পাওয়া

মৃত্যু সম্পর্কে আকীদাঃ

- আল্লাহ তাআলাই জীবনদাতা, তিনিই মৃত্যুদাতা। তিনিই প্রত্যেকের মৃত্যুর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষণ ও স্থান ঠিক করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُّؤَجَّلاً

"আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারেনা- সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)

- মৃত্যুর ক্ষণ উপস্থিত হলে, কেউ এক চুল পরিমাণ সময় বিলম্ব করতে পারবে না, কিংবা এক চুল পরিমাণ সময় আগেও মৃত্যুবরণ করবে না।

إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ

"যখন তাদের জন্য নির্দিষ্ট (মৃত্যুর) ক্ষণ উপস্থিত হবে, তখন তারা না একদণ্ড পেছনে সরতে পারবে, না সামনে অগ্রসর হতে পারবে।"
(১০ সূরা ইউনূস: ৪৯)

- কাপুরুষতা, জিহাদ/মৃত্যু হতে পলায়ন সামান্য হায়াৎ বৃদ্ধি করতে পারেনা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও আশ্রয় নাও, তবুও।"
(৪ সূরা নিসা: ৭৮)

- আর বীরত্ব/ জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া সামান্য হায়াত হ্রাস করতে পারেনা।
- আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। কেউ যুদ্ধের কঠিন জায়গাগুলোতে যুদ্ধ করলেই যে শহীদ হবে, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাআলার ফয়সালা না হলে শাহাদাত সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ

"আর তিনি (আল্লাহ তাআলা) তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান।" (সূরা আলে ইমরান: ১৪০)

- জিহাদের ময়দানে যদি কেউ শহীদ হয়, বুঝতে হবে, আসলে তখনই তার পৃথিবী ত্যাগের ফয়সালা ছিল, সে যদি ঘরেও বসে থাকত, মৃত্যু তার ঘরেই পৌঁছতো। মাঝখান থেকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার দরুন সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করল। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى

بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

"তারা বলে যদি আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে (যুদ্ধের ময়দানে) নিহত হতাম না। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৫৪)

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ ٱلأَدْبَارَ - وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে (যুদ্ধে) মুখোমুখী হবে, তখন (মৃত্যুর ভয়ে) পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে সেদিন পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত- অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।" (৮ সূরা আনফাল: ১৫-১৬)

মৃত্যুকে আমরা কেন ভয় পাই?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾

"যারা মুমিন তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মতো আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য!" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ: ২০)

মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কারণসমূহ:

১. **দুনিয়ার মহব্বত:**

হযরত সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক রহঃ হযরত আবূ হাযিম রহঃ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বলুন তো দেখি ভাই, আমরা মৃত্যুকে কেন ভয় করি?" উত্তরে তিনি বললেন, "মৃত্যুকে ভয় কর, তার কারণ হল, তুমি দুনিয়াকে আবাদ আর আখিরাতকে বরবাদ করেছ। তাই আবাদী ত্যাগ করে বিরান ভূমিতে যেতে মন চায় না।" একথা শুনে হযরত সুলাইমান রহঃ বললেন, "বাস্তবিক, আপনি ঠিকই বলেছেন।"

উম্মতের মাঝে মৃত্যুর ভয় এবং এর ফলশ্রুতিতে উৎপন্ন কাপুরুষতার মূল কারণ হলো দুনিয়ার মহব্বত। আম থেকে খাওয়াস, আলেম থেকে জাহেল, দীনদার থেকে দুনিয়াদার সকলের মাঝে আজ দুনিয়ার মহব্বত গালেব হওয়ায় সকলেই মৃত্যুর ভয়ে ত্রস্ত, আজ আমরা সকলেই কাপুরুষতার যিন্দেগী যাপন করছি। আমরা কেউই আবাদী দুনিয়া ছেড়ে আমাদের দুই হাতে বরবাদ করা আখিরাতে চলে যেতে প্রস্তুত নই।

২. গুনাহমুক্ত যিন্দেগী গঠন না করা:

যারা গুনাহমুক্ত হয়ে নেক কাজে জীবন অতিবাহিত করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উপর অবিচল বিশ্বাস রাখে তাদের এই দুনিয়াতে মন বসে না। এবং মৃত্যুর পরের জীবনকেই তারা দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যারা অপকর্মে লিপ্ত, আল্লাহর নাফরমানীতে অভ্যস্ত, তারাই মৃত্যুকে ভয় করে থাকে। গুনাহের মূল কারণও মূলত দুনিয়ার মহব্বতের মাঝেই নিহিত।

৩. আখিরাত (মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা) সম্পর্কে অজ্ঞতা:

আখিরাতের যিন্দেগীর উপর যার বিশ্বাস থাকবে এবং দুনিয়ার জীবনে কৃত নেক কাজের বিনিময়ে পরকালে আল্লাহ তাআলা যে সকল প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন তার আশা যার মধ্যে থাকবে, আর যে একথা বুঝবে যে, নেক কাজ করে দুনিয়ার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করার পর তথায় বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের সাথে সাক্ষাৎ হবে, মৃত্যুর পর বরযখে এবং পুনরুত্থানের পর জান্নাতে আবারো মিলিত হয়ে একসাথে চিরদিনের জন্য অতুলনীয় সুখ-শান্তিতে বসবাস করব, আর পৃথক হবো না, তাহলে সে মৃত্যুকে ভয়-ই বা কেন করবে

আর এই জাগতিক জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য-ই বা কেন দিবে? যে ব্যক্তি জান্নাতের স্বর্ণের প্রাসাদসমূহের অবস্থা জানে সে কি দুনিয়াতে ইটের প্রাসাদ বানাবে? যে ব্যক্তি আখিরাতে হিসাব দেয়ার ভয় রাখে এবং সহজ হিসাবে জান্নাতে যেতে চায় সে কি দুনিয়াতে মাল জমাবে? যে ব্যক্তি হূরে ঈ'নের রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে জানে, সে কি দুনিয়াতে পরনারীর দিকে দৃষ্টি দিবে, চোখের গুনাহ করবে, চোখ দিয়ে অশ্লীল কিছু দেখবে? যে ব্যক্তি শহীদের প্রতিদান সম্পর্কে জানে, সে কি দুনিয়াতে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকাকে 'সময় নষ্ট' মনে করবে না? যে ব্যক্তি জানে যে, আমি জিহাদের জন্য হিজরত করলে, আমার স্ত্রী-সন্তান-পিতা-মাতাদের যে কষ্ট হবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাফ করে জান্নাতুল ফিরদাউসে আমার সাথী বানিয়ে দিবেন এবং এমন মর্যাদা দিবেন যা তারা আমল করে লাভ করতে পারতো না, সে কি নিজের কাছের লোকগুলোর মহব্বত ত্যাগ করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না? এর দ্বারা সে কি ঐসব আত্মীয়দের প্রতি এহসান (অনুগ্রহ)-ই করল না? যে ব্যক্তি মৃত্যুর কষ্ট, কবরের সওয়াল, কবরের চাপ, নানাবিধ কবরের আযাব, কিয়ামতের বিভীষিকা, হাশরের ময়দানের কষ্ট, পুলসিরাতের অবস্থা, জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে সে কি দুনিয়াতে গুনাহে লিপ্ত হবে? আর যে ব্যক্তি গুনাহমুক্ত থাকবে, তার জন্য এই গুনাহে পরিপূর্ণ পৃথিবী বসবাসের অনুপযুক্ত মনে হবে, মৃত্যুর জন্য, মাওলার সাথে মিলনের জন্য সে তো পাগলপারা হয়ে যাবে।

৪.আল্লাহ তাআলার ভয় না থাকা:

আল্লাহ তাআলার সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, তাঁর কাছে আমাকে হিসাব দিতে হবে, উম্মতের প্রতি আমার যে যিম্মাদারী তা পালন না করলে, উম্মতকে যালেমদের কবল থেকে উদ্ধার করার জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে আমাকে আল্লাহ তাআলার কাছে বড়ো কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে, মর্মন্তুদ শাস্তি পেতে হবে, এই ভয় যার মধ্যে প্রবল হবে, মৃত্যুর ভয় তার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে বাধা হবে না, দীনের জন্য কদম বাড়ানো, বড়ো বড়ো কুরবানী আর বড়ো বড়ো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মোটেও কঠিন হবে না। বরং তখন সে এরকম না করাকে 'মুনাফেকীর আলামত' মনে করবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "৩৮. হে ঈমানদারগণ! এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা (মৃত্যুর ভয়ে) যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (স্থায়ী কল্যাণের) তুলনায় (এ) দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবনকে নিয়েই বেশি সন্তুষ্ট? (অথচ) পরকালে (হিসাবের মানদন্ডে) দুনিয়ার মালসামানা নিতান্তই কম। ৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে) না বের হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৮-৩৯)

৫.সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনদের আদর্শ ভুলে যাওয়া:

একটি জাতির জন্য এটি অত্যন্ত পরিতাপ ও আফসোসের বিষয় যে, সে তার পূর্বপুরুষদের আদর্শ ভুলে যায়। হায়! আজ আমরা মুসলমানরা সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ ভুলে গিয়েছি। তাদের বীরত্ব, ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের যে অনুপম দৃষ্টান্ত তারা দুনিয়ার বুকে কায়েম করেছিলেন আমরা সে কথা ভুলে গিয়েছি। যে জাতির একজন পুরুষের নাম শুনে সারা পৃথিবী থরথরে কাঁপত, সে জাতির আজ কী নাজেহাল অবস্থা! এখন সময় এসেছে জেগে উঠার, হায়দারী হাঁকে গর্জে উঠার, সাইফুল্লাহর তরবারির খাপ উন্মুক্ত করার, বাতিলের রক্তের নদী প্রবাহিত করার, আর ঘুম নয় বন্ধু, জেগে ওঠো!

মুমিনের জন্য মৃত্যুই উত্তম:

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, " মানুষ বেঁচে থাকাকে প্রিয় মনে করে, অথচ মৃতুই ছিল তার জন্য শ্রেয়।" (বায়হাকী)

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মুমিনের জন্য তোহফা তথা হাদিয়া আখ্যা দিয়েছেন। (মিশকাত)

তিনি ﷺ আরো বলেন, "মানুষ মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকে। অথচ দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মৃত্যুই শ্রেয়। যত তাড়াতাড়ি মৃত্যু লাভ করা যায়, তত তাড়াতাড়ি দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।" (আহমাদ)

হযরত আনাস রদিয়াল্লহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ বলেছেন, “মানুষ দুনিয়া থেকে ইন্তিকাল করার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন শিশু মায়ের (সংকীর্ণ ও অন্ধকার) পেট থেকে বের হয়ে (সুবিশাল ও আলোকিত) শান্তিময় দুনিয়ায় এসে পড়ে।” (হাকীমে তিরমিযী)

মোটকথা মুমিনের জন্য মৃত্যু খুবই উত্তম বিষয়। তবে শর্ত হলো যে, নেককার হতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে সুসম্পর্ক থাকতে হবে।

একবার হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহু কোনো এক পথিককে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে সে বলল, বাজারে যাওয়ার আশা রাখি। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লহু আনহু বললেন, ভাই সম্ভব হলে আমার জন্য মৃত্যু কিনে নিয়ে এসো। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে আর আমি থাকতে চাই না। টাকার বিনিময়ে পাওয়া গেলেও মৃত্যু ক্রয় করে নিতে চাই।

হযরত খালেদ বিন মাযান রদিয়াল্লহু আনহু বলতেন, কেউ যদি বলতো যে, সর্বপ্রথম অমুক বস্তুটি যে ছুইতে পারবে, সে তখনই মৃত্যুবরণ করবে; তাহলে আমার আগে তা কেউই ছুইতে পারবে না। অবশ্য কেউ যদি আমার চেয়ে বেশি দৌড়াতে পারে এবং আমার আগেই তথায় পৌঁছে যেতে পারে তবে তা ভিন্ন কথা। (শরহুছ্ছুদুর)

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরে মৃত্যুর মহব্বত পয়দা করে দাও এবং মৃত্যুকে তোমার দীদার ও তোমার সাথে মিলনের মাধ্যম বানাও। আমীন।

জান্নাতের স্বপ্নিল ভুবন

চলো বন্ধু! মুমিনের প্রতিশ্রুত ঠিকানা জান্নাতের গল্প শুনা যাক। জান্নাত অবশ্যই মানব কল্পনার উর্ধ্বে। তার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সেই সৌন্দর্যের কল্পনা মানব চিন্তাশক্তির বহু উপরে। জান্নাতের একটি খড়কুটো রাখার পরিমাণ স্থান লাভ করাও দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।" (সূরা সাজদাহ ৩২:১৭)

বন্ধুরা! হাদীসে এসেছে, "জান্নাতে এমন সব বস্তু থাকবে যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কোনোদিন শুনে নি, যার চিন্তা কোনো মানব হৃদয়ে কোনোদিন উদিত হয়নি।" (বুখারী খন্ড ১, পৃ.৪৬০, মুসলিম খ. ২, পৃ. ৩৭৮)

জান্নাত লাভের প্রস্তুতি গ্রহণকারী কেউ কি নেই? জান্নাত তো এমন স্থান, যাতে কোনো বিপদের আশংকা নেই।

কাবার প্রভুর শপথ! জান্নাতে রয়েছে প্রদীপ্ত জ্যোতি, প্রবহমান নদী, সুরভি বিচ্ছুরণকারী ফুল, পাকা ফল ও অপরূপা, সুদর্শনা, সুন্দরী রমণী, আছে বস্ত্র-সম্ভার, সবুজ শ্যামল নকশী চাদর, চিরস্থায়ী নিবাস, শান্তিময় ও নিরাপদ আবাস, সুরম্য মযবুত অট্টালিকা, আরো কতো নিয়ামতরাজি! জান্নাতের জন্য মর্যাদার বিষয় হলো, তা পেতে হলে 'জান্নাতের একমাত্র মালিক' আল্লাহর কাছেই হাত পাততে হয়। কত মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত

সে স্থান, যেখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর হাত মুবারক দ্বারা গাছ রোপণ করেছেন এবং যা তাঁর বন্ধুদের অবস্থানস্থল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাঁর রহমত, দয়া, করুণা ও সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন। তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, তা লাভ করা অত্যন্ত কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বিষয়। সেখানে যে একবার প্রবেশ করবে অনন্তকালের জন্য, চিরদিনের জন্য প্রবেশ করবে। তার রাজত্ব হলো বিশাল রাজত্ব। সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গল তাতে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও বিপদ-আপদ হতে তাকে পবিত্র রাখা হয়েছে।

বন্ধু! যদি তুমি তার মাটি সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার মাটি হবে কস্তুরির ও যাফরানের।

যদি তার ছাদ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে রাখ, তার ছাদ হবে আল্লাহর আরশ।

যদি তুমি তার বিছানা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার বিছানা হল সুবাস ছড়ানো কস্তুরি।

যদি তার পাথর কণা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হলো মুক্তা।

যদি তার অট্টালিকা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার একটি ইট হবে স্বর্ণের, আরেকটি ইট হবে রৌপ্যের।

যদি তার তাঁবু ও গম্বুজ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার তাঁবু হবে ষাট মাইল দীর্ঘ ফাঁপা, মুক্তা দ্বারা নির্মিত।

যদি তার গাছ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার প্রত্যেকটি গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, কাঠের নয়।

যদি তার ফল সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার ফল হবে মটকার ন্যায় বৃহদাকারের ও পনীর অপেক্ষা অধিক কোমল এবং অমৃত অপেক্ষা অধিক মিষ্ট।

যদি তার পাতা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার পাতা হবে সূক্ষ্ম কাপড়ের জোড়া হতেও অত্যাধিক সুন্দর।

যদি প্রবাহিত মৃদু সমীরণের ফলে বৃক্ষের পল্লব হতে সৃষ্ট সুর সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে সুমিষ্ট সুরেলা আওয়ায, যা শ্রোতাদের বিমুগ্ধ ও আবিষ্ট করবে।

যদি তার গাছের ছায়া সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, সেখানে এমন এক গাছ রয়েছে, যার ছায়ায় দ্রুতগামী আরোহী একশত বছরে ভ্রমন করেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।

যদি তার নদীসমূহ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাতে এমন দুধের নহর রয়েছে, যার স্বাদ কখনো বিকৃত হবেনা। এছাড়াও আছে মধুর নহর। এমন খাঁটি শরাবের নহর রয়েছে, যা পানে পানকারী পরিতৃপ্ত হয়, কখনো মাতাল হয়না। ও তাতে স্বচ্ছ অমৃতের নহর রয়েছে। তুমি যখন যেদিকে ইচ্ছা তাদেরকে প্রবহমান করতে পারবে।

যদি তার খাদ্য সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে জান্নাতীদের নিজস্ব পছন্দমত ফল ও তাদের রুচিসম্মত পাখির গোশত। সেখানে তোমাকে রান্না করতে হবে না। উড়ন্ত পাখি দেখে তোমার

আহারের চাহিদা হলেই তা ভুনা হয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবে। সেখানে তোমার মলমূত্রের ঝামেলা নেই। একটি ঢেকুর তুললেই সব হজম হয়ে যাবে।

যদি তার পানীয় সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার পানীয় হবে অমৃত সুধা, আদ্রক ও কর্পূরের।

যদি তার বাসন পত্র সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে আরশির ন্যায় স্বচ্ছ স্বর্ণ-রৌপ্যের।

যদি তার দরযার প্রশস্ততা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার দরযার দু'কপাটের মধ্যে চল্লিশ বছরের দূরত্বসম ব্যবধান থাকবে। তবে এমন একদিন আসবে, যেদিন প্রচণ্ড ভীড়ের দরুন তাকে রুদ্ধ দ্বারের ন্যায় মনে হবে।

যদি তার প্রশস্ততা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তির লাভকৃত স্থানের পরিধিও দশ দুনিয়ার সমান হবে এবং তা এ পরিমাণ বিশাল হবে যে, তার রাজত্ব, সিংহাসন, প্রাসাদ ও উদ্যানে দ্রুতগামী আরোহী দু'হাজার বছর ভ্রমন করেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।

যদি তার উচ্চতা সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে আকাশের প্রান্তে উদিত বা অস্তমিত নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি দাও, যা দৃষ্টিসীমার বহু উর্ধ্বে।

যদি তার অধিবাসীদের পোশাক সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে রেশম ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরী।

যদি তার বিছানা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার বিছানার চাদর হবে পুরু রেশমের, যা উঁচু স্থানে বিছানো থাকবে।

যদি তার খাট সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার খাট হবে রাজকীয় খাট, তার উপর স্বর্ণের বোতাম বিশিষ্ট মশারি থাকবে। যাতে কোনো ছিদ্র থাকবে না।

সেখানে তোমার চেহারা কেমন হবে যদি সে সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তোমার মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো। তাছাড়া সেখানে একটি বাজার আছে, সেখানে অনেক সুন্দর, সুদর্শন চেহারার ছবি থাকবে, তুমি যেমনটি চাবে তোমার চেহারা তেমনি করে দেয়া হবে।

যদি তুমি সেখানে তোমার বয়স কেমন হবে সে সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, সেখানে তুমি হবে ৩৩ বছরের তরুণ এবং তোমার অবয়ব হবে আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের অবয়বের ন্যায়।

যদি তার সঙ্গীত সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, সেখানে হূরে ঈ'ন সংগীত গাবে। ফিরিশতা ও আম্বিয়ায়ে কিরামের সুর আরো সুমিষ্ট হবে আর আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে যে সম্বোধন করবেন, তা পূর্বের সবকিছু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট হবে।

যদি তুমি জান্নাতীদের বাহন সম্পর্কে জানতে চাও, যার উপর আরোহণ করে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করবে, তবে জেনে নাও, তা হবে অত্যন্ত উন্নত জাতের অশ্ব। যেখানে তারা চাইবে সেগুলো তাদেরকে চোখের পলকে সেখানে নিয়ে যাবে।

যদি তাদের অলংকার সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাদের অলংকার হবে মুক্তাখচিত স্বর্ণের কংকণ আর তাদের মাথায় মুকুট থাকবে।

যদি তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত সেবকদের সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাদের সেবক হবে বিক্ষিপ্ত মুক্তা সদৃশ চির কিশোর।

বন্ধু! তুমি কি জান, জান্নাতের সবচেয়ে বড় ও মহান নিয়ামতটি কি? সবচেয়ে উপভোগ্য ও আনন্দের বিষয়টি কি?

হ্যাঁ, সেটি হলো আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দীদার (দর্শন)। জান্নাত প্রত্যাশীদের এটিই চূড়ান্ত লক্ষ্য। জান্নাত প্রত্যাশাকারীদের এটিই প্রত্যাশা করা উচিত। অগ্রগামীদের এরই প্রতি অগ্রগামী হওয়া উচিত। আমলকারীদের এ উদ্দেশ্যেই আমল করা চাই। জান্নাতীরা এ নিআমত লাভ করার পর জান্নাতের অন্য সকল নিআমতের কথা ভুলেই যাবে। এ নিআমত থেকে বঞ্চিত হওয়াই জাহান্নামীদের সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি।

সেদিন কেমন হবে, যেদিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে দর্শন দিবেন, সুতরাং তোমরা তার দর্শন লাভে এসো। তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। তারা ক্ষিপ্রগতিতে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের জন্য প্রস্তুত হবে। তারা অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে 'আফীহ' প্রান্তরে পৌঁছবে আর সেখানেই তারা সকলে সমবেত হবে।

আল্লাহ তাআলা তখন কুরসী রাখার নির্দেশ দিবেন। তা তখন সেখানে রাখা হবে। জান্নাতীদের জন্য সেখানে নূরের মুক্তার পোখরাজ ও স্বর্ণের

মিম্বর স্থাপন করা হবে। সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তিও সেদিন কস্তুরির টিলায় বসবে। সে অন্যদেরকে নিজের তুলনায় অধিক নেআমত লাভকারী মনে করবে না; স্বস্তির সাথে বসবে। তারা সে হালতে থাকা অবস্থায়ই একটি নূর প্রলম্বিত হতে দেখবে। তখন তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে, আল্লাহ তাআলা উপর থেকে জান্নাতীদেরকে ঝুঁকে দেখছেন (তাঁর শান মোতাবেক)। এরপর বলবেন, হে জান্নাতীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি! জান্নাতীরাও এমন ভাষায় জবাব দিবে, যার চেয়ে সুন্দর আর জবাব হতে পারে না-

اللهم انت السلام و منك السلام- تباركت ذو الجلال والاكرام

"হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, শান্তি আপনার পক্ষ হতেই। হে মহৎ ও মহান! তোমার সত্তা কতইনা মহান।"

আল্লাহ তাআলা তাঁর বড়ত্বের পর্দা সরিয়ে তাদের সামনে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় দৃশ্যমান হবেন। আজ হলো ইয়াওমুল মাযীদ (অতিরিক্ত প্রতিদান প্রাপ্তির দিন)। সেদিন আল্লাহ তাআলার নূর জান্নাতীদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। যদি তাদেরকে ভস্মীভূত না করার ফয়সালা হত, তবে সকলে ভস্মীভূত হয়ে যেত। আহ্! সেদিন কী শ্রুতিমধুর বাক্যালাপ ও মধুময় আলোচনা হবে আমার রবের সাথে! মহান প্রভুর দীদার আর তাঁর সাথে কথোপকথনে তনু-মনে সে কী আলোড়ন সৃষ্টি হবে! আফসোস সে সকল লোকদের জন্য, যারা লাঞ্ছনাময় ক্ষতিগ্রস্ততার সওদা নিয়ে প্রভু মহানের দরবারে উপস্থিত হবে। "সেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর কিছু মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে

পড়বে, আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে।" (সূরা কিয়ামাহ: ২২-২৫)

এসো হে বন্ধু! এসো তুমি চিরস্থায়ী উদ্যানে, এটাই তোমার উত্তম গন্তব্য, তাতে রয়েছে তোমার প্রভুর দীদার আর তাঁবুতে অপেক্ষমান সুরক্ষিতা হূর। কিন্তু আমরা তো হলাম শত্রুর বন্দিশালায় আবদ্ধ, তবে কি তুমি মনে কর, তুমি শয়তানের কারাগার হতে মুক্ত হয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে?

ওহ্হো, বন্ধু! একটা বিষয় বাদ পড়ে গেল, বলতো সেটি কি? জান্নাতী স্ত্রীদের বর্ণনা, হূরে ঈ'নদের বর্ণনা। দুঃখিত বন্ধু! চলো সামনে অগ্রসর হই।

হুরে ঈ'নের প্রেমিকরা কোথায়?

বন্ধুরা! আপনাদেরকে এখন নিয়ে যাবো জান্নাতের পরম রোমান্টিক এক জগতে। প্রত্যেক যুবকেরই যার আশা করা উচিত এবং এর জন্য জীবন দিয়ে হলেও প্রতিযোগিতায় নেমে পড়া উচিত। তার আগে-

যে সত্তা আমাদেরকে এর সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর বড়ত্ব, মহত্ত্ব, সত্যবাদিতার ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন। এমনি ভাবে সে সত্ত্বার কথাও চিন্তা করুন, যাকে আমাদের নিকট এ সুসংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং সে বস্তুর সংবাদ দিয়েছেন তার পরিমাণের ব্যাপারেও চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তাআলা সামান্য বস্তুর বিনিময়েই আমাদের জন্য এ মহান নিয়ামত

লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আর এই সুসংবাদ কোথায় দেয়া হয়েছে? কুরআন কারীমে। কুরআন কারীমের সত্যতার উপর কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি? আপনাদের কি মনে আছে-

"আল-কুরআনে এক অত্যাশ্চর্য সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জাল পাতা রয়েছে যা অতি অভিনব, অতিশয় বিস্ময়কর এবং যে কোনো সৃষ্টির পক্ষে তা অনুকরণের ক্ষমতা বহির্ভূত। এটি "১৯" সংখ্যার সুদৃঢ় বুনন। এ সম্পর্কে রায় দিয়েছে সর্বাধুনিক কম্পিউটার। বিশ্বে পড়েছে এক বিপুল সাড়া। কুরআন কারীমে যে সব নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলা মানা হয়েছে, "১৯" সংখ্যার জটিল জালকে এঁটে দেয়া হয়েছে এর মধ্যে- তেমনিভাবে সমশব্দে সম বাক্যসংখ্যায় সমানসংখ্যক অক্ষরে একটি অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন পড়ত ৬.২৬×১০^{২৬} বছর। কত এর মান উল্লিখিত সেপটিলিয়ন সংখ্যাটির? এর পরিমাপ ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন এবং তা অনুধাবনের অনেক বাইরে। সংখ্যাগতভাবে এর প্রকাশ ৬২৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (৬২৬ এর পর ২৪ টি শূণ্য)। বর্তমানে পৃথিবীর বয়স মাত্র ৪৫০,০০০০০০০ (৪৫০ কোটি) বৎসর। আমরা যদি আজকের দুনিয়ার ৫০০ কোটি মানুষকে পৃথিবীর জন্মলগ্ন হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই যামানার সকল প্রযুক্তি নিয়ে অনুরূপ একখানি গ্রন্থ লেখার কাজে নিয়োজিত বলে ধরে নেই, তবে উক্ত কম্পিউটার লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মানুষ জাতির এই মহাসম্মিলন প্রসূত কাজের অগ্রগতির মান হবে ৪৫০,০০০০০০০ $\times$ ৫০০,০০০০০০০ = ২২৫×১০^{১৭} কর্ম বছর যা সেপ্টিলিয়ন সংখ্যাটির একশ কোটি ভাগের মাত্র ৩৫ ভাগের সমান, যা হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট

একটি নুড়ির মত তুল্য হবে। আর এ প্রকল্পের শর্ত হলো এই যে, প্রতিটি মানুষেরই আয়ুষ্কাল ৪৫০ কোটি বছর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এই সময়ের মাঝে তারা অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না। সুব্হানাল্লাহ!!!

(এই সম্পর্কে আমি আমার প্রথম কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

মনে হয় আজকের কম্পিউটার শুধু এই সত্যই আবিষ্কার করেছে, যেই চ্যালেঞ্জ মানবজাতিকে ছুড়ে দেয়া হয়েছিল ১৪০০ বছর পূর্বে-

"(হে মুহাম্মাদ) বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবকুল ও জ্বীন জাতি সমবেত হয় পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায়, তবু তারা তা সম্ভব করতে পারবে না।" (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল :৮৮)।

"বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লিখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবুও আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, যদিও অনুরূপ আরো অন্যান্য সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনয়ন করা হয়।" (১৮ সূরা কাহাফঃ ১০৯)।

বন্ধুরা! আসমানী এই গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে এবং মুমিনদের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে-

- "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা রূপে যা দেওয়া হতো এ তো তাই; তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (সূরা বাকারা ২:২৫)

- "মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে; আমি তাদেরকে সঙ্গিনী দান করব আয়তলোচনা হূর।" (সূরা দুখান ৪৪:৫১-৫৪)
- "(জান্নাতের নেয়ামতরাজির মধ্যে) রয়েছে বহু আনত নয়না হুর, যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে। প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ।" (সূরা আর রহমান ৫৫: ৫৬-৫৯)
- "তথায় (জান্নাতে) থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ৫৬: ২২-২৩)
- "সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ।...তাবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। (সূরা আর রহমান ৫৫: ৭০,৭২)
- "আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। কামিনী, সমবয়স্কা।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ৫৬: ৩৫-৩৭)
- "পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য, উদ্যান, আঙ্গুর, স্ফীত বক্ষ বিশিষ্ট, পূর্ণযৌবনা তরুণী।" (সূরা নাবা ৭৮: ৩১-৩২)
- "এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।" (সূরা আত্-তাতফীফ ৮৩:২৬)

হুরে ঈ'ন এর বর্ণনাঃ

কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত, অসংখ্য হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তি হতে হূরের যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলোকে একত্র করে নিম্নে দেয়া হলো-

বন্ধু! তুমি কি হূরে ঈ'ন সম্পর্কে জানতে চাও?

- "হুরে ঈ'ন" বলা হয় সেই সকল সমবয়স্কা জান্নাতী স্ত্রীদের, যারা হবে সুন্দরী, রূপবতী, শুভ্র মুখাবয়ব বিশিষ্টা, কাজল কালো ডাগর ডাগর চক্ষুওয়ালা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুমিন পুরুষদের জন্য যাফরান দ্বারা বিশেষভাবে জান্নাতের অভ্যন্তরেই সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে দেখলে দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, যার মুখমণ্ডলের আলোক, ঔজ্জ্বল্য ও বিভার দরুন তাদের চেহারার প্রতি (পার্থিব চক্ষু দ্বারা) দৃষ্টি দেওয়া যাবে না। যাদের চোখের সাদা অংশ পূর্ণরূপে সাদা এবং কালো অংশ পূর্ণরূপে কালো থাকবে। তাদের স্বচ্ছতা হবে শঙ্খের খোলসে অবস্থিত মুক্তার মত, যাকে কেউ স্পর্শ করেনি। তাদের শরীরের বর্ণ হবে পদ্মরাগ মণি ও প্রবাল সাদৃশ্য।
- তাদের গায়ের সত্তর জোড়া রেশমী পোশাকের অভ্যন্তর হতেও তাদের পায়ের গোড়ালির মজ্জা পরিলক্ষিত হবে।
- তারা হবে গোলাকৃতির স্ফীত বক্ষবিশিষ্ট তরুনী, তাদের স্তন পুষ্ট আনারের ন্যায় উদভিন্ন থাকবে, নিজের দিকে ঝুলন্ত থাকবে না।
- তাদের কোমল ত্বক ও রূপ-লাবণ্যের দরুন দৃষ্টি মুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়ে পড়বে। তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী তাদের হৃদয়ে আপন ছবি

দেখতে পাবে, যেমনিভাবে আয়নায় দেখতে পায়। জান্নাতী তার স্ত্রীর গণ্ডদেশে তাকালে তাতে নিজ মুখমণ্ডল আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখতে পাবে।

- তারা হবে উত্তম গুণাবলিসম্পন্না, উন্নত চরিত্রওয়ালী, সুশীলা এবং কমনীয়া নারী, যারা একমাত্র স্বীয় স্বামীর দিকেই আপন দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখবে। তারা তাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় একমাত্র নিজ স্বামীর জন্য আসন নির্ধারিত করে রাখবে, নিজ স্বামীর জন্যই সংরক্ষিতা থাকবে, তারা স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রত্যাশা করবে না এবং স্বামী ব্যতিত অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না।
- তারা যখন এক প্রাসাদ হতে আরেক প্রাসাদে স্থানান্তরিত হবে, তখন মনে হবে, এক রবি আকাশের কক্ষপথে স্থানান্তরিত হচ্ছে।
- যদি কোনো জান্নাতী হূর পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে দেখত কিংবা আকাশের নিচে তার হাত প্রসারিত করতো, তবে সমগ্র দুনিয়া সুগন্ধিতে সুরভিত হয়ে যেত, সমগ্র পৃথিবী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যেত এবং সকল মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। সূর্য তার আভার সামনে ঠিক তেমনি মনে হতো যেমনিভাবে সূর্যের কিরণের সামনে চেরাগ/কুপিবাতি হয়। তার মাথায় ব্যবহৃত ওড়না দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু হতে উত্তম।
- জান্নাতের হুর যদি সাত সমুদ্রেও থুথু নিক্ষেপ করে, তবে তার মুখের মধুরতায় সমগ্র সমুদ্রের পানি মিষ্ট হয়ে যাবে।
- জান্নাতে এক প্রলম্বিত আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হলে জান্নাতীগণ মাথা উঠিয়ে দেখবে, তখন অনুসন্ধান করে তারা জানতে পারবে, এ হচ্ছে সে হূরের দাঁতের আলোকরশ্মি, যে আপন স্বামীর সাথে হাসছে।

- তাদেরকে জীন ও মানুষের কেউ কখনো ইতোপূর্বে সম্ভোগ করেনি।
- তারা মুক্তামালার তাঁবুতে অবস্থান করবে। তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন তাঁবু থাকবে। প্রত্যেক তাঁবুর চারটি দরজা থাকবে। প্রত্যহ প্রত্যেক দরযা দিয়ে ফিরিশতাগণ এমন সব উপহার ও সম্মাননা নিয়ে প্রবেশ করবে যা সে ইতোপূর্বে লাভ করেনি।

বলতো বন্ধু! একটি মেয়েকে কখন বেশি সুন্দর লাগে?

- জান্নাতের হুরদের মাঝে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা শতভাগ বিদ্যমান থাকবে। যেমন:

  ক. নারীদের চারটি অঙ্গের সংকীর্ণতা পছন্দনীয়: মুখ, নাকের ছিদ্র, কানের ছিদ্র ও লজ্জাস্থান।

  খ. আর চারটি অঙ্গের প্রশস্ততা পছন্দনীয়: মুখমণ্ডল, বক্ষস্থল, উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থল ও কপাল।

  গ. আর চারটি অঙ্গের শুভ্রতা পছন্দনীয়: বর্ণ, মাথার সিঁথি, দন্ত এবং চোখের সাদা অংশ অত্যন্ত সাদা হওয়া।

  ঘ. আর চারটি অঙ্গের কৃষ্ণতা পছন্দনীয়: চোখের কালো অংশ অত্যন্ত কালো হওয়া, চোখের ভ্রূ, চোখের পলক ও চুল।

  ঙ. আর চারটি অঙ্গের দীর্ঘতা পছন্দীয়: দেহের উচ্চতা, ঘাড়ের দীর্ঘতা, চুলের দীর্ঘতা এবং আঙ্গুলের দীর্ঘতা।

  চ. আর চারটি অঙ্গের ন্যূনতা অর্থাৎ ছোট হওয়া পছন্দীয় (এটা বাহ্যিকতার দিক থেকে নয়, বরং তাৎপর্যতার দিক হতে): যবান (স্বল্পভাষী হওয়া), হাত (স্বামীর অপছন্দীয় বস্তু না স্পর্শ করা), পা (ঘর

হতে বাহির না হওয়া/পর্দা করা) ও চোখ (কোনো কিছুর প্রতি লোলূপ দৃষ্টি না দেয়া/ অল্পেতুষ্টি)।

ছ. আর চারটি অঙ্গের ক্ষীণতা (চিকন হওয়া) পছন্দনীয়: কোমর, মাথার সিঁথি, ভ্রূ এবং নাসিকা।

বল বন্ধু! সৌন্দর্যের এই পূর্ণতা পৃথিবীর কোনো নারীর মাঝে পাওয়া যাবে কি? সুতরাং এই সৌন্দর্য কোনো পার্থিব নারীর মাঝে তালাশ করা নিরর্থক ও বোকামী।

বন্ধু, তুমি কি জান, হূরে ঈ'নগণ হবে সকল অপবিত্রতা হতে মুক্ত হবে?

- সে সকল রমণীরা কখনো অস্থির ও চিন্তাক্লিষ্ট হবে না। (যেন তাদের স্বামীরা তাদেরকে দেখে চিন্তাক্লিষ্ট ও অস্থির না হয়ে পড়ে।) তাদের দীর্ঘ কথা বিরক্তিকর হবেনা, শ্রোতারা তাদের কথা সংক্ষিপ্ত করতে বলবেনা। বরং এমন স্বাদ ও তৃপ্তিময় কথা, গীত-সংগীত শ্রোতারা শুধু শুনতেই চাইবে। তাদের শরীর কখনো দুর্গন্ধযুক্ত হবে না এবং তাদের মুখ হতেও দুর্গন্ধ বের হবে না। তারা মাসিক ঋতুস্রাব, প্রসূতি পরবর্তী রক্তস্রাব, প্রস্রাব-পায়খানা, নাকের শ্লেষ্মা, থুথু ইত্যাদি সকল প্রকার ময়লা থেকে পবিত্র হবে এবং যাবতীয় মেয়েলী দোষ-ত্রুটি, কু-স্বভাবসমূহ থেকে মুক্ত হবে। তাদের বীর্য স্খলিত হবে না, মযীও বের হবে না। তারা সন্তানও জন্ম দিবে না। এক কথায় তারা হবে অনিন্দ্য সুন্দরী ও গুণবতী জান্নাতী স্ত্রী। তাদের পোশাক কখনো মলিন হবে না, তাদের রূপ-লাবণ্য কখনো হ্রাস পাবেনা। তাদের রূপে জান্নাতের প্রাসাদসমূহও আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাবে।

বন্ধু! তুমি কি হূরে ঈ'ন অপেক্ষা সুন্দরী হূর চাও?

- জান্নাতে **লু'বা** নামের কিছু হূর রয়েছে, যাদের সৌন্দর্যতা ও কমনীয়তা দেখে জান্নাতের অন্য সকল হূর বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। তার রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে অন্যান্য জান্নাতবাসী গৌরব করে থাকে। যদি জান্নাতবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার এমন ফয়সালা না হত যে, তারা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না, তবে তার সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য সহ্য করতে না পেরে অন্যরা মৃত্যুমুখে পতিত হতো।

হূরে ঈ'নগণতো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে....

- হূর জান্নাতের দ্বারে স্বীয় স্বামীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে, বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গেল আমরা তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলাম। আমরা সর্বদাই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। এবং সর্বদা এখানে অবস্থান করবো, কখনো এখান হতে অন্য কোথায়ও যাবো না এবং আমরা চিরকাল থাকব, কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। তোমরা যত প্রকার স্বর শুনেছ তাদের স্বর তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট হবে। সে বলবে, তুমি আমার প্রিয় আর আমি তোমার প্রেয়সী।

তুমি কি জান্নাতী রমণীদের গান-বাদ্য ও নৃত্য উপভোগ করতে চাও না?

- দুনিয়ার যেসব নারীরা জান্নাতে যাবে, তাদের মর্যাদা ও সৌন্দর্য হবে জান্নাতের হুরদের চেয়ে বেশি। যেমনিভাবে আবরণী বস্ত্র অপেক্ষা

আবরণীর বস্তুগুলো উত্তম। কেননা, দুনিয়াতে তারা নামায, রোযা, পর্দা, স্বামীর খেদমত করেছে, কষ্ট ভোগ করেছে, স্বামী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হলে ধৈর্য ধারণ করেছে। জান্নাতে তাদের শরীরের বর্ণ হবে শুভ্র, রেশমী পোশাক হবে সবুজ, অলংকার হবে হলদে, সুগন্ধিময় ধোঁয়া নির্গত হবে (কাঠের পরিবর্তে) মুক্তা হতে এবং তাদের কাঁকন হবে স্বর্ণের। তারা এবং অন্যান্য হূরেরা গাইতে থাকবে- "আমরা চিরস্থায়ী; আমরা মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা ঐশ্বর্যশালী; তাই আমরা কখনো দুরবস্থা ও দুঃখ দুর্দশার শিকার হবো না। আমরা সদা অবস্থান কারিনী; কখনো আমরা স্থানান্তরিত হবো না। আমরা সদা উৎফুল্ল ও সন্তুষ্ট থাকব, কখনো বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট হবো না। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যার জন্য আমরা হবো আর যে হবে আমাদের জন্যে।"

- জান্নাতে একটি দীর্ঘ নদী রয়েছে, যার উভয় পার্শ্বে কুমারী মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা সুরেলা কণ্ঠে গীত গাইবে। মানুষ যখন শুনবে, তারা তখন তাতে এমন স্বাদ ও তৃপ্তি পাবে, যা তারা জান্নাতের অন্য কোনো বস্তুতে পায়নি।

হূরে ঈ'নদের সাথে সহবাসের মুহূর্তটি কেমন হবে বলতো বন্ধু?

- তারা হবে স্বামী সোহাগিনী, সহবাসের সময় স্বামীর সামনে উত্তম ভঙ্গিতে শয়নকারিনী ও নম্রতা প্রদর্শনকারিনী। প্রত্যেক স্ত্রীর যোনি হবে অত্যন্ত কামোত্তেজনাপূর্ণ। তারা হবে স্বামীর প্রতি আসক্ত, অনুরক্ত, আদরিনী, চিত্তমুগ্ধকারিনী, মিষ্টভাষী, সাজ-সজ্জাকারিনী, তারা হবে মনমোহিনী, অত্যন্ত কামোদ্দীপ্ত ও কামিনী। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌনরস ধাবমান থাকবে। যখন সে আলিঙ্গন করবে তখন সে দৃশ্য

কতই না চমৎকার হবে, যখন সে চুম্বন করবে, তখন তাদের কাছে সে চুম্বন অপেক্ষা তৃপ্তিদায়ক ও উপভোগ্য আর কিছুই হবে না।

- জান্নাতী ব্যক্তির অন্যতম মধুরতম প্রত্যাশা হবে সে সকল রমণীদের মিলন। তারা কুমারী হুরদের সাথে স্ত্রী-সহবাস করবে এবং ধাক্কা দেওয়ার ন্যায় লাফিয়ে লাফিয়ে, পশ্চাতে সরে সরে পূর্ণ শক্তিতে সহবাস করবে। সে ব্যক্তি যখন হূরের নিকট হতে চলে আসবে তখন সে হূর পূর্বের ন্যায় পবিত্র ও কুমারী হয়ে যাবে। জান্নাতী পুরুষরা এমন পুরুষাঙ্গ দ্বারা সহবাস করবে যাতে কোনো প্রকার নিস্তেজভাব থাকবে না এবং ক্লান্তি আসবে না এবং কামভাব এমন হবে যা কখনো দমে যাবে না, শেষ হবে না এবং ধাক্কা দেওয়ার ন্যায় পূর্ণ শক্তিতে সহবাস করবে। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী কারোরই বীর্যপাত হবে না। ফলে তাদের গোসল ও পবিত্রতার প্রয়োজন হবে না। কামোত্তেজনা তাদের শরীরে সত্তর বছর পর্যন্ত ঘূর্ণন করবে এবং এর দ্বারা সে তৃপ্তি উপভোগ করবে। সঙ্গম তার একমাত্র স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের জন্যই হবে। এটি এমন এক নিয়ামত, যাতে কখনো বিপদ আসবে না। মানুষের মধ্যে সফলকাম এবং পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে এ পার্থিব জগতে নিজেকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে, নিচের চোখের হেফাযত করবে, গুনাহ করবে না, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা হালাল করেছে তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকবে।

- প্রত্যেক পুরুষকে একশজন পুরুষের যৌনশক্তি দেয়া হবে, তার পুরুষাঙ্গ নিস্তেজহীন অবিরাম শক্তিধর হবে। ফলে একজন জান্নাতী দিনে কমপক্ষে একশতবার কুমারী সহবাস করতে পারবে। প্রতিবার সহবাসের পর পরই স্ত্রীর যোনি কুমারীর ন্যায় হয়ে যাবে।

তুমি কতজন হূর চাও বন্ধু?

- প্রত্যেক জান্নাতীকে দুই থেকে বাহাত্তর বা তদোর্ধ্ব সংখ্যক হুর দেয়া হবে। এদের মধ্যে দুই জন হবেন দুনিয়ার স্ত্রীলোক, বাকীরা হবেন জান্নাতী হুর। এক হাদীসে এসেছে, প্রত্যেক জান্নাতী চার হাজার কুমারী, আট হাজার বিধবা ও এক শত হূরে-ঈ'ন বিবাহ করবে। (সুব্হানাল্লাহ্)
- একটি মেঘমালা জান্নাতীদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে এবং জান্নাতীদের লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা কে কোন্ বস্তুর বৃষ্টি চাও? তখন তারা যে বস্তুর বৃষ্টি প্রত্যাশা করবে সে বস্তুর বৃষ্টিই বর্ষিত হবে। তখন অনেক জান্নাতী মেঘমালাকে সুদর্শনা, সুসজ্জিতা, কমনীয়া কুমারী বর্ষণ করতে বলবে।
- জান্নাতে বাইদাখ নামক এক নদী আছে। তার উপরে পদ্মরাগমণির গম্বুজ রয়েছে এবং তার তলদেশের মৃত্তিকা হতে হূর সৃষ্টি করা হয়। জান্নাতীগণ বলবে, আমাদেরকে বাইদাখ নদীর কাছে নিয়ে চল। তখন তারা সেখানে এসে সে সকল কুমারীর প্রতি অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি দিবে। তাদের কারো সে কুমারীদের কাউকে পছন্দ হলে তার হাতের কব্জি স্পর্শ করলেই তার পেছনে পেছনে চলে আসবে।

[সূত্র: ইমাম কায়্যিম জাওযিয়্যাহ রহ. রচিত حادي الأرواح الى بلاد الأفراح কিতাব হতে সংকলিত]

হুরের বয়ান কেন করা হলো?

'মুসলিম যুবশক্তি' ইসলামের একটি বড় শক্তি, বিশাল বাহুবল। মুসলিম যুবসমাজ যতদিন আল্লাহ তাআলাকে চিনেছে, দুনিয়াকে চিনেছে, জীবন-মৃত্যুর হাকীকত অনুধাবন করেছে, আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্টি করতে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে হুরে ঈ'নের আশেক হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজের বুকের তাজা রক্ত আল্লাহর রাহে ঢেলে দিয়েছে, ততোদিন পর্যন্ত ইসলাম পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করেছে। মুসলমানদের দিকে কেউ কখনো চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়নি। বাতিল বারবার হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, একজন মুসলিম নারীকে উত্যক্ত করার ফলাফল দাঁড়াবে, লাখো মুহাম্মাদ বিন কাসীমের আবির্ভাব। কিন্তু হায়! আজ মুসলিম যুবকরা কোথায়? তারা আজ কোথায় হারিয়ে গেলো? কোন্ জিনিস তাদেরকে গলা টিপে হত্যা করেছে? কোন্ জিনিস তাদেরকে নারীদের চেয়েও কাপুরুষ বানিয়ে ফেলেছে? কোন্ জিনিসের পিছনে সে তার জীবন, যৌবন আর মূল্যবান সময় ও অর্থ নষ্ট করছে? কোন্ জিনিসের কারণে সে আজ শাহাদাতের পরিবর্তে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে? কোন্ জিনিস তাকে কূপমুণ্ডুক আর অপদার্থ বানিয়ে কুফ্ফারদের মানসিক দাসে পরিণত করেছে? কেন সে সারারাত জেগে মোবাইল, কম্পিউটার, ফেইসবুক, মুভ্যি, ইন্টারনেট আর পর্ণগ্রাফী দেখে? কোন্ জিনিসের কারণে জান্নাতী হূরদের চিন্তা ছেড়ে পশ্চিমা নাপাক নগ্ন নারীদের দেখে তৃপ্তি লাভ করছে? কিসের কারণে তারা প্রেম ও ভালোবাসার নামে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে? কেন তারা নিজের ঘরে স্ত্রী রেখে পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হচ্ছে? কিসের কারণে তারা আজ অসীম নিয়ামতের জান্নাত থেকে দূরে

সরে গিয়ে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে? কারণ একটাই। নারীর ফেতনা! বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কর্তৃত্ব ধ্বংস করতে ত্বগুতী শক্তি সুকৌশলে সর্বপ্রথম যে হাতিয়ার গ্রহণ করে তা আর কিছুই নয়, এই "নারীর ফেতনা"! ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে। তাই আজ সময় এসেছে, মুসলমান যুবকদেরকে দুনিয়ার গান্ধা-পঁচা পশ্চিমা পতিতাদের হাত হতে উদ্ধার করে চিরস্থায়ী জান্নাতী হূরদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার।

হে মুসলিম যুবক ভাইয়েরা! না, তোমরা এমন কাজ করো না, যার কারণে তোমাদেরকে জান্নাতী হূরদের হারাতে হয়। আল্লাহর কসম, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, হূর সত্য, হূরের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে? আল্লাহর রাসূলের চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে? কুরআনের চেয়ে অধিক সত্য বাণী আর কী আছে? তাই স্মার্ট-ফোন ছাড়, কুরআন ধর, বাতিলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর, শাহাদাতের অমীয় সুধা পান কর। তোমার জন্যে, হ্যাঁ, শুধু তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে হূরে ঈ'ন, হূরে লু'বা! তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে জান্নাতের দ্বারে অপেক্ষমান রয়েছে তারা! তাই আর চোখের গুনাহ নয়, মনের অশ্লীল কল্পনা নয়, যৌনাঙ্গের হেফাযত করে চলো সবাই শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ময়দানে। না'রায়ে তাকবীর! আল্লাহু আকবার!

কবে দেখা হবে আমাদের প্রতীক্ষিত হূরদের সাথে?

এটি তো বহু দূরের এবং কঠিন বিষয়! কেননা, মৃত্যু থেকে শুরু করে জান্নাত পর্যন্ত অনেক স্তর পার হতে হবে আর প্রতিটি স্তরেই একদিন, দুই দিন নয়, হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে। যেমন: কিয়ামতের দিন সর্বশেষ যে ব্যক্তিটি মৃত্যুবরণ করবে, তাকেও মৃত্যুর পর হতে পুনরুত্থান পর্যন্ত কমপক্ষে চল্লিশ হাজার বছর বরযখে থাকতে হবে। এরপর কিয়ামতের ময়দানের পঞ্চাশ হাজার বছর। অতঃপর পুলসিরাতের ত্রিশ হাজার বছর। এরপর হয় জান্নাত, না হয় জাহান্নাম। যদি গোনাহের কারণে জাহান্নামে যেতে হয়, সেখান হতে মুক্তি যে কবে মিলবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। কেননা এক ওয়াক্ত নামায কাযা করার দরুনই যদি দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর জাহান্নামে থাকতে হয়, তাহলে সকল গুনাহের দরুন কত কোটি বছর জাহান্নামে থাকতে হবে? এরপর যদি মুক্তি মিলে তাহলে জান্নাতে যাওয়া হবে, অবশেষে হূরে ঈ'নদের দেখা মিলবে। আর পৃথিবীর সর্বশেষ ব্যক্তি এক চান্সে জান্নাত পেলেও তো হূরদের সাথে তার সাক্ষাতের সর্বনিম্ন সময়সীমা হচ্ছে, ৪০,০০০+৫০,০০০+৩০,০০০ বছর = ১,০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার বছর)। আহ্! কেম্‌নে কী? এত দীর্ঘ সময় পর হূরদের সাথে সাক্ষাৎ মিলবে, তা কিভাবে মানা যায়? কিভাবে এতকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব?

শুধুই কি সময়ের দীর্ঘতা, আবার প্রতিটি স্তরেই রয়েছে ভয়াবহ সব বিপদ আর মুসীবত! এতো বিপদাপদ পেরিয়ে হুরদের সাথে সাক্ষাৎ লাভ কি আদৌ সম্ভব হবে?????

মৃত্যুর ভয়াবহতাঃ

মৃত্যু একটি ভয়াবহ মসীবতের নাম। মৃত্যুর কষ্ট (সাকরাতুল মাওত) অবশ্যই আসবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু-যন্ত্রনা হইতে পানাহ চাইতেন। কেমন হবে একজন মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা? তা হবে তরবারির তিনশত আঘাতের যন্ত্রণার সমতুল্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে সহজ মৃত্যু যন্ত্রণার তুলনা এইরূপ মনে করতে পার, যেমন একটি ত্রিধার বিশিষ্ট গোক্ষুর কাঁটা কারো পায়ের মধ্যে বিঁধে গেল এবং এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে, বহু চেষ্টা ও টানাটানি করে তা খোলা সম্ভব হচ্ছে না।" মৃত্যুর সময় একজন ব্যক্তি তার শরীরে এমন কোনো একটি শিরা বা স্নায়ু নাই যাতে পৃথকভাবে সে যন্ত্রণা অনুভব না করে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হলে আল্লাহ পাক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'মৃত্যু যন্ত্রণায় তুমি নিজের অবস্থা কেমন বোধ করছ?' তিনি উত্তরে বললেন: 'যেমন জীবন্ত মোরগকে চামড়া খসিয়ে পা বেঁধে তপ্ত কড়াই এর মধ্যে ভাজা হচ্ছে, সে উড়ে পালাতে পারছে না, প্রাণও বাহির হচ্ছে না যে, যন্ত্রণার হাত হতে অব্যাহতি পেতে পারে, আমার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।' হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, 'ঘন কাঁটা বিশিষ্ট একটি শাখা কাহারও পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে এবং প্রতিটি কাঁটা দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরার মধ্যে ঢুকে গেলে, একজন শক্তিমান পুরুষ বলপূর্বক সেই শাখাটি তার পেট হতে টেনে বাহির করতে থাকলে সে ব্যক্তি যেরূপ যন্ত্রণা ও কষ্ট অনুভব করে থাকে, মৃত্যু যন্ত্রণা ঠিক তদ্রূপ।'

এছাড়াও গুনাহগার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হযরত আযরাঈল আলাইহিস্ সালাম যে ভয়ংকর রূপ নিয়ে আগমন করেন, তা স্বতন্ত্র এক আযাব।

একবার হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পীড়াপীড়ির প্রেক্ষিতে হযরত আযরাঈল আলাইহিস্ সালাম সেই মূর্তি ধারণ করেন, ফলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম দেখতে পান, তাঁর সামনে এক দীর্ঘকায় স্থুল দেহী বিকটাকার ব্যক্তি দণ্ডায়মান। তার মাথায় মোটা রুক্ষ কেশরাশি কাঁটার ন্যায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। সে কালো বর্ণের কাপড় পরিহিত। তার মুখ হতে আগুণের শিখা ও ধূঁয়া নির্গত হচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। অবশ্য নেককার লোকদের সামনে তিনি এই রূপ ধারণ করেন না।

কবরের ভয়াবহতা:

কবরের আযাব অবশ্যই সত্য, কোনো সন্দেহ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই নামায পড়তেন, আল্লাহ তাআলার নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হযরত উসমান রদিয়াল্লহু আনহু যখনই কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখনই এত কান্নাকাটি করতেন যে, (চোখের পানিতে) তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। কেউ তাকে প্রশ্ন করলো যে, কি ব্যাপার জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা হলে তো আপনি এতো কান্না করেন না, কিন্তু কবর দেখেই কেন এত কান্না করেন? উত্তরে তিনি বলতেন যে, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: নিশ্চয় কবর হলো আখিরাতের মনযিল সমূহের মাঝে প্রথম মনযিল। এই মনযিলে যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, পরবর্তী মনযিলগুলো অতিক্রম করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে কেউ ধরা পড়ে যায়, তাহলে পরবর্তী মনযিলগুলো হবে তার জন্য আরো ভয়াবহ। (তিরমিযী)

কবরে পৌঁছার সাথে সাথে প্রথম বিপদ হলো কবরে তিনটি প্রশ্ন করার জন্য মুনকার নাকীর ফেরেশতার আগমন। উক্ত ফেরেশতাদ্বয় হবেন ভীষণাকৃতির, তাদের আওয়ায হবে শত বজ্রকঠোর, ভয়ঙ্কর, চোখ দুটি হবে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় ভীষণোজ্জ্বল। তাদের ঘন কালো ও রুক্ষ চুল মাটি পর্যন্ত আলুলায়িত, লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণধার দাঁত দ্বারা কবরের মাটি ওলট-পালট করতে করতে আগমন করে হাত দ্বারা নাড়াচাড়া করে মৃত ব্যক্তিকে নানা প্রশ্ন করবে।

কবরের দ্বিতীয় বিপদ হলো, কবরের মাটি অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তিকে চাপ দিবে এবং চাপ এমন হবে যে, এক দিকের পাজরের হাড় অন্যদিকের পাজরের হাড়ের মাঝে ঢুকে যাবে।

কবরের তৃতীয় বিভীষিকা হলো, নিশ্চয় অবাধ্য ব্যক্তি ও কাফেরদের শাস্তি দেয়ার জন্য কবরের মধ্যে নিরানব্বইটি অজগর সাপ নিয়োজিত করে দেয়া হবে। কিয়ামত পর্যন্ত এরা তাকে দংশন করতে থাকবে। সেগুলো এতই বিষাক্ত যে, তাদের একটিও যদি একবার পৃথিবীর দিকে ফোঁস করে, তাহলে তার বিষক্রিয়ায় পৃথিবীতে আর একটি ঘাসও জন্মাবে না। (দারিমী)

কবরের চতুর্থ আযাব হলো, গুণাহগার ব্যক্তির নীচে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে, আগুনের তৈরি পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে দোযখের তাপ এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু তার কবরে আসতে থাকবে।

কবরের পঞ্চম ভয়াবহতা হলো, কবরবাসীদের শাস্তির জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেয়া হবে (যেন যাকে শাস্তি দেয়া হবে তার চিৎকার ও আর্তনাদ শুনে, তার অবস্থা দেখে ফেরেশতার দীলে দয়ার

উদ্রেক না হয়)। তার হাতে লোহার গুর্য বা মুগুর থাকবে, যদি তা দ্বারা কোনো পাহাড়ে আঘাত করা হয়, পাহাড়টি মুহূর্তের মাঝে মাটির সাথে মিশে যাবে। ফিরিশতা একবার সেই মুগুর দ্বারা লোকটিকে আঘাত করলে লোকটি মাটির সাথে মিশে যাবে, যার আওয়ায মানুষ ছাড়া সকল মাখলূক শুনতে পায়। এরপর পুনরায় তাকে পূর্বের ন্যায় জীবিত করে দেয়া হবে।

কবরের ষষ্ঠ প্রকারের বিপদ হলোঃ এছাড়াও আরো বিভিন্ন প্রকারের আযাব কবরে দেয়া হবে। যেমনঃ

- মিথ্যাবাদীকে লোহার চিমটা দ্বারা মস্তক ছেদন করা হবে। চিমটাটি মুখের একদিন দিয়ে ঢুকিয়ে গ্রীবা পর্যন্ত কেটে ফেলা হবে আবার অন্যদিক থেকে তাই করে। একদিক কাটতে গেলে অপরদিক ভালো হয়ে যাবে।
- বে-আমল আলেমদেরকে পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করতে থাকা হবে। ফলে আঘাত করার সাথে সাথে মাথাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং অনেক দূরে ছিটকে পড়বে। পাথর তুলতে তুলতেই মাথা আবারো আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
- অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী প্রেমিক-প্রেমিকাদের, ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিনী মহিলাদের দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে, যেটি ঠিক চুলার মতো উপরের দিক সরু আর নীচের দিক প্রশস্ত। আগুনের ঢেউয়ের সাথে লোকগুলো একবার উপরের দিকে উঠে গর্তের মুখে এসে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। আবার যখন আগুন নীচের দিকে যাবে সাথে সাথে মানুষগুলোও নীচে চলে যাবে।

এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত এই সকল প্রেমিক-প্রেমিকাদের আগুনে ভাজা হবে।

- সুদখোরদেরকে রক্তের নদীতে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাবে। সে সাঁতার কেটে কূলে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। যখনই তীরের কাছাকাছি পৌঁছবে, তাকে সজোরে পাথর নিক্ষেপ করা হবে। ফলে সে নদীর মাঝখানে পূর্বের অবস্থানে চলে যাবে।

এই সকল আযাব কেয়ামত পর্যন্ত বরযখে সংগঠিত হতে থাকবে।

কেয়ামতের ভয়াবহতা:

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। সেদিন তোমরা দেখবে প্রত্যেক দুগ্ধদানকারী মাতা তার স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলে যাবে এবং গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতালের ন্যায়; আসলে তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন।" (২২ সূরা হজ্জ: ১-২)

সেদিন কেয়ামত সংগঠিত হবে-

যেদিন (প্রথমবার) শিঙায় ফুক দেয়া হবে, ফলে ভয়ংকর শব্দ হবে (৩৬:৪৯), এতে সঙ্গে সঙ্গে সকল মাখলূক সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে। (আল্লাহ তাআলা যাদেরকে চান তারা ব্যতীত)। অতঃপর যারা জীবিত আছে তারা মারা যাবে। আর যারা মারা গেছে তাদের আত্মার উপর বেহুশ অবস্থার সৃষ্টি হবে।

(যখন দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করলো? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা করেছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন। (৩৬:৫১-৫২)

সেদিন কেয়ামত সংগঠিত হবে-

যখন দৃষ্টি চমকে যাবে (৭৫:৭)। যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তুপ (৭৩:১৪) ধুনিত রঙ্গীন পশমের মতো (১০১:৫)। সেদিন পৃথিবী তার অভ্যন্তরের সকল কিছু বের করে দিবে (৯৯:২)। সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মতো (১০১:৪)। সেদিনের ভয়াবহতা কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে (৭৩:১৭)। যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে দেয়া হবে (৮১:৫-৬, ৮২:৩)। যেদিন চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে (৭৫:৭-৮)। যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, নক্ষত্রসমূহ যখন মলীন হয়ে যাবে (৮১:১-২)। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (মাথার উপর আকাশ ঘুরতে ঘুরতে ফেটে পড়বে) এবং নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে (৮২:১-২)। এবং যখন কবরসমূহকে উন্মোচিত করা হবে (৮২:৪)।

সেদিন আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। মহাবিশ্বের সরিষা পরিমাণ বস্তুকেও আল্লাহ তাআলা সেদিন পুনরুত্থিত করে হাজির করবেন। (সেদিন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন,) আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর (ওয়াহিদুল কাহ্‌হার)!

কিয়ামতের এই বিভীষিকা সকলকেই উপভোগ করতে হবে!

হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা:

এরপর হাশরের ময়দান কায়েম হবে। সেখানে ফেরেশতা, জিন, মানব, শয়তান, বন্য জন্তু সকলেই সমবেত হবে। এত ভিড় হবে যে, মানুষ পায়ের আঙুলের উপর ভর করে দাঁড়াবে, একজনের কাঁধ অন্য জনের কাঁধের সাথে মিলে যাবে। মানুষকে খালি পায়ে, খালি গায়ে, খতনা বিহীন, উলঙ্গ অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। তা সত্ত্বেও ময়দানের ভয়াবহতা এরূপ হবে যে, একজন আরেকজনের দিকে তাকানোর সময় পাবে না, কুচিন্তার ফুরসত পাবে না। সে ময়দান হবে সমতল, যাতে লুকানোর মত কোন উঁচু টিলা ও নিচু গর্ত থাকবে না।

সেদিন সূর্য মানুষের মাথা থেকে মাত্র দু'ধনুক দূরে থাকবে এবং প্রচণ্ড তাপ বিকিরণ করতে থাকবে। আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতীত সেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না এবং নৈকট্যশীলরা (নবী-রাসূল, সিদ্দিক, শহীদ, আউলিয়া, নেককার আলেম ও আবেদগণ) ব্যতীত অন্য কেউ তাতে স্থান পাবেনা। হাদীসে এসেছে, (সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে) সাত প্রকারের ব্যক্তি সেদিন আরশের নীচে স্থান পাবে-

১. ন্যায়পরায়ন (মুসলমান) বাদশাহ।
২. ঐ যুবক যে তার যৌবন কাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে।
৩. যে লোকের অন্তর মসজিদের সাথে লটকানো থাকে। যদিও সে বাহিরে থাকে। (সবসময় চিন্তা করে আবার কখন মসজিদে যাবো।)
৪. এমন দুই ব্যক্তি যারা পরস্পর আল্লাহর জন্যই মহব্বত করে এবং ঐ কারণেই একত্রিত হয় এবং ঐ কারণেই পৃথক হয়।
৫. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ পাককে স্মরণ করতে থাকে এবং চক্ষু দিয়ে অশ্রু নির্গত হতে থাকে।

৬. যে পুরুষকে একজন উচ্চবংশীয়া সুন্দরী রমণী অসৎ কর্মের জন্য ডাকে আর ঐ পুরুষ (সব রকমের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও) বলে যে, আমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি।

৭. যে এমন গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত টের পায় না যে ডান হাত কি দান করল। (বুখারী ও মুসলিম)

সূর্যের উত্তাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপ আর নিজের কৃতকর্মের জন্য অন্তর্জ্বালা এক ভয়াবহ মসীবত সৃষ্টি করবে। ঘামের দরুন মানুষের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে। মানুষের বদ আমল অনুপাতে মানুষ ঘামে নিমজ্জিত হবে। সে হিসেবে কেউ কেউ ঘামে উরু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো কান পর্যন্ত ডুবে যাবে, কারো ঘাম হবে গলার লাগাম এবং কেউ কেউ সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

সুতরাং হে নিঃস্ব! হাশরবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা কর। এ কষ্টে পড়ে অনেকেই আরয করবে, প্রভু! আমাদেরকে হাশরের ময়দানের ভোগান্তি ও অপেক্ষার কষ্ট থেকে নাজাত দিন যদিও আমরা জাহান্নামে যাই। আর সেটি হবে হিসাব নিকাশ ও আযাবের আগের কষ্ট। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষের উপর দিয়ে পঞ্চাশ হাজার বছর অতিবাহিত হবে, তথাপি আল্লাহ তাআলা মানুষের দিকে তাকাবেন না। হিসাব নিকাশ শুরু করবেন না।

বন্ধু হে! তুমি সেদিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন অবশ্যই আসবে, যেদিন মানুষ পায়ের উপর ৫০,০০০ বছর দণ্ডায়মান থাকবে। এ সময়ে তারা কোনো খাদ্য পাবেনা এবং এক ঢোক পানিও পান করতে পারবেনা।

তাহলে কেমন হবে সেদিনের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যন্ত্রণা! চিন্তা করা যায় কি? অথচ এমনই ঘটবে, এমনই ঘটতে যাচ্ছে।

সেদিন সকল মানুষ এমনকি সকল নবী-রাসূলগণও 'ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী' বলতে থাকবে। সেদিন কেউ আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবার সাহস করবেন না। কেবল আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ। তিনি তাঁর গুনাহগার উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন। বিচার কাজ শুরু হলে একদল লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে দেয়া হবে, আর সকল কাফের, মুশরিক, বেঈমান, নাস্তিক, মুরতাদ, ইহুদী, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান (ঐক্য পরিষদ!!!!) সকলকে একযোগে বিনা হিসেবে জাহান্নামের আগুনে চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ করা হবে। তাদের কোনো হিসাব নেই। হিসাব হবে কেবল গুনাহগার মুসলমানদের। মীযানের পাল্লায় একপাশে নেক আমল, অপরপাশে বদ আমল তোলে ওজন করা হবে। অণু পরিমাণ নেক কিংবা বদীও সেদিন বাদ পড়বে না। নেকীর পাল্লা ভারী হলে আমলনামা ডানহাতে সামনের দিক হতে দেয়া হবে, এরাই হবে জান্নাতী। আর বদীর পাল্লা ভারী হলে পিছন দিক হতে বাম হাতে দেয়া হবে, এরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এরাই হবে জাহান্নামী। যাদের ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হবে, আমাদের দয়াল নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মুক্তির জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন। উম্মতের মাঝে থেকেও কিছু লোককে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হবে, যেমন: একজন হাফেয দশজনের জন্য, একজন আলেম চল্লিশ জনের জন্য এবং একজন শহীদ সত্তর জন জাহান্নামী মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। এছাড়াও নাবালেগ শিশুরা তাদের পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবেন।

সেদিন আমাদের নবীজী ﷺ-কে হাউজে কাউসার দেয়া হবে। যে এর পানি পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবেনা। এর পাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্ররাজির সমান হবে। সেদিন নবীজী ﷺ কে হাউজে কাউসার, মীযান এবং পুলসিরাত- এই তিন জায়গার একজায়গায় পাওয়া যাবে।

কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে টেনে উপস্থিত করা হবে। তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক লাগামের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। জাহান্নামের উপর পুলসিরাত কায়েম করা হবে। যা হবে চুলের চেয়েও চিকন, তরবারির চেয়েও ধারালো। যা ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তা। এটি পেরিয়ে মানুষকে জান্নাতে যেতে হবে। নেককারগণ বিদ্যুতের গতিতে পার হয়ে যাবে।

পুলসিরাত পেরিয়ে এ উম্মত সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতের চাবি থাকবে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ রাসূলুল্লাহ এর হাতে। তিনিই জান্নাতে তাঁর উম্মতকে নিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন। আল্লাহ তাআলা সেদিন যেন আমাদেরকেও তাঁর ﷺ কাছে সাথে সাথে রাখেন। আমীন।

অন্যদিকে, সেদিন পুলসিরাতের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় গুনাহগারদের শরীর দু' টুকরা হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।

ওহে বন্ধু! মনে রেখো, জান্নাত একটি চরম সাম্প্রদায়িক স্থান, সেখানে কেবল নেককার মুসলমানগণই থাকতে পারবে। আর জাহান্নাম হচ্ছে পরম অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ স্থান, যেখানে সকল ধর্ম, মত, ইজম্, মতবাদ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির, সকল সম্প্রদায়ের মানুষের আবাসস্থল ও সহাবস্থান হবে। তাই সাম্প্রদায়িক হওয়ার চেষ্টা করুন। এবার চলুন সেই অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ জায়গাটি সম্পর্কে অল্প কিছু জেনে নেয়া যাক।

জাহান্নামের ভয়াবহতা:

জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। এর গভীরতার কোনো সীমা নেই। যদি একটি পাথর দোযখে নিক্ষেপ করা হয় তবে পাথরটি দোযখের তলদেশে পৌঁছতে সত্তর বছর সময় লাগবে। দোযখ চারটি দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং তার প্রতি দেয়ালের পুরুত্ব এত বেশি যে, তা অতিক্রম করতে চল্লিশ বছর সময় লেগে যাবে। দোযখের ভিতর কোনো আলো নেই, সেখানকার আগুনও কালো। সে আগুনের তেজ দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি। যদি কোনো দোযখীকে দুনিয়ার আগুনে এনে পুড়ানো হয়, তাহলে সে ঘুমিয়ে পড়বে। তার কাছে দুনিয়ার আগুন অনেক আরামদায়ক লাগবে। সেখানে সবচেয়ে কম যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হলো দোযখীকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, যার তাপে পাতিলের ফুটন্ত পানির ন্যায় তার মগজ টগবগ করতে থাকবে। কিন্তু সে মনে করবে তাকেই বুঝি সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া হচ্ছে। দোযখের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। দোযখের আগুন এতটাই ভয়াবহ যে, তা মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তাকেও গ্রাস করে ফেলবে। সেখানে মৃত্যু নেই, যতই শাস্তি দেয়া হোক মরবে না। দোযখের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের উনিশজন ফিরিশতা (যদিও সকল মানব ও জিনদের শাস্তি দেয়ার জন্য একজনই যথেষ্ট ছিল); আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন না এবং যা আদেশ করা হয় তাই করেন। মানুষদেরকে যখন টেনে হিচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, দূর থেকে জাহান্নামের আগুন তাদের দেখে ফেলবে এবং ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শুরু করে দিবে। গুনাহগারদের সেখানে শৃংখলাবদ্ধ করে, (যদিও দোযখ প্রশস্ত জায়গা, তথাপি শাস্তি দেওয়ার জন্য) দোযখের সংকীর্ণ, অন্ধকারময় কোনো স্থানে নিক্ষেপ করে

অনন্তকাল পুড়তে থাকা হবে। সেখানে ধৈর্য ধারণ করা আর না করা উভয়েই সমান।

দোযখীদের পোশাক হবে গন্ধকের, যেন দ্রুত আগুন লেগে যায়।

দোযখীদের বিশাল দেহ দেয়া হবে যেন ভালোভাবে শাস্তি দেয়া যায়। তাদের জিহ্বা হবে দুই মাইল সমান। দুই কাঁধের স্থান দ্রুতগামী অশ্বারোহীর দুই দিনের পথের সমান দীর্ঘ হবে। চোয়াল হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় এবং তাদের চামড়া তিনদিনের পথের সমান মোটা ও পুরু হবে। কোন কোন দোযখীদের এত বড় দেহ দেয়া হবে যে, তাদের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের রাস্তা হবে। তাতে রক্ত ও পূঁজের নালা প্রবাহিত হবে।

দোযখীদের দংশন করার জন্য উটের ন্যায় ঘাড় বিশিষ্ট ভয়াবহ সাপ এবং মালপত্র বোঝাই করা খচ্চরের ন্যায় উঁচু বিচ্ছু থাকবে। তারা একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর তার ব্যথা অনুভূত হবে।

ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য কণ্টকময় বৃক্ষ ছাড়া তাদের আর কোনো খাবার থাকবে না, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না, উপরন্তু তা তাদের গলায় আটকে যাবে। ফলে তারা পানি চাইবে। তাদেরকে অত্যন্ত গরম ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাঁড়িভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে। সেদিন সেখানে তাদের কোন সুহৃদ ও বন্ধু থাকবে না। সকলেই হারিয়ে যাবে। সেদিন তারা এতই ক্ষুধার্ত থাকবে যে, তাদেরকে অন্য কোনো শাস্তি না দেয়া হলেও ক্ষুধার কষ্টই শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট ছিল। তাদেরকে খেতে দেয়া হবে দোযখীদের ক্ষত নিঃসৃত পূঁজ (গাস্‌সাক)। এটি এতই দুর্গন্ধময় যে, এক বালতি গাস্‌সাক তথা পূঁজ যদি দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হতো তাহলে সমস্ত পৃথিবী পঁচে গলে যেতো। আরো

খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ, যা তারা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় গিলতে থাকবে, কিন্তু সেই খাদ্য গলিত তামার ন্যায় ফুটন্ত পানির মতো দোযখীদের পেটে ফুটতে থাকবে।

এছাড়াও তাদের মাথার উপর ঢালা হবে ফুটন্ত পানি, ফলে তাদের চামড়া বিগলিত হয়ে যাবে। পুড়ে যাওয়া কিংবা বিগলিত হওয়া চামড়াকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে, যেন শাস্তি পুরোপুরি ভোগ করতে পারে। আরো আছে আগুনের শিকল, লোহার মুগুর, জাহান্নামের যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে বের হতে চাইলে তাদেরকে মুগুর মেরে ফেরত পাঠানো হবে। আর এই মুগুর কেমন ভারী হবে? সমস্ত মানব ও জিন জাতি যদি তা উঠাতে চেষ্টা করে তাহলেও তা উঠাতে সক্ষম হবে না।

এসব ছাড়াও আছে আগুনের বেড়ী।

যে মুনাফেকী করবে, বুকে বে-ঈমানী, মুখে ঈমানের কথা বলবে, উম্মতের সাথে গাদ্দারী করবে, উম্মতের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে, তাদেরকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। এদের শাস্তি হবে সবচেয়ে মর্মান্তিক। তাদেরকে পাঠানো হবে "যুব্বুল হুযন" (চিন্তার কূপ) নামক স্থানে। এটি এমনই ভয়ংকর যে, খোদ জাহান্নামই এর মসীবত থেকে আল্লাহর কাছে দিনে শতবার পানাহ চায়। সুতরাং উম্মতের গাদ্দাররা সাবধান!

যে ব্যক্তি ইলম গোপন করবে, তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

যে ব্যক্তি মদ পান করবে, তাকে 'তীনাতুল খাবাল' (দোযখীদের ঘাম ও দেহ নিংড়ানো পদার্থ) এবং 'নাহরুল গুতা' (জাহান্নামে ব্যভিচারীনী নারীর যৌনাঙ্গ থেকে প্রবাহিত নহর বা নদী) হতে পান করানো হবে।

যেসব লোক ওয়ায করে বেড়ায়, কিন্তু নিজে আমল করেনা, তাদের ঠোঁট আগুনের কেঁচি দ্বারা কাটা হবে।

যারা সোনা-রূপার পাত্রে খাবার/পানীয় খাবে, তারা যেন তাদের পেটে আগুন ভর্তি করছে।

যারা প্রাণির ছবি অংকন করবে বা ছবি তুলবে, তাদেরকে আগুনে সবচেয়ে বেশি শাস্তি ভোগ করতে হবে, কেননা তাদেরকে তাদের অংকিত বা তোলা প্রাণির ছবির মাঝে রূহ দিতে বলা হবে, কিন্তু তারা তা পারবে না।

আত্মহত্যাকারীরাও চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। (অবশ্য মুসলমান উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করার পর সে অন্যান্য গোনাহগার মুসলমানদের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।) সে যে উপায়ে আত্মহত্যা করেছিল, তাকে সেভাবেই শাস্তি দেয়া হবে। যেমন: যদি কেউ পাহাড় হতে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে, তাহলে তাকে জাহান্নামে আগুনের পাহাড়ে তোলা হবে, সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে। এভাবে বারবার করা হবে। যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে তাকে বারবার জাহান্নামের বিষ পান করানো হবে।

সন্দেহ নেই! জাহান্নাম এমনই হবে। সন্দেহ নেই, কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলার জন্য এটি সহজ, খুব সহজ।

হূরে ঈ'নের সাক্ষাৎ লাভের সহজ উপায়

উপরের আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের সামনে কী পরিমাণ কঠিন পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা এ সম্পর্কে চরম পর্যায়ের গাফেল (অমনোযোগী)। আমাদের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমাদের মৃত্যু নেই, কবরের আযাব, হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম এগুলো রূপকথার গাল-গল্প বৈ নয়! কিন্তু এটি এমনই চিরসত্য, যা ঘটবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে? আল্লাহ তাআলার চেয়ে ওয়াদা বাস্তবায়নকারী আর কে? তিনি কি আসমান যমীন 'কুন ফায়াকুন' এর দ্বারা মুহূর্তের মাঝেই সৃষ্টি করেননি? তিনি কি পুনরায় এগুলো ধ্বংস করে আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? লক্ষাধিক নবী-রাসূলগণ কি ভুল বলে গিয়েছেন? কক্ষণো নয়। কুরআন কারীমের একটি আয়াতও মিথ্যা নয়, ভুল নয়, বিন্দুমাত্র ভুলের কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

বন্ধু হে! মৃত্যুর কষ্ট সত্য, কবরের আযাব সত্য, পুনরুত্থান সত্য, হাশর সত্য, পুলসিরাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, জান্নাত সত্য, আল্লাহ তাআলার দীদার সত্য, হূরে ঈন, হূরে লূ'বা প্রাপ্তি সত্য। যেহেতু এগুলো ঘটবেই, তাই জান্নাত প্রাপ্তি আর জাহান্নাম হতে বাঁচার চেষ্টা করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায়, যদিও জান্নাত প্রাপ্তি, আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ, হূরে ঈনের সাথে সাক্ষাত সত্য, কিন্তু তা ঘটবে বহু বছর পর। মৃত্যুর কষ্ট হতে বাঁচার সহজ কোনো পন্থা আছে কি? কবরের আযাব মাফ হওয়ার সহজ কোনো পদ্ধতি আছে কি? কিয়ামতের বিভীষিকা হতে রক্ষা

কিভাবে পাব? মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে যাওয়া এবং হূরে ঈ'নের সাথে সাক্ষাতের শর্টকাট কোনো রাস্তা আছে কি? হ্যাঁ, বন্ধু! এখন আপনাদেরকে সেই বিষয়ে কিছু বলব।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,"কাউকে পিপীলিকা দংশন করলে যতটুকু কষ্ট অনুভূত হয়, শত্রুর হাতে নিহত হওয়ার সময় একজন শহীদ ঠিক ততটুকু কষ্ট অনুভব করে থাকেন।" (মিশকাত শরীফ)

- রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলা শহীদকে ছয়টি পুরস্কার দান করবেন।
  ১. রক্তের প্রথম ফোটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে জান্নাত তার ঠিকানা, তা তাকে দেখিয়ে দেয়া হয়।
  ২. তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়।
  ৩. (কিয়ামতের) প্রচণ্ড ভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকবে।
  ৪. তার মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হবে, যার এক একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় বস্তু হতে মূল্যবান।
  ৫. স্ত্রী রূপে তাকে বাহাত্তর জন ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূর দেয়া হবে।
  ৬. তার সুপারিশে তার সত্তরজন আত্মীয়কে জান্নাত দান করা হবে।

  (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফ)

- প্রিয়নবী ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি শত্রুর মুখোমুখী হল এবং দৃঢ়পদে জিহাদে নিহত কিংবা বিজয়ী হল, তাকে কবর আযাব দেয়া হবে না। (নাসায়ী ও তাবারানী শরীফ)

- যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হন, তারা তো মৃত নয়, বরং জীবিত। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।" (২ সূরা বাকারা: ১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তার জীবিকা প্রাপ্ত হন।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

সুব্হানাল্লাহ! এটিই তো শ্বাশ্বত জীবন।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, শহীদদের আত্মাসমূহ সবুজ বর্ণের পাখির আকৃতিতে রাখা হয়। আল্লাহ তাআলার আরশের নীচে তাদের জন্য ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। জান্নাতে তারা তাদের ইচ্ছামত চলাফেরা করে অবশেষে সেই লণ্ঠনসমূহের নিকট এসে অবস্থান নেয়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার নিকট কিছু চাও কি? উত্তরে তারা বলে, আমারা জান্নাতের মধ্যে যেখানে খুশি ঘুরাফেরা করে বেড়াই, এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারি? আল্লাহ তাআলা তিনবার এই প্রশ্ন করেন আর প্রতিবার তারা একই উত্তর প্রদান করে। অবশেষে যখন তারা বুঝতে পারে যে, আসলে কোনো কিছু না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করতেই থাকবেন তখন তারা

বলবে, ইয়া আল্লাহ! আমাদের একটি মাত্র আরয, আমাদের রূহগুলো পুনরায় আমাদের দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দাও আমরা আবারও তোমার পথে লড়াই করে শহীদ হয়ে আসি! কিন্তু মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে আসা আল্লাহর নিয়মের পরিপন্থী বিধায় এই আবদার গ্রহণ করা হয় না। (মুসলিম) অর্থাৎ শহীদদেরকে আল্লাহ পাক এই পরিমাণ নেয়ামত দান করবেন, যার জন্য তারা পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার এবং আবারো শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যা অন্য কোনো জান্নাতী করবে না।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাদের জন্য জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের পার্থক্য আসমান-যমীনের সমান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে চাইবে, জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে।" (বুখারী)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত যে কোন ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (আবু দাউদ-২২১৬/২৫৪১, তিরমিযী-১৬৫৭)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।" (মুসলিম-১৯০২)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বান্দার দুটি পা ধূলি ধূসরিত হবে এবং আবার তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না।" (বুখারী-২৮১১)

- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "মৃত্যুর ভয়াবহ অবস্থার কারণে শহীদ ছাড়া কোনো মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে আসার কামনা করবে না। যদিও তাকে গোটা দুনিয়া দেয়া হয়। কারণ, শহীদ (মৃত্যু থেকে শুরু করে জান্নাত পর্যন্ত) শাহাদাতের মর্যাদা অবলোকন করেছেন। তাই সে দুনিয়ায় ফিরে এসে আবার শহীদ হওয়ারই তামান্না করবে।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "ঋণ ব্যতীত আল্লাহ তাআলা শহীদের সব কিছু (পাপ) মাফ করে দিবেন।" (মুসলিম– ১৮৮৬)

- এছাড়াও হাদীসে পাক হতে শহীদদের আরো কয়েকটি বিশেষ ফাযায়েল পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

✓ আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং শহীদগণ যেহেতু কবরে জীবিত, সেহেতু কবরের মাটির জন্য তাঁদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দেয়া হয়েছে।

✓ শহীদ মাটিতে পড়ার সাথে সাথে জান্নাত হতে দুইজন হূরে ঈ'ন আগমন করেন, তার শরীর মুছে দেন এবং তাকে জান্নাতী খুশবু লাগিয়ে দেন ও পোশাক পরিধান করিয়ে দেন।

জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন মুজাহিদ বাহিনী শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হয়, তখন ডাগরনয়না হূররা সুসজ্জিত হয়ে উঁকি মেরে দেখতে থাকে। যখন কোনো মুজাহিদ সামনে অগ্রসর হয়, তখন বলে, হে আল্লাহ! তাকে সাহায্য কর। তাকে সহায়তা কর। আর যখন পশ্চাতে ফিরে আসে, তখন আত্মগোপন করে বলে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। আর যখন নিহত হয়, তখন তার রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরার সাথে সাথে আল্লাহ

তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। তার নিকট দুটি ডাগরনয়না হূর নেমে আসে এবং তার চেহারা থেকে ধূলি মুছে দেয়। (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ: ৪৩৫)

শহীদদের লাশ কবরেও অক্ষত থাকে:

- হযরত মুআত্তা ইবনে মালেক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, হযরত আমর বিন জামূহ ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা এর কবর বন্যার তোড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। উনারা দুজন ছিলেন উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আনসারী সাহাবী। দু'জনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। কবরটি ভেঙ্গে যাওয়ায় অন্যত্র তাদেরকে দাফন করার জন্য কবরটি ভালোভাবে খনন করতে গিয়ে দেখা গেল, তাঁদের দেহে লেশমাত্র পরিবর্তন আসেনি। মনে হলো যেন গতকালই শহীদ হয়েছেন মাত্র। ইহা উহুদ যুদ্ধের ৪৬ বৎসর পরের ঘটনা।
- হযরত মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে মদীনা তায়্যিবায় খাল খনন করতে শুরু করেছিলেন। ঘটনাক্রমে উহুদের কবরস্থান এই কর্মসূচির আওতায় পড়ে যায়। হযরত মুআবিয়া রদিয়াল্লহু আনহু নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের লাশ সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এতদুদ্দেশ্যে কবরসমূহ খনন করে লাশসমূহ উত্তোলন করে দেখা গেল সব কটি লাশই পূর্ববত সজীব ও সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে, লাশগুলি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। শুধু তাই নয়, বরং খনন করার সময় হযরত হামযা রদিয়াল্লহু আনহু এর পদ মুবারকে কোদালের আঘাত লাগার সাথে সাথে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরের।

শুহাদায়ে উহুদ ছাড়াও আকাবিরে উম্মত সম্পর্কে সীরাত ও ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দাফন করার দীর্ঘ কয়েক বছর পরও তাদের দেহে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

- বর্তমান যামানায়ও আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধে এমন বহু নিদর্শন পাওয়া যায়, সেখানে শহীদানের লাশ পঁচে না এবং লাশ হতে অপার্থিব খুশবু বের হয়। শাহাদাতের সময় শহীদকে জান্নাতে তার স্থান দেখানো হয়। ফলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং হাসতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! হযরত ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রচিত "আয়াতুর রহমান ফী জিহাদিল আফগান" (আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর নিদর্শন) কিতাবটিতে এরকম বহু নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে।

নবীজী ﷺ-এর শহীদী তামান্না

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান, "সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করি: আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

সাহাবায়ে কেরামে শহীদী তামান্না

- তাবুক যুদ্ধে যোগদান করার জন্য আনসার ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে সাতজন মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে সওয়ারী জানোয়ার চাইলেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। নবীজী তাঁদেরকে সওয়ারী বাহন দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। ফলে তাঁরা জিহাদে যেতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান। ইতিহাসে এরা 'বাকাউন' অর্থাৎ ক্রন্দনকারী নামে পরিচিত। এঁরা হলেন: হযরত সালেম ইবনে উমায়ের, হযরত উলবা ইবনে যায়িদ, হযরত আবু লায়লা আব্দুর রহমান, হযরত আমর ইবনে হুমাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাগাফ্ফাল মুযানী রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈন। এঁদের মধ্যে দু'জন হযরত আবু লায়লা আব্দুর রহমান ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফালকে রদিয়াল্লহু আনহুমাকে কাঁদতে দেখে হযরত ইবনে ইয়ামীন ইবনে উমায়ের রদিয়াল্লহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কাঁদছ কেন?" তাঁরা বললেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়েছিলাম তাবুক অভিযানে যাওয়ার জন্য সওয়ারী চাইতে। কিন্তু তিনি দিতে পারেননি। আমাদের কাছেও এমন কিছু নেই যা দ্বারা তাঁর সাথে অভিযানে যেতে পারি।" তখন ইবনে ইয়ামীন তাদেরকে একটি উট এবং কিছু খোরমা দিলেন। তাঁরা ঐ সওয়ারীতে চড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অভিযানে চলে গেলেন।
- বদরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এবার প্রস্তুত হয়ে যাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য, যে জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান।" হযরত উমাইর ইবনুল হুমাম আনসারী রদিয়াল্লহু আনহু নবীজীর কথাটি শুনলেন। তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন। এরপর বলতে

থাকেন: "যদি আমি এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত জীবিত থাকতে চাই তাহলে তো (জান্নাতে যেতে) অনেক দেরী হয়ে যাবে।" তাঁর কাছে যা খেজুর ছিল সব দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাফিরদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন।" (মুসলিম-১৯০১, আবু দাউদ-২৬১৮)

- বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী কাফেররা যখন হযরত হারাম রদিয়াল্লহু আনহুকে বর্শা বিদ্ধ করল এবং বর্শাটি তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, "(ফুয্তু ওয়া রব্বিল কা'বাহ্) কা'বার রবের শপথ! আমি সফলকাম হয়ে গেছি।" (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)
- হযরত আনাস ইবনে নদর রদিয়াল্লহু আনহু বদরের লড়াইয়ে শরীক হতে পারেন নি। তাই তিনি নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মুশরিকদের সাথে যে প্রথম লড়াই করেছেন তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। আগামীতে মুশরিকদের সাথে যে লড়াই হবে তাতে যদি আমি শরীক হতে পারি, তাহলে আল্লাহ পাক দেখে নিবেন আমি কি করি। এরপর যখন ওহুদের যুদ্ধ সংগঠিত হলো এবং মুসলমানরা বাহ্যত পরাজিত হলো তখন তিনি বলতে থাকেন, "হে আল্লাহ! এরা (মুশরিকরা) যা কিছু করেছে তা থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি। একথা বলে তিনি সামনে সা'দ ইবনে মুআয রদিয়াল্লহু আনহুর কাছে চলে আসেন। তখন বলতে থাকেন: "হে সা'দ ইবনে মুআয! নদরের রবের শপথ! উহুদের পাহাড়ের কাছ থেকে আমি জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি।" এরপর তিনি দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হযরত আনাস রদিয়াল্লহু আনহু বলেন,"আমরা তাঁর (হযরত আনাস ইবনে নদর রদিয়াল্লহু আনহুর) গায়ে আশিটিরও অধিক তলোয়ার, বর্শা ও তীরের

আঘাত দেখতে পাই এবং আমরা তাঁকে এমন অবস্থায় পেয়েছিলাম তখন তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন এবং মুশরিকরা তাঁর চেহারা মুবারক বিকৃত করে দিয়েছিল। ফলে তাঁর বোন ব্যতীত কেউ তাঁকে চিনতে পারেননি এবং তিনিও তাঁকে চিনেছিলেন তাঁর আঙুলের অগ্রপ্রান্তগুলো দেখে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লহু বলেন, আমরা মনে করি এবং আমাদের মত হচ্ছে এটাই যে নিম্নোক্ত আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর মত লোকদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে: "মুমিনদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছে। আবার তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে যারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছেছে।" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (বুখারী-২৭০৩,২৮০৬, মুসলিম-১৯০৩, নাসায়ী-৪৭৫৫)

- ওহুদের যুদ্ধে সকল ছাহাবায়ে কেরাম শাহাদাতের এমন তামান্না, এমন অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কখনোও কোথাও পাওয়া যায় না।

হযরত আবু তালহা রদিয়াল্লহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাধারণ মুসলমানরা পরাজিত হয়ে প্রিয় নবী ﷺ-এর কাছে না এসে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিলেন। তাঁর কাছে কেউ ছিল না, কেবল হযরত আবু তালহা রদিয়াল্লহু আনহু নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে নবীজী ﷺ-এর সম্মুখে প্রতিরোধ ব্যুহ হয়ে দাঁড়ালেন। এভাবে নবীজী ﷺ-এর দিকে কোনো তীর আসলে তিনি তাঁর বুক দিয়ে তা ফিরাতে লাগলেন। একসময় তিনি ঢলে পড়লেন, ইতোমধ্যেই হযরত আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু ও অন্য কয়েকজন সাহাবী চলে আসলেন। নবীজী ﷺ বললেন, তোমাদের ভাই আবু

তালহাকে সামলাও। সে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে। তিনি শহীদ হলে দেখা গেল, তাঁর শরীরে আশিটিরও অধিক আঘাত ছিল।

একই ভাবে হযরত আবু দোজানা রদিয়াল্লহু আনহুও নবী করীম ﷺ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং নিজের পিঠকে ঢাল স্বরূপ পেতে দিলেন। তাঁর পিঠে এসে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর বিঁধছিল, তিনি একটুও নড়ছিলেন না।

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রদিয়াল্লহু আনহু অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ইবনে কোম্মা ও অন্যদের আঘাত প্রতিরোধ করছিলেন। তাঁর হাতেই ছিলো ইসলামের পতাকা। শত্রু সৈন্যরা তাঁর ডান হাতে এমন আঘাত করে যে, তাঁর হাত কেটে যায়। তিনি তখন তাঁর বাম হাতে ইসলামের পতাকা তুলে ধরেন। কিন্তু শত্রুদের হামলায় তার বাম হাতও কেটে যায়। তিনি তখন ইসলামের পতাকা তাঁর দুই বাহু দিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরেন। এরপর এই অবস্থায় দুশমনের আঘাতে তিনি শহীদ হয়ে যান।

- মুতার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক ভয়াবহ অসম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনজন সেনাপতি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, একজন শহীদ হলে আরেকজন পতাকা তুলে নিবেন। মুতার যুদ্ধে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য দুই লক্ষাধিক রোমান-আরব সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানরা এই বিশাল সংখ্যক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন না। আসলে তারা

কল্পনাও করেননি, কাফেরদের বাহিনী এত বিশাল হবে। তাই সিদ্ধান্ত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পত্র পাঠিয়ে শত্রুর লোক লস্করের সংখ্যা জানাবেন। তিনি হয় আরো সৈন্য পাঠাবেন, নচেত যা ভালো মনে করেন নির্দেশ দিবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুসলমানদের উৎসাহিত করে বললেন,

"হে মুসলমানগণ! আজ তোমরা যা অপছন্দ করছ সেটাই তোমরা কামনা করছিলে। আর তা হলো শাহাদাত। আমরা সংখ্যা-শক্তি বা সংখ্যাধিক্যের জোরে লড়াই করি না। যে জীবনব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তার জন্য আমরা লড়াই করি। অতএব এগিয়ে যাও, বিজয় বা শাহাদাত এ দুটো উত্তম জিনিসের যে কোন একটা অবশ্যই আমাদের জন্য নির্ধারিত আছে।"

(সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ:২৬২)

- মুতার যুদ্ধের প্রধান ও প্রথম সেনাপতি হযরত যায়িদ রদিয়াল্লহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পতাকা বহনরত অবস্থায় প্রাণপণ যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় সেনাপতি হযরত যাফর রদিয়াল্লহু আনহু পতাকা তুলে নেন। তিনি প্রথমে ডান হাতে পতাকা তুলে ধরেন। শত্রুর তরবারিতে ডান হাত কাটা গেলে বাম হাতে পতাকা তুলে ধরেন। এরপর সে হাতও কাটা পড়ল। তখন তিনি তা দুই ডানা দিয়ে চেপে ধরলেন। এরপর শত্রুর আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন। এসময় তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাকে দুই খানা ডানা দেন, যা দিয়ে তিনি যেখানে খুশী উড়ে বেড়াতে থাকেন। কথিত আছে, একজন রোমক সৈন্য তাঁকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখন্ডিত করে ফেলেছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ২৬৩)

হযরত জাফর রদিয়াল্লহু আনহু শহীদ হওয়ার পর দেখা যায়, তাঁর দেহে তীর ও তলোয়ারের **পঞ্চাশটি** (আরেক বর্ণনা অনুযায়ী **নব্বইটি**) আঘাত ছিল। এসব আঘাতের একটিও পিছনের দিকে ছিল না। (ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ: ৫১২)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

৬৪২ ঈসায়ী মোতাবেক ২১ শে হিজরীতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু-কে এমন সব রোগ ঘিরে ধরে, যা তাঁকে ভেতর থেকে অতি দ্রুত কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে চলছিল। এটা ছিল আঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব। এক সময়ে তাঁর শরীরে পচন শুরু হয়। এই অবস্থায় একদিন তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে দেখতে আসেন এবং তাদের মাঝে আলোচনা হয়।

"মনোযোগ দিয়ে দেখ" হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু এক পা থেকে কাপড় সরিয়ে বন্ধুকে দেখান এবং জিজ্ঞাসা করেন, "আমার পায়ের এমন কোনো স্থান তুমি দেখছ যেখানে তীর, তলোয়ার বা বর্শার ক্ষত নাই।"

বন্ধু এমন কোনো স্থান দেখেননি যেখানে ক্ষতস্থান ছিল না। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু অপর পা আবরণমুক্ত করে বন্ধুকে দেখান এবং পূর্বের মতো আবারো জিজ্ঞাসা করেন। এরপর বুক ও পিঠ দেখান। তাঁর শরীরের এক বিঘত জায়গাও এমন ছিল না, যেখানে জখমের চিহ্ন ছিল না। তাঁর বন্ধু অবাক বিস্ময়ে তাঁর শরীরের সবখানের এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

"তুমি কি জান আমি কত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি?" হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বললেন, "এরপরও আমি শহীদ হলাম না কেন? লড়াই করতে করতে আমার মৃত্যু হলো না কেন? আহ্! আমি এক বৃদ্ধ উটের মতো মরছি। শয্যায় মারা যাওয়া আমার জন্য লজ্জাজনক। আল্লাহ তাআলা ভীরু কাপুরুষদের চোখে ঘুম না দেন!"

"আপনি যুদ্ধের ময়দানে নিহত পারেন না, আবু সুলাইমান।"

বন্ধুবর তাকে আশ্বস্ত করে জানায়, "আপনাকে রাসূলুল্লাহ 'সাইফুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর তরবারি' আখ্যা দিয়েছেন। এটা নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আপনি যুদ্ধের ময়দানে মারা যাবেন না। যদি আপনি রণক্ষেত্রে মারা যেতেন, তাহলে সবাই বলতো যে, 'এক কাফের আল্লাহর তরবারি ভেঙ্গে ফেলেছে।' অথচ এমনটি হতে পারে না।...আপনি ইসলামের 'নাঙ্গা তলোয়ার' ছিলেন।"

এরপর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু ইন্তেকাল করেছেন। এই খবর দ্রুত সবস্থানে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনায় তাঁর ইন্তেকালের খবর পৌঁছলে মদীনার মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। পুরো মদীনা শোকস্থলে পরিণত হয়। মহিলারা শোকে বুক চাপড়াচ্ছিল এবং মাতম করতে লাগল। আমীরুল মু'মিনীন খলীফা হয়েই রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, কারো মৃত্যুতে কেউ মর্সিয়া ক্রন্দন করতে পারবে না। তাঁর নির্দেশ কঠিনভাবে পালিত হচ্ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর মৃত্যুর পর হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু নিজের বাড়ি থেকে মহিলাদের কান্নাধ্বনি ও শোকগাঁথা শুনেন। এতে তিনি চরম ক্ষুব্ধ হন। দেয়ালে ঝুলানো লাঠি হাতে

নিয়ে দ্রুত বাইরে আসেন। কিন্তু দরজা পর্যন্ত এসেই তিনি থেমে যান। কিছুক্ষণ চিন্তা করে ফিরে আসেন।

"আজ মদীনার মহিলাদের কান্নার অনুমতি আছে।" হযরত উমর রদিয়াল্লহু আনহু ঘোষণা দেন, "তাদেরকে আবু সুলাইমানের মৃত্যুতে মাতম করতে দাও। তাদের কান্না লোক দেখানোর জন্য নয়। ক্রন্দনকারীরা আবু সুলাইমানের মত ব্যক্তিত্বের জন্য কাঁদতেই পারে। আর কোনো মা আবু সুলাইমানের মতো সন্তান জন্ম দিবে না।"

হিমসে একটি সুন্দর বাগিচা আছে। সেখানে আছে ফুল-ফল সমৃদ্ধ পুষ্পবীথি। মধ্যখানে আছে একটি মসৃণ রাস্তা। ঐ বাগিচায় একটি মসজিদ আছে। মসজিদটি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর নামে সুপ্রসিদ্ধ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় মসজিদ। এই মসজিদের এক কোণায় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর কবর অবস্থিত। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহুর বীরত্ব গাঁথা যারা জানতে চান, তারা আজও যেন ঐ মসজিদ হতে এই হুংকার শুনতে পান-

انا فارس الضديد
انا خالد بن الوليد

"আমি পারস্যের যমদূত,
আমি খালিদ বিন ওলীদ।"

কী রহস্য ছিল, সাহাবায়ে কেরামের এই বীরত্বের?

কী রহস্য ছিল, সাহাবায়ে কেরামের এই বীরত্বের? কেন তারা মৃত্যুকে এভাবে ভালোবাসতে পেরেছিলেন? কেন তারা শাহাদাতের জন্য উতলা হয়ে থাকতেন? কেন তারা দুনিয়ার সব সুখ, চাওয়া পাওয়া, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন দ্বীন ইসলামের জন্য?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নিম্নের দুটি উদাহরণ হতে-

- শাহাদাত বরণের প্রাক্কালে হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব রদিয়াল্লহু এই কবিতা আবৃত্তি করলেন:

  "আহ্! কী চমৎকার জান্নাত এবং তার সান্নিধ্য লাভ!
  জান্নাত যেমন অতি উত্তম ও পবিত্র, তার পানীয়ও তেমনি।
  রোমকদের আযাব ঘনিয়ে এসেছে, তারা কাফির এবং
  আমার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট, যদিও তাদের হাতে আঘাত খেয়েছি।"

- মুতার যুদ্ধে হযরত জাফর রদিয়াল্লহু আনহুর পর পতাকা তুলে নেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি ঘোড়া হতে নেমে লড়াইতে অংশগ্রহণ করবেন কিনা ভাবতে ও কিছুটা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। অতঃপর স্বগতভাবে বললেন,

  "কসম খেয়ে বলছি, হে ইবনে রাওয়াহা, এই ময়দানে তোমাকে নামতেই হবে, হয় তোমাকে নামতেই হবে, নচেত তোমাকে অপছন্দ করতে হবে।

  সকল মানুষ যদি রণহুঙ্কার দিয়ে জমায়েত হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে কান্নার রোলও পড়ে থাকে,

তোমাকে কেন জান্নাত সম্পর্কে নিস্পৃহ দেখছি?
সুখে শান্তিতে অনেকদিন তো কাটিয়েছো,
অথচ তুমি তো আসলে একটি পুরনো পাত্রে
এক ফোটা পানি ছাড়া আর কিছুই ছিলে না।
হে আমার আত্মা, আজ যদি নিহত না হও তাহলেও তোমাকে
একদিন মরতেই হবে।
এটা (রণাঙ্গন) মৃত্যুর ঘর যাতে তুমি প্রবেশ করেছো।
তুমি এ যাবৎ যা চেয়েছো পেয়েছো।
এখন যদি ঐ দু'জনের মতো (যায়িদ ও জাফর) কাজ কর
তাহলে সঠিক পথে চালিত হবে।"

এরপর তিনি তরবারী হাতে অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

(আল্লাহ তাআলা সকল সাহাবায়ে কেরামকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন এবং আমাদেরকেও তাঁদের অনুসারী বানান। আমীন।

একথায়, যেই তিনটি বিষয় সাহাবায়ে কেরামকে এমন বীরত্ব প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করত তা হলো-

১. পরিপূর্ণ দুনিয়াত্যাগী যিন্দেগী
২. আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানো ও জবাবদিহিতার ভয়।
৩. শাহাদাতের ফাযায়েল এবং জান্নাতের নায-নেয়ামতের স্মরণ।

বীরত্বপূর্ণ ও ঈমানদীপ্ত কিছু উক্তি:

- "আল্লাহর শপথ! আমরা যুদ্ধ ও অস্ত্রের মধ্যেই লালিত পালিত। আমরা পুরুষানুক্রমে যোদ্ধা জাতি।"- হযরত বারা ইবনে মা'রূর রদিয়াল্লহু আনহু, আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের সময়।

- বদরের যুদ্ধের পূর্বে এক পরামর্শ সভায় আনসারদের পক্ষে হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রদিয়াল্লহু আনহু ঈমানদীপ্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন-

  "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার দাওয়াতকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা পরম সত্য। আর এই প্রত্যয়ের ভিতরেই আমরা আপনার কাছে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমরা আপনার নির্দেশ মানবো ও আনুগত্য করবো। হে আল্লাহর রাসূল! তাই আপনি যা ভালো মনে করেন, করুন। আমরা আপনার সাথেই আছি। সেই আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে মহাসত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, সামনের এই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আপনি যদি তার অথৈ পানিতে নামেন, আমরাও আপনার সাথে নামব (আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমরা তাতেও রাজি আছি)। আমাদের একটি লোকও আপনাকে ছেড়ে পেছনে থাকবে না। আগামীকাল যদি আপনি আমাদের সাথে নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হতে চান, তাতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল এবং শত্রুর মুকাবিলায় সংকল্পে অবিচল। আশা করি, আল্লাহ আপনাকে আমাদের এমন তৎপরতা দেখবার সুযোগ দিবেন, যাতে আপনার চোখ

জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভর করে আমাদের সাথে নিয়ে আপনি এগিয়ে চলুন।"

- "আমার তো দুর্বলতা নেই, কেননা আমি শক্তিমান বর্শাধারী পুরুষ,
আমার ধনুক রয়েছে এবং তাতে তীব্র ও তীক্ষ্ণ তীর রয়েছে।
শক্ত ও মোটা বর্শার ফলক সে তীরে আঘাত খেয়ে ছিটকে যায়।
আসলে মৃত্যুই সত্য, জীবন হলো বাতিল।
আল্লাহ মানুষের জন্য যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তা অনিবার্য,
আর মানুষ তার অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য।"
-হযরত আসিম ইবনে সাবিত রদিয়াল্লাহু আনহু।

- ইয়ামামার প্রান্তরে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু-
"বীর মুজাহিদ সেনানীরা! ইসলামের সুমহান বাণী দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিতে আল্লাহ পাক আমাদের নির্বাচন করেছেন। পরিবার-পরিজন এবং পার্থিব ধন-সম্পদ যাদের অতি প্রিয় তারা চলে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ক্ষোভ কিংবা অভিযোগ নেই। তারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে জান বাজি রেখে আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। এক দীর্ঘ সময় ধরে তারা আমাদের সঙ্গ দিয়েছে। আল্লাহ তাদের যথাযথ পুরস্কৃত করুন।...... তোমরা আমার সঙ্গ ছাড়নি। এই ত্যাগের বিনিময় আমি নই; আল্লাহ তাআলা নিজেই তোমাদের দিবেন। আমরা বড়ই পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলেছি। আমাদের সংখ্যার স্বল্পতার দিকে তাকাবে না। বদরে তোমরা কতজন আর কুরাইশদের সংখ্যা কত ছিলো? উহুদেও মুসলমানরা কম ছিলো। আমি সে সময় শত্রু পক্ষের একজন ছিলাম। তোমাদের মাঝেও অনেক এমন আছে যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বদর প্রান্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলে। তখন আমরা বড়ই

আস্ফালন করে বলেছিলাম যে, আমরা এই মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যদেরকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে মারব। তোমাদের মনে নেই সেই দিন যারা সংখ্যায় বেশী ছিল তারাই এক সময় স্বল্প সংখ্যক বাহিনীর হাতে চরম মার খেয়ে পিছু হটে গিয়েছিল?..... কেন এমন হয়েছিলো?.....কারণ ছিল একটাই, আর তা হলো মুসলমানরা হকের উপর ছিলো; আর আল্লাহ তাআলা হক পন্থীদের সাথে থাকেন। আজ তোমরা হকের ঝাণ্ডাবাহী।"

- আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লহু আনহু ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লহু আনহুম আযমাঈমাইনদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেন-

"…. যে কোনো পরিস্থিতিতে তোমরা খালিদকে ছেড়ে যাবেনা। শত্রু যতই শক্তিশালী হোক না কেনো। কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না। তোমরা তো তারাই, যারা ঘরে ফেরার ইখতিয়ার পেয়েও 'আল্লাহর তরবারি'- খালিদের সঙ্গ ছাড়নি। তোমরা সবকিছুর উপর ঐ রাস্তা অবলম্বন করেছ যাকে 'আল্লাহর রাস্তা' বলা হয়। কল্পনা কর ঐ বিরাট সওয়াবের কথা আল্লাহর রাহে জিহাদকারীরা যা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তোমাদের সহায় ও সহায়ক হবেন। তোমাদের সৈন্য ঘাটতি তিনিই পূর্ণ করবেন। সকল অবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টি ও সন্তোষ অর্জনে সচেষ্ট থাকবে।"

- ইরান (পারস্য) সাম্রাজ্যের এক গভর্নর ছিল হুরমুজ। সে বড়ই জঘন্য প্রকৃতির, মিথ্যাবাদী এবং ধোঁকাবাজ ছিল। অভদ্রতার ক্ষেত্রে তার নাম প্রবাদতুল্য ছিল। হযরত খালিদ রদিয়াল্লহু আনহু তার নামে নিম্নোক্ত ভাষায় চিঠি লিখেন-

"আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নিলে নিরাপদে থাকবেন। এতে সম্মত না হলে আপনার শাসনাধীন এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত করে দিন। এর প্রশাসক আপনিই থাকবেন। ইসলামী খিলাফতের রাজধানী মদীনাতে নির্ধারিত কিছু কর প্রেরণ করবেন। এর বিনিময়ে আমরা আপনার জনগণ এবং এলাকার শান্তি স্থিতিশীলতা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিব। এটাও মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তখন নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার নিজের কাঁধেই থাকবে। আল্লাহই ভালো জানেন আপনার পরিণতি কী হবে। জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে; কিন্তু আমি আপনাকে এই বিষয়ে সতর্ক করছি যে, আমরা ঐ জাতি যাদের কাছে মৃত্যু ততোধিক প্রিয় যেমন বেঁচে থাকা আপনাদের কাছে প্রিয়। মৃতুকে আমরা ততটাই পছন্দ করি যতটা আপনারা মদ ও নারীকে পছন্দ করেন।.....আমি আল্লাহর পয়গাম আপনার পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম।"

- "আমাদেরকে ঐ সকল মুসলমানদের রক্তের প্রতিটি ফোটার প্রতিশোধ নিতে হবে, যারা ইরানীদের কামানের মুখে ছিলো এবং ইরানীরা যাদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিল।..." - হযরত মুসান্না রদিয়াল্লহু স্বীয় ভাই হযরত মুআন্না রদিয়াল্লহু আনহুকে পারস্য যুদ্ধে।
- "আমরা বাতিলের এতসব প্রাচুর্য আর আমাদের অপ্রতুলতা দেখে ঘাবড়ে কখনোই ফিরে যাবো না। (জিহাদ ত্যাগ করবো না।) কিসরার শিশমহলে এক একটি ইট আমরা খুলে নিব। আমরা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিব যে, তাদের মিথ্যা খোদার রাজত্ব বেশিদিন চলতে পারেনা। সত্যের নির্মম কশাঘাতে মিথ্যার পতন অনিবার্য।"- পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হযরত খালিদ রদিয়াল্লহুকে উদ্দেশ্য করে হযরত মুসান্না রদিয়াল্লহু আনহু।

- সাহাবায়ে কেরাম গোয়েন্দাগিরিতে ছিলেন যেমনি দুর্ধর্ষ, তেমনি দুঃসাহসী। তাঁরা মৃত্যুর কোনো পরোয়া করতেন না। শত্রুর পেটের মধ্যে ঢুকে তার নাড়ীর খবর বের করে আনতে তাঁদের জুড়ি ছিলো না। শত্রুর তৎপরতা মনিটরিং করতে শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করে চতুর্দিকে গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে রাখা হতো। গোয়েন্দারা ছিলো খিলাফতের চোখ, কান। নিজের ছাউনীতে বসেই খলীফা কিংবা সেনাপ্রধান এ চোখ, কানের মাধ্যমে শত্রুর অবস্থা এবং গতিবিধি সম্পর্কে যথা সময়ে অবহিত হতেন।

- "যুদ্ধই সৈন্যর পেশা। তারা বুঝে এখানে আসার মতলব কী? তারপরেও তাদের বুঝাও যে, আমরা এখান থেকে ফিরে যেতে আসিনি, থাকলে ময়দানে থাকবো নতুবা আল্লাহর কাছে চলে যাবো।"- হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লহু আনহু।

- "সাহাবায়ে কেরামের দীলে কোনো শংকা ছিল না। মাথায় কোনো বদ মতলব কিংবা দুশ্চিন্তা ছিলো না। তাঁদের সামনে এক মহান উদ্দেশ্য ছিলো। তাঁদের কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং দ্বীন ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশি ছিলো। বেঁচে থাকার প্রশ্নটি তাঁদের কাছে ততো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। তাঁরা এই মনোভাব পোষণ করতেন যে, জীবন আল্লাহ প্রদত্ত, তাই তাকে আল্লাহর রাহে কুরবান করতে হবে। নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও তাঁরা ইসলাম রক্ষার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিলেন। আল্লাহর রাহে বের হবার পর থেকে তাঁরা বাড়ি-ঘর, স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোন এবং পুত্র-কন্যা হতে কেবল দূরেই সরে যেতেন। তাঁদের দিন-রাত রক্ত-মাটির মাঝেই কাটত। জমিন ছিল

তাঁদের বিছানা আর উপরে ছিল আসমান। বাতিলের প্রাসাদ গুড়িয়ে দেয়া, কুফরের বুক চিরা এবং ইসলামের শত্রুদের আশা আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করাই ছিলো তাঁদের ইবাদত। তাঁদের মুখে সর্বদা জারি থাকত আল্লাহর নাম। আল্লাহর নাম নিয়েই তাঁরা তলোয়ার চালাতেন। প্রতিপক্ষের তলোয়ারের আঘাতে লুটিয়ে পড়ার সময়ও তাঁদের মুখে শুনা যেত আল্লাহর নাম। আহত হয়ে তাঁরা আল্লাহকে স্মরণ করতেন। নিঃসন্দেহে ঈমানের দৃঢ়তা এবং তাজা প্রেরণাই ছিলো তাঁদের অস্ত্র। আর এটাই ছিলো তাঁদের ঢাল।”- এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ।

“ওহে আল্লাহর বান্দারা!
বিজয় অথবা শাহাদাত........
বিজয় অথবা শাহাদাত........
বিজয় অথবা শাহাদাত........!!!
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও!
আল্লাহর রাস্তায় জান দিয়ে দাও!
আল্লাহর মদদ আসবে ইনশাআল্লাহ!”
- হযরত শুরাহবীল রদিয়াল্লহু আনহু।

অতএব হে বন্ধু!

এমন কেউ কি আছে, যে নিজের জীবন কে ভালোবাসে, যে মরতে চায় না, অনন্ত জীবন আশা করে? সে যেন শাহাদাতের তামান্না রাখে।

এমন কেউ কি আছে, যে নিজের দেহকে ভালোবাসে, যেন তার দেহ কবরেও না পঁচে, পোকা-মাকড়ের আহার্যে পরিণত না হয়? তাহলে সে যেন শাহাদাতের পথে অগ্রসর হয়।

এমন কেউ কি আছে, যে চায় তার মৃত্যু কষ্ট না হোক? তাহলে সে যেন আল্লাহ তাআলার কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে।

এমন কেউ কি আছে, যে চায় তার কবরে হিসাব না হোক, কবরের আযাব না হোক? সে যেন শহীদী তামান্না নিয়ে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে।

এমন কেউ কি আছে, যে কামনা করে রূহ দেহত্যাগ করার সাথে সাথেই হূরে ঈ'নের সাথে মিলিত হতে এবং জান্নাতে সবুজ পাখি হয়ে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়াতে? তার জন্য শর্টকাট রাস্তা হলো শাহাদাত।

এমন কেউ কি আছে, যে চায় কিয়ামতের মহা বিভীষিকা হতে নিরাপদ থাকতে, হাশরের ময়দানে আরশের নিচে ছায়া পেতে? তার জন্যও রাস্তা একটিই 'শাহাদাত'।

এমন কেউ কি আছে, যে চায় বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করতে? ওহে বন্ধু! তার জন্য শাহাদাত ছাড়া আরো অন্য কোনো সহজ রাস্তা আছে কি?

হূরে ঈনের সাথে মিলন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছার শর্টকাট রাস্তার মানচিত্র।

হে আল্লাহ! তুমি এই নাদানকেও শাহাদাতের জন্য কবুল কর। আমীন।

"আল্লাহুম্মারযুকনা শাহাদাতান ফী সাবীলিক, ওয়াল মাওতি বিবিলাদি নাবীয়্যিকা সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"।

হে আল্লাহ! তোমার হাবীবের কদম মোবারকের পাশে আমাকে একটু ঠাঁই দাও। আমীন।

উম্মতের মা-বোনদেরকে

শহীদ জননীদের সন্তান কুরবানীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীঃ

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহার কুরবানীঃ

ইতিহাস হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহার সকল অবদান ও কৃতিত্বের কথা ভুলে যেতে পারলেও পুত্রের সর্বশেষ সাক্ষাতের সময় তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা, অবিচল প্রত্যয় আর বিচক্ষণতার কথা কখনোই ভুলতে পারবে না।

ঘটনাটি ছিল এই- ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যুর পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহুকে খলীফা মেনে তাঁর পক্ষে যখন বাইয়াত নেওয়া হলো, হেজাজ, মিশর, ইরাক, খুরাসান ও সিরিয়ার প্রায় সকল অঞ্চল তাঁর পক্ষ নিল।

এদিকে বনু উমাইয়া অনতিবিলম্বে হাজ্জাজ বিন ইফসুফের নেতৃত্বে একদল দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল.....

দুই দলের মাঝে সজ্ঘটিত হলো ভয়াবহ যুদ্ধ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু সে যুদ্ধে দুর্দান্ত, দুঃসাহসী যোদ্ধার আক্রমণ পরিচালনা করে চূড়ান্ত বীরত্বের প্রকাশ ঘটালেন।

তবে তাঁর সহযোদ্ধারা একটু একটু করে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকল। অবশেষে তিনি বাইতুল্লাহ বা কাবা শরীফে আশ্রয় নিলেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা কাবার প্রতিরক্ষার সাহায্যে আত্মরক্ষা করলেন....

তাঁর চূড়ান্ত শাহাদাতের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি সাক্ষাৎ করতে গেলেন মায়ের সঙ্গে, ততদিনে তিনি দৃষ্টি হারানো অতিবৃদ্ধা এক নারী, তিনি মাকে সালাম দিলেন-

আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া উম্মাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু..... (মা, তোমার প্রতি.......)

- ওয়া আলাইকাস্‌ সালাম ইয়া আব্দাল্লাহ....(বেটা! তোমাকেও সালাম) বেটা, যে সময় হাজ্জাজের কামান তোমার বাহিনীর বিরুদ্ধে হারামের মধ্যে বিশাল বিশাল পাথর নিক্ষেপ করছে, যা মক্কা নগরীর বাড়ি-ঘরকে প্রকম্পিত করে তুলছে, এমন নাজুক পরিস্থিতিতে তুমি এখানে কেন?

- তোমার সঙ্গে পরামর্শের জন্য এসেছি মা।

- আমার সঙ্গে পরামর্শ! কী বিষয়ে?!

- মা! লোকে আমাকে নিরাশ করে দিয়েছে, তারা হাজ্জাজের ভয়ে অথবা তার প্রতি মোহে আমার নিকট থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

এমনকি আমার নিজের পরিবারের ও আপন লোকেরাও আমাকে ফেলে দূরে সরে গেছে, এমন ছোট্ট একটি দলের সামান্য কয়েকজন মানুষ ছাড়া আমার সঙ্গে কেউ নেই। তাঁরা যত বড়ই কষ্ট সহিষ্ণু হোক না কেন, এক ঘণ্টার বেশি টিকতে পারবে না.....

বনু উমাইয়ার দূতেরা আমার নিকট বলাবলি করছে যে, আমি অস্ত্র ত্যাগ করে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের হাতে বাইয়াত হলে তারা আমাকে পৃথিবীর যা চাইব তাই দেবে, এ ব্যাপারে তোমার কী মত মা?

তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন-

সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে হে আব্দুল্লাহ! তোমার মনের কথা তুমিই ভালো জানো।

যদি তোমার আস্থা থাকে যে, তুমি প্রতিষ্ঠিত আছো হকের উপর আর প্রয়াস চালাচ্ছ হক প্রতিষ্ঠার জন্য, তাহলে তুমি অবিচল থাকো, যেভাবে অবিচল ছিল তোমার সেই সঙ্গীরা, যাঁরা তোমার পতাকাতলে লড়াই করে শহীদ হয়েছে.....যদি দুনিয়ার কিছু অর্জনের আশা তুমি পোষণ করে থাকো তাহলে কত যে খারাপ মানুষ তুমি...... তুমি নিজের জীবনটাও বরবাদ করেছ আর বরবাদ করেছ তোমার সঙ্গীদেরও।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু বললেন-

কিন্তু আমি তো আজকেই নিহত হয়ে যাবো।

- সেটা তোমার জন্য অনেক ভালো স্বেচ্ছায় নিজেকে হাজ্জাজের হাতে তুলে দিয়ে নিজের কর্তিত মস্তক বনু উমাইয়ার বালকদের খেলতে দেওয়ার চেয়ে......

- আমি নিহত হওয়ার ভয় পাচ্ছি না। আমি ভয় পাচ্ছি, আমার মৃতদেহকে বীভৎসরূপে বিকৃত করা হবে।

- নিহত হওয়ার পর ভয় পাওয়ার আর কি আছে? যবাইকৃত ছাগল ছাল ছিলার কষ্ট পায় না।

মমতাময়ী মায়ের মুখে বেদনাময় বাস্তব কথাগুলো শুনে, নিজের কর্তব্য স্থির করতে পেরে তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠল। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন-

মাগো, রহমত ও বরকতপ্রাপ্তা হও তুমি, তোমার সুমহান মর্যাদার আরও বৃদ্ধি ঘটুক। শুধু তোমার মুখের এই কথাগুলো শুনতেই ছুটে এসেছিলাম তোমার কাছে। আমার আল্লাহ জানেন, আমি শক্তিহীন, দুর্বল ও ক্লান্ত হইনি।

এই দেখো মা, আমি এখন যাচ্ছি তোমার পছন্দনীয় পথে, আমি শহীদ হলে আমার জন্য দুঃখ করো না মা!

- বেটা, তোমার জন্য দুঃখ করতাম যদি তুমি বাতিলের জন্য জীবন দিতে।

আলহামদুলিল্লাহ! প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে পরিচালিত করেছেন সেই পথে যা তাঁর পছন্দনীয় এবং যা আমারও পছন্দনীয়.....

তুমি একটু আমার কাছে এসো বেটা, আমি একটুখানি তোমার ঘ্রাণ নেব, তোমার শরীরটা একটু ছুঁয়ে দেখব। কারণ, এটাই যে তোমার সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু নিচু হয়ে মায়ের হাতে ও পায়ে চুমু দিয়ে ভরে দিলেন আর মা পুত্রের মাথায় ও ঘাড়ে নাক ঘষে ঘষে ঘ্রাণ নিলেন আর চুমু দিয়ে মমতা মাখিয়ে দিলেন......

দুই হাত সচল রাখলেন তাঁকে স্পর্শ করতে। হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন-

আব্দুল্লাহ এটা কী পরেছ?

- লৌহ বর্ম।

- যে ব্যক্তি শহীদ হতে চায় এটা তার পোশাক হতে পারে না বেটা।

- মা, এটা তো বরং তোমাকে খুশি করার জন্য পরেছি।

- ওটা খুলে ফেলো, তোমার ওই ভারী বর্মমুক্ত শরীরটাই হবে সাহসী ভূমিকার বেশি সহায়ক। সামনে-পিছে নড়াচড়ার জন্য সহজ......

তবে ওটার পরিবর্তে তুমি দ্বিগুণ পাজামা পরে নাও, যেন মাটিতে পড়ে গেলে তোমার ছতর উন্মুক্ত না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু লৌহবর্ম খুলে ফেললেন, কয়েকটি সালোয়ার পরলেন, এগিয়ে গেলেন হারামের দিকে, চিৎকার করে বলতে থাকলেন-

মা, আমার জন্য তোমার দুআ বন্ধ করো না।

মা দু' হাত উর্ধ্বে উঠিয়ে বললেন-

হে আল্লাহ, নামাযে তাঁর দীর্ঘ কিয়ামের প্রতি রহম করো, রহম করো গভীর রাতে জসৎবাসীর নিদ্রাবিভোর মুহূর্তে তাঁর বুক ফাটা ক্রন্দনের প্রতি.....

হে আল্লাহ, মক্কা-মদীনার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের দিনে নফল রোযা রেখে তার ক্ষুধা আর পিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করার প্রতি রহম করো, করুণা করো....

হে আল্লাহ, পিতা-মাতার প্রতি তাঁর আনুগত্যের ওপর রহম করো...

হে আল্লাহ, আমি ওকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছি তোমার জন্য, তুমি যা ফয়সালা করবে আমি তাতে সন্তুষ্ট, সুতরাং তাঁর ব্যাপারে আমাকে দান করো ধৈর্যশীলদের প্রতিদান......

ওই দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রদিয়াল্লহু আনহু পৌঁছে গেলেন আপন প্রভুর সান্নিধ্যে......

তাঁর শাহাদাতের দশ-পনের দিন পরই তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন তাঁর মা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহা......

এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একশ বছর অথচ তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও হ্রাস পায়নি।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়কে সর্বোত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

֍ হযরত উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহার কুরবানী:

হযরত উম্মে উমারা রদিয়াল্লহু আনহার পুত্র হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রদিয়াল্লহু আনহুকে দূত হিসেবে ভণ্ড নবী মুসাইলামাতুল কায্যাব-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ..........

মুসাইলামা বিশ্বাসঘাতকতা করে হযরত হাবীব রদিয়াল্লহু আনহুকে এমন নিষ্ঠুর-নিদয়ভাবে হত্যা করে, যা শুনলে লোম শিউরে উঠে।

বিষয়টি ছিল এমন, মুসাইলামা প্রথমেই হযরত হাবীব রদিয়াল্লহু আনহুকে বন্দী করে জিজ্ঞাসা করে-

তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

- হ্যাঁ।

- তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?

- আমি শুনতে পাচ্ছি না, কী বলছ?

মুসাইলামা তাঁর ডান হাত কেটে দিল........

এভাবে সে বার বার একই প্রশ্ন করতে থাকল আর হযরত হাবীব রদিয়াল্লহু আনহু একই উত্তর দিতে থাকলেন। প্রত্যেকবার উত্তরের পর পাষণ্ড তাঁর একেকটি অঙ্গ কেটে ফেলছিল। দুই হাত, দুই পা কেটে ফেলার পরও তাঁর অবিচলতা দেখে মিথ্যুক মুসাইলামা তাঁর জিহ্বা কেটে আবার জিজ্ঞাসা করলো- তুমি কি আমাকে রাসূল বলে বিশ্বাস কর? হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রদিয়াল্লহু আনহু মাথা নেড়ে অস্বীকার করলেন তার নবুওয়তকে।

'পাষাণ গলে যাবে' এমন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করেও অটল, অনড় ঈমান নিয়ে অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। ইন্না.. লিল্লা..হি ওয়া ইন্না...ইলাইহি রা...জিঊ....ন।

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রদিয়াল্লহু আনহুর ভয়াবহ এই শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছানো হলো তাঁর মা হযরত নাসীবা আল মাযেনিয়া (উম্মে উমারা) রদিয়াল্লহু আনহার কাছে। তিনি সব শুনে বেশি কিছু বললেন না। ছন্দে ছন্দে বললেন সামান্য একটু কথা-

"এমন একটি ভূমিকার জন্যই আমি তাকে দুগ্ধ পান করিয়েছিলাম...
আমি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট, আমি প্রতিদান চাই তাঁর কাছেই....
শৈশবে সে 'আকাবার রাতে' শপথ নিয়েছিল প্রিয় নবীজীর হাতে....
অনেক বড় হয়ে আজ সে সেই অঙ্গীকারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটাল।"

উম্মতের মা-বোনদের প্রতি উন্মুক্ত চিঠিঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

উম্মতের সম্মানিতা প্রত্যেক মা-বোনদের প্রতি মাহমুদ আল হিন্দী।

সালামুন আলাইকুন্না।

আল্লাহ পাক আপন সত্ত্বা ও গুণাবলিতে সকল কিছু থেকে পবিত্র এবং তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বড় রহম। তিনি তাঁর হাবীব ﷺ-কে পুরো আলমের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যাকে সঠিক ও সত্য দ্বীন সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে যেন অপরাপর সকল দ্বীনের উপর তা জয়যুক্ত হয়ে যায়। যিনি ছিলেন তাঁর উম্মতের প্রতি বড় রহম। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে এমন পুরস্কার দান করার ওয়াদা করেছেন যা তাঁর হাবীবকে খুশি করে দিবে। হে আল্লাহ, আপনার হাবীবের প্রতি আমাদের সকলের পক্ষ থেকে দরূদ ও সালাম পৌঁছে দিন। সালাম বর্ষিত করুন আহলে বাইত সকল "আম্মাজানদের" প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল আহলে বাইতের প্রতি। আম্মা বা'দ।

আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান, আল্লাহ পাক যদি কারো জন্য ক্ষতির ফয়সালা করেন, তাহলে সেই ক্ষতি থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আবার তিনি যদি কারো জন্য ভালাইয়ের ফয়সালা করেন তাহলে সেই ভালাই তার থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

প্রিয় মা-বোনেরা!

আমরা মুসলমান, আল্লাহ পাকের কথার উপর এবং তাঁর হাবীবের প্রদত্ত খবরের উপর আমাদের বিশ্বাস ও ভরসা থাকা চাই। যদি আপনারা দ্বীনের উপর থাকেন, আল্লাহ পাককে সাথে পাবেন। আর যদি দ্বীনের উপর না থাকেন, তাহলে যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক না কেন, আল্লাহ পাককে সাথে পাবেন না। তখন আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাত সবই বৃথা। আপনাদেরকে নবীজী ﷺ-এর সেই বিখ্যাত হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, "ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, আবার শীঘ্রই তা অপরিচিত হয়ে যাবে। তখন সেই অপরিচিত (ইসলামের উপর চলনেওয়ালা)-দের জন্য সুসংবাদ।" (মুসলিম)

দয়া করে আপনারা এমন মনে করবেন না যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, বাচ্চা দেখা-শুনা করা, রান্নাবান্না করা, পর্দায় থাকা ছাড়া আপনাদের আর কোনো কাজ নেই; ইসলাম এমন নয়।

আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার অবস্থানে রেখে পরীক্ষা করেন এবং কাউকে এমন কোনো পরীক্ষায় ফেলেন না যা সামাল দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। পারিবারিক জীবনে যে কোনো হালত আসে, আপনারা যদি নিজেরা সেই হালতগুলো সমাধানের চেষ্টা করার সময় নিজেদের আকল ও বিবেককেই শুধু কাজে লাগান, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনাদের ভুল হবে। কারণ আমাদের আকল ও বিবেক এই সমাজ দ্বারা প্রভাবিত এবং এই সমাজের কেউ আপনাদের প্রকৃত ইসলামের দিকে ডাকবে না।

আমি আপনাদের সেই ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, যা আল্লাহর রাসূল ﷺ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন, যা বর্তমানে গরীব (অপরিচিত)। আল্লাহ পাক আমাকে যতটুকু বুঝ দিয়েছেন, যদি সেটার দাওয়াত আমি আপনাদেরকে না দেই, তাহলে তা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত এবং এই ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসিত হবো। তাই আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি এবং আমি এর কোনো বিনিময় আপনাদের নিকট আশা করি না। বিনিময় তো আল্লাহ পাক দিবেন, ইন্‌শাআল্লাহ।

একজন নিজেকে মুসলমান দাবী করবে কিন্তু তার যিন্দেগী অন্য দশজন দুনিয়াদার লোকের মতো হবে, আখিরাত নিয়ে সার্বক্ষণিক চিন্তা ও পরিকল্পনা থাকবে না এবং মৃত্যুকে ভয় করবে, তাহলে সে নিজেকে ধোকা দিচ্ছে। আজকের দিনটার কথাই চিন্তা করুন। আজ আপনাদের দিনটা যেভাবে কেটেছে, এতে কি দুনিয়ার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পেয়েছে? আজ আখিরাতে আগে বাড়ার জন্য কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? আজ আমরা মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত আছি কিনা? অথচ আজকেই আমাদের কেউ না কেউ অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। প্রত্যেকেই নিজেকে যাচাই করি, আমরা প্রকৃত মুসলমান হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবো কিনা। আজ স্বামীকে রান্না করে খাওয়ানো ও অন্যান্য খেদমতের উপর বড়ো দায়িত্ব হিসেবে 'স্বামীকে আখিরাতের ঘাটিগুলোর ব্যাপারে উৎসাহিত করা' হয়েছে কিনা? আজ আমার স্বামী যদি মারা যান, তাহলে "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট", এই একীন আমার মাঝে পয়দা হয়েছে কিনা?

আপনাদেরকে এবং আমাদের সকলকে প্রকৃত ইসলামের উপর উঠে আসতে হবে এবং মুসলমান হয়ে কবরে যেতে হবে। এই জন্যই আমরা দুনিয়াতে এসেছি।

প্রিয় মা-বোনেরা আমার!

আমার এই কথাগুলো ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করুন। আপনাদেরকে প্রকৃত ইসলামের উপর উঠে আসতে হবে। এখন যেভাবে আছেন, তা কবরের আযাব ও মওতের পরের ঘাটিগুলো পার করার জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহর রাসূলের ﷺ রেখে যাওয়া ইসলামের উপর উঠতে গেলে কি আপনার স্বামী চাকুরি/ব্যবসা/কৃষি ইত্যাদি পেশা চালিয়ে যেতে পারবে? তিনি কি আপনার ঘর আর দশজন দুনিয়াদারের মতো করে সাজাতে পারবে? খাট-পালঙ্ক-আসবাবপত্র আর ফ্রীজ, এ.সি ইত্যাদি দুনিয়ার সামগ্রীগুলো আপনাকে ক্রয় করে দিতে পারবে? দামী দামী স্বর্ণ-রূপার অলংকার কিনে দিতে পারবে? কিছুদিন পরপর, কিংবা প্রতি ঈদে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের আগে আপনাদের নতুন নতুন জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে? তিনি কি আপনাকে তিন বেলা পেট ভরে খাওয়াতে পারবে? আমাদের সামনে কি আম্মাজান আইশা রদিয়াল্লাহু আনহার সেই কথাটি নেই, "আমরা পরপর তিন চাঁদ দেখতাম, কিন্তু আমাদের চুলায় আগুন জ্বলতো না। এসময় আমরা প্রতিদিন একটি করে খেজুর খেয়ে কাটাতাম"? আপনার স্বামী কি আপনার ও আপনার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে টাকা জমাতে পারবে? জায়গা-জমি ক্রয় করে বাড়ি-গাড়ি করতে পারবে? আপনাদেরকে নিয়ে বিল্ডিং বাড়িতে বাস করতে পারবে? তিনি কি

দুনিয়ার যিন্দেগীতে আপনাদের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারবে? কক্ষনোই পারবে না। যদি সে এগুলো করে, তাহলে সে সেই ইসলাম থেকে দূরে সরে গেল, যা আসমান থেকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল।

বর্তমান যামানায় সকল মুসলমান নর-নারীর উপর জিহাদ 'ফরযে আঈন' হয়ে গিয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম, দাজ্জাল এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালামের আগমন ইন্‌শাআল্লাহ খুবই নিকটবর্তী। ভালোভাবে চিন্তা করি, আমার স্বামীর উপর এখন আল্লাহর হুকুম কী, আমাদের উপরই বা এখন তাঁর কী হুকুম? আমাদের স্বামী-সন্তান-ভাইদের উপর 'জিহাদের জন্য হিজরত করা' এখন ফরযে আঈন। এখন আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়াই তাদের উপর আল্লাহর হুকুম। ততক্ষণ পর্যন্ত ময়দানে লড়ে যাওয়া তাদের উপর ফরয, যতক্ষণ পর্যন্ত হয়তো দ্বীন পুরোপুরি কায়েম হবে, নয়তো তারা শহীদ হবে।

আর আমাদের জন্যও এখন আল্লাহর ফরয হুকুম 'জিহাদ' আর তা হচ্ছে- আমাদের স্বামী-সন্তান-ভাইদের জিহাদের জন্য পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করা, তাদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের ফাযাইল শুনানো, যদি জিহাদে যেতে গড়িমসি করে তাহলে তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা; "আপনি যদি জিহাদে না যান, তাহলে আপনি ফাসেক হবেন, কোনো ফাসেক 'কাপুরুষ' আমার স্বামী/সন্তান/ভাই হতে পারে না"- এভাবে তাদেরকে বুঝানো; তাও যদি জিহাদে যেতে না চায় তাহলে তাদের হাতে চুঁড়ি আর গলায় মালায় পরিয়ে দেয়া, ঘরের বাহিরে বের হতে চাইলে হাতে বোরকা ধরিয়ে দেয়া, এভাবে তাদের মাঝে পৌরুষত্ব জাগানোর চেষ্টা করা।

আমাদের উপর এখন সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো, স্বামী-সন্তান ও ভাইয়ের বিচ্ছেদে সবর করা। এতে ঘরে বসেও আমরা পরিপূর্ণ জিহাদের সওয়াব পাবো, ইনশাআল্লাহ। আমরা হযরত হান্যালা রদিয়াল্লহু আনহুর স্ত্রীর কথা স্মরণ করি। কিভাবে তিনি সবর করেছিলেন, যখন তাঁর স্বামী তাকে বিয়ের রাতে ফরয গোসলের হালতে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ময়দানে আর সেদিনই শহীদ হয়ে যান! আমরা হযরত উকবা ইবনে বশির রদিয়াল্লহু আনহুর সন্তানের কথা স্মরণ করি। কিভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমকে পালন করতে গিয়ে তার একমাত্র সন্তানকে একাকী রেখে চলে গিয়েছিলেন, আর আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে সেই ছেলেটির পিতা বানিয়ে দিলেন! আমরা হযরত হাযেরা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের কথা স্মরণ করি। কিভাবে তাঁরা আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেদেরকে জবাই করেছিলেন, আল্লাহর জন্য সবর করেছিলেন! আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ধ্বংস করেননি, বরং তাদেরকে ইজ্জতের সাথে দুনিয়াতে রেখেছেন এবং জান্নাতকে তাদের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমাদেরকেও আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করবেন না, দুনিয়া ও আখিরাতে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। তিনিই পরকালে আমাদেরকে নাজাত দিবেন ও জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিনীসমূহ প্রবাহিত!

আমাদের স্বামী-সন্তান ও ভাইয়েরা যদি শহীদ হয়, তাহলে আমরাও শহীদের মর্তবা পাবো। কিভাবে? কেন নয়, আমাদের মৃত্যুর পর কি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন না, যে জান্নাত তারা শাহাদাত লাভ করে পেয়েছে? তাতে, তাদের সাথে একত্রিত করে দিবেন না?

একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর কত রহম! আমরা ঘরে বসে থেকে একটু সবর করে কত নিয়ামত লাভ করলাম! সুতরাং আমাদের এই বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ নয়, অনন্তকালের বিচ্ছেদ নয়; এই বিচ্ছেদ সাময়িক, ক্ষণকালের। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যা দিবেন, তাতে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে, দীল ভরে যাবে। এরপর আমরা আর পৃথক হবো না।

আমাদের স্বামী-সন্তান-ভায়েরা আমাদের রেখে চলে গেলে আমরা কিভাবে চলবো, আমাদের রুজী-রোজগারের কী হবে, এই চিন্তা যেন আমাদের মাথায় না আসে? যদি এই চিন্তা আসে, তাহলে আমাদের যিন্দেগীতে আল্লাহ কোথায় আছেন, তাঁর স্থান কোথায়? আমার স্বামী-সন্তান-ভাই কি আমার রব (প্রতিপালক)? বিয়ের আগে আমার পিতা আমাকে পালেননি, পেলেছেন আমার আল্লাহ! বিয়ের পরে আমার স্বামী-সন্তান আমাকে পালছেন না, পালছেন আমার আল্লাহ! তারা যদি জিহাদে চলে যায়, শহীদ হয়ে যায়, কিংবা ঘরে পড়ে আজকেই মারা যায়, তবুও যিনি আমাকে পালবেন তিনি তো আর কেউ নয়, আমার আল্লাহ! তারা যদি আমাদেরকে রেখে যায়, কিংবা সাথে নিয়ে হিজরত করে, সেখানেও আমাদের পালবেন আমাদের আল্লাহ! তিনিই তো রিযিকদাতা! আমাদের পালনকর্তা হিসেবে তিনিই কি যথেষ্ট নন?

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! অনেক বোনেরা আছেন, যারা তাদের স্বামী তাদেরকে রেখে হিজরত করার সাথে সাথেই তড়িঘড়ি করে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। হ্যাঁ, যদি একান্ত অপারগ হন, যেমন রুজীর জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে হচ্ছে (ভিক্ষা করতে হচ্ছে), নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারছেন না, সে ক্ষেত্রে

তো কথা নেই। কিন্তু যাদের এই ধরণের হালত নেই, আমরা কি পারি না একটু সবর করতে? একটু কষ্ট করে দুনিয়ার যিন্দেগীতে নিজের চাহিদাগুলোকে আখিরাতের জন্য রেখে দিতে? নিজের আরাম-সুখ-আহ্লাদগুলোকে কবর, হাশর ও জান্নাতের জন্য রেখে দিতে? একটু চিন্তা করি, আমার স্বামী কি শখের বশবর্তী হয়ে জিহাদে গিয়েছে? সে তো আল্লাহর জন্যই তার যিন্দেগীর সকল স্বাদ-আহ্লাদ, আনন্দ-সুখ আর প্রেম-ভালোবাসাকে কুরবানী করেছে, এবং আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। এদিকে, আমিও কি পারবো না, ঘরে থেকে তার বিচ্ছেদে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় সবর করতে, আমার যত চাওয়া-পাওয়া আছে আমার যত প্রেম-ভালোবাসা আছে তাকে কুরবানী করতে?

আরেকটু চিন্তা করি, আমার স্বামী, যে আমাকে রেখে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে ময়দানে চলে গেছে, সে কি খুব আরামে আছে? সে কি না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কষ্ট করছে না? বুলেটের আঘাতে, বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে না? ব্যথায়-কষ্টে ছটফট করছে না? সে কি এখন চিন্তা করছে না, 'এখন যদি আমার প্রেমময়ী, সোহাগিনী স্ত্রী আমার কাছে থাকতো, তাহলে সে আমার সেবা করতো, একটু আদর করতো, একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, যেমনটি সে বাড়িতে থাকতে আমি অসুস্থ হয়ে গেলে করতো?' আহ্! আপনার স্বামী কি আপনার বিচ্ছেদে কান্না করছে না? আপনার জন্য কি তার বুক ফেটে যাচ্ছে না? আপনাকে কাছে পেতে, আপনার একটু ভালোবাসা ও প্রেম পেতে তার মন কেমন বেচাইন হয়ে আছে, একটু চিন্তা করুন তো! এই অবস্থায় যদি কোনোভাবে তার কাছে খবর পৌঁছে, তার প্রিয়তমা স্ত্রী আরেক স্বামী গ্রহণ করেছেন, যার কথা

ভেবে ভেবে তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হতো, সেই আপনি আরেকজনকে নিয়ে আনন্দ-উল্লাস করছেন, একটু চিন্তা করুন তো, তখন এই খবরটি তাকে তার শাহাদাতের আগে কতবার হত্যা করবে? হ্যাঁ, আপনি যদি পরকালে তার সাথে থাকতে না চান, শহীদের স্ত্রীর মর্তবা না চান, তাহলে আপনি যা ইচ্ছা করেন, সমস্যা নেই। আপনার স্বামীকে আল্লাহ তাআলা তার আপনজনের নিকট খুব শীঘ্রই পৌঁছে দিবেন, সেখানে তার কষ্টের কোনো কারণই থাকবে না। সেখানে দুনিয়ার কারো জন্যে তার কষ্ট লাগবে না।

হাদীসে এসেছে, যদি কোনো নারী বিধবা হওয়ার পর তার সন্তানদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষনের কথা চিন্তা করে অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ না করে, তাহলে তার অবস্থান হবে আল্লাহর রাসূলের সাথে। আরেক হাদীসে এসেছে, সবরের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রিয় বোনেরা আমার!

আপনারা যদি এই হিম্মতটুকু করতে পারেন, তাহলে এটি আপনাদের জন্য উত্তম যদি আপনারা বুঝতে পারেন। হ্যাঁ, যদি আপনার কোনো সন্তান না থাকে, আর আপনি খবর পান যে, আপনার স্বামী মারা গিয়েছেন কিংবা শহীদ হয়েছেন, তাহলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই। এক্ষেত্রে মৃত্যুর পর আপনাকে এখতিয়ার দেয়া হবে, আপনি জান্নাতে কোন্ স্বামীর সাথে থাকবেন! আপনি ইচ্ছা করলে আপনার শহীদ স্বামীর সাথে থাকতে পারবেন, অথবা আপনার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে থাকতে পারবেন।

যাইহোক, আমরা চিন্তা-ফিকির করি, আমাদের স্বামী, সম্ভব হলে পিতা ও ভাইদের সাথে মাশোয়ারা করি। নবুওয়তের যামানার ইসলামের বেশি বেশি মুজাকারা করি। আমাদেরকে সঠিক ইসলামের উপর উঠে আসতে হবে। হিজরত ও জিহাদের জন্য আমাদের পিতা-পুত্র, স্বামী-ভাইদেরকে উৎসাহিত করি।

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা আল্লাহর রাস্তায় সন্তান কুরবানী করার জন্য আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদেরকে শহীদ হিসেবে দেখার জন্য ছোট্ট সময় দুগ্ধপান করাতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যাদের মাতৃদুগ্ধে এই পরিমাণ ধার ছিলো যে, তাদের সন্তানরা কিসরা কায়সারের সাম্রাজ্যগুলোকে তছনছ করে দিয়েছিলো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা নিজের হাতে অস্ত্র ক্রয় করে সন্তানের হাতে তুলে দিতো, এই আশায় যে, তার সন্তান আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভ করবে?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের পুত্র বধূ হিসেবে জান্নাতের হূরদের দেখতে বেশি ভালোবাসতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদের সাথে হূরের বিবাহের জন্য দুনিয়াতে মোহরানা আদায় করে দিতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদের শাহাদাতের উপর গর্ববোধ করতো?

আজ কোথায় সেই মায়েরা, যাদের সন্তান শহীদ হলে তার বাড়িতে বিয়ে বাড়ির আমেজ চলে আসতো? আনন্দ মিছিল বের হতো? আজ কোথায় তারা?

কোথায় আজ ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব?

কোথায় আজ উম্মে উমারা?

কোথায় আজ আসমা বিনতে আবু বকর?

(রদিয়াল্লহু আন্হুন্না আযমাঈন)

সেই মায়েরা আজ কোথায়?

সেই স্ত্রীরা আজ কোথায়, যারা বাসর ঘর থেকে তাদের স্বামীদেরকে জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের জন্য পাঠিয়ে দিতো?

কোথায় আজ তারেক বিন যিয়াদ আর মুহাম্মাদ বিন কাসীমের বোনেরা?

পরম মমতাময়ী, সোহাগিনী, প্রেমময়ী কিন্তু পাহাড়ের মতো অটল-অবিচল ঈমানওয়ালী; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বতকারিনী, প্রিয়তমের বিচ্ছেদে সবরকারিনী আমার সেই বোনেরা আজ কোথায়?

কেন তারা আবারো বুকে পাথর বেঁধে ধৈর্য্য ধারণ করছে না?

কেন তারা আজ আরো লাখো মুসলিম মা-বোনের উপর অত্যাচার-নির্যাতন আর ধর্ষণের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের স্বামী-সন্তান-ভাইদেরকে ময়দানে পাঠাচ্ছে না?

আল্লাহ তাআলা আমার হাবীব ﷺ-এর উম্মতের মা-বোনদের প্রতি রহম করুন। তাদের ইয্যত-আব্রুর সর্বোচ্চ হেফাযত করুন। আমীন।

বর্তমান যামানায় সবচেয়ে বড় দাওয়াত- উম্মতকে অপরিচিত ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

-মাহমুদ আল হিন্দী।

যারা ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম-এর সাথী হতে চায়, তারা যেন অবশ্যই 'গরীব ইসলাম'কে নিজেদের যিন্দেগী বানায়। সে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় আহাম্মক, যার যিন্দেগী সমাজের আর দশজন দ্বীনদারদের মতো (যাদের যিন্দেগীর অধিকাংশ কার্যকলাপ ইহুদী-নাসারাদের সাথে মিলে যায়), আর সে আশা রাখে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথী হবে!

-মাহমুদ আল হিন্দী ॥

দুনিয়ার মহব্বত
মৃত্যুর ভয়
ওয়াহন
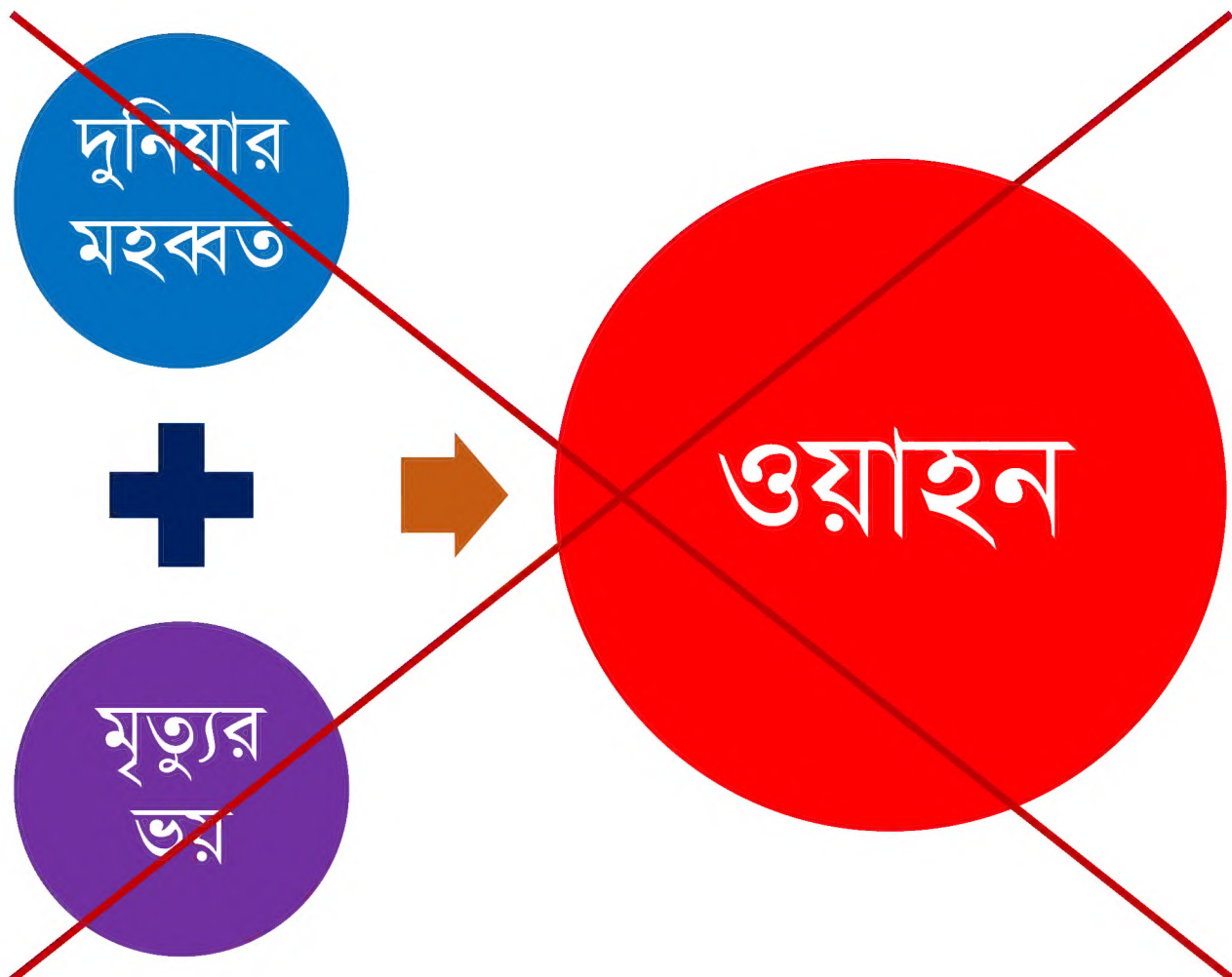
নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী
(গরীব ইসলাম)

[কিতাবটি তিন খণ্ডে রচিত]

-ঃ (দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত) ঃ-